মুসলিম বাংলার [illegible] স্থাপত্য (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী): স্থাপত্যিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়ক

[illegible]

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপক

[illegible]

এম.ফিল. [illegible]

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RL
725.96
AKM
C. 1

Dhaka University Institutional Repository

400823

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বাংলার তোরণ স্থাপত্য (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী)ঃ স্থাপত্যিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়ক
ড. পারভীন হাসান
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400823

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপস্থাপক
সুরাইয়া আক্তার
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
400823

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম ফিল গবেষক সুরাইয়া আক্তার-এর *মুসলিম বাংলার তোরণ স্থাপত্য (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) : স্থাপত্যিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব* শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি সুরাইয়া আক্তারের নিজস্ব ও মৌলিক রচনা, অন্য কোন গবেষকের রচনার হুবহু অনুকৃতি নয়। আমি এই অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত অনুলিপি পূর্বাপর পাঠ করেছি এবং এম ফিল অভিসন্দর্ভ হিসেবে জমাদানের উপযুক্ত বিবেচনা করে তা জমাদানের অনুমতি দিয়েছি।

400823

(পারভীন হাসান)
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মুখবন্ধ

এম এ ক্লাসে 'মুসলিম শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব' বিষয়ে অধ্যয়নকালে যে অংশটি আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে তা হলো আমাদের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী আমাদের প্রত্নসম্পদ,মধ্যযুগীয় স্থাপত্য। যদিও বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অধ্যয়ন করেছি ভারতীয় স্থাপত্যের অংশ হিসেবে, তথাপি স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদার দিক থেকে এ অঞ্চলের স্থাপত্য অন্যান্য দেশের মুসলিম স্থাপত্যের চেয়ে যে কম গুরুত্ব বহন করেনা, তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এম এ শেষ করার পর বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম উপাদান তোরণ নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা পোষণ করি । এ বিষয়ে গবেষণার জন্য আমার বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ পারভীন হাসান আমাকে অনুপ্রাণিত করেন এবং সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাই প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ডঃ পারভীন হাসানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার বিভাগের প্রবীন ও নবীন শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময়ে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে সহোযোগিতা করেন। এ সকল শ্রদ্ধাভাজনকে সবর্দা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত দুরূহ। কেননা শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নয়, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞানের। এই জ্ঞান আহরণের জন্য আমাকে যেতে হয়েছে মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। আর এই দুসাধ্য কাজটি সম্পাদনে যে শুভানুরাগীরা আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে লালবাগ কমপ্লেক্সের কিউরেটর জনাব হাবিবুর রহমান এবং বাগের হাট প্রত্নতত্ত্ব যাদুঘরের গবেষণা কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমীন আমাকে প্রত্নসম্পদ পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে যথেষ্ট সহোযোগিতা প্রদান করেন। মধ্যযুগীয় বাংলা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমাকে বর্তমান বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ যেতে হয়েছে। বিদেশ বিভূইয়ে যে ব্যক্তিটি আমাকে প্রেরণা ও বিভিন্ন তথ্য ও উপদেশ দিয়ে কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ করেছেন, তিনি হলেন-

400823

Dhaka University Institutional Repository

মালদহ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. পদ্যোত ঘোষ। কিন্তু গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রমের পাশাপাশি যে আর্থিক সহোযোগিতা প্রয়োজন তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। এ সহোযোগিতা ব্যতীত বর্তমান গবেষণা হয়ত সম্পাদন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হতো। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তরফদার স্মৃতি যাদুঘর, বেগম সুফিয়া কামাল গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানগৃহ আমার গবেষণাকে আরও সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে। এ সকল গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে, আবারও স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্বাবধায়ক ড. পারভীন হাসানকে- যাঁর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সঠিক দিক নির্দেশনার ফলসরূপ অভিসন্দর্ভটি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৫
পটভূমি	৬-১৮
তোরণ স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ	১৯ - ২৭
বাংলায় নির্মিত তোরণসমূহ (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক)	
ক) সুলতানী আমল	
১. চিকা ইমারত	২৮- ৩৩
২. দাখিল দরওয়াজা	৩৪- ৪৩
৩. কোতোয়ালী দরওয়াজা	৪৪-৪৯
৪. ষাট গম্বুজ মসজিদের তোরণ	৫০- ৫৪
৫. খান জাহানের সমাধি কমপ্লেক্সের তোরণসমূহ	৫৫- ৬৩
৬. ছোট সোনা মসজিদের তোরণ	৬৪- ৭০
৭. গোমতি দরওয়াজা	৭১-৭৫
৮. বাঘা মসজিদের তোরণ	৭৬- ৮২
৯. বড় সোনা মসজিদের তোরণ	৮৩-৮৭
১০. সুরা মসজিদের তোরণ	৮৮- ৯২
খ) মুঘল আমল	
১১. কুতুবশাহী মসজিদের তোরণ	৯৩- ৯৭
১২. জামী মসজিদের তোরণ	৯৮- ১০২
১৩. বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণ	১০৩-১০৭
১৪. লুকোচুরি দরওয়াজা	১০৮-১১২
১৫. কদম রসূল কমপ্লেক্সের তোরণ	১১৩-১১৬
১৬. শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণ	১১৭-১২০
১৭. হাজীগঞ্জ দুর্গের তোরণ	১২১-১২৫
১৮. সোনাকান্দা দুর্গের তোরণ	১২৬-১৩০
১৯. ইদ্রাকপুর দুর্গের তোরণ	১৩১-১৩৩
২০. লালবাগ কমপ্লেক্সের তোরণসমূহ	১৩৪-১৪৩
২১. ছোট কাটরার তোরণ	১৪৫-১৪৮
২২. হাজী খাজা শাহাবাজ কমপ্লেক্সের তোরণ	১৪৯-১৫১
২৩. শাহ্ মুহাম্মদ মসজিদের তোরণ	১৫২-১৫৫
২৪. সাত গম্বুজ মসজিদের তোরণ	১৫৬-১৫৯
উপসংহার	১৬০-১৭১
পরিশিষ্ট-১ঃ শিলালিপি	১৭২-১৮৪
পরিশিষ্ট-২ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত তোরণের তালিকা	১৮৫-১৮৭
পরিশিষ্ট-৩ঃ সহায়ক গ্রন্থ	১৮৮-১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

স্থাপত্য মানব প্রচেষ্টার অন্যতম মাধ্যম যেখানে সমকালীন জীবনপ্রণালী, চিন্তা, চেতনা তথা রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত। সমসাময়িক ইতিহাস চর্চায় তাই স্থাপত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনায় এ সত্যটি আরও কার্যকর। কেননা প্রাক-মুসলিম কিংবা মুসলিম শাসনামলে এ অঞ্চলে ইতিহাস চর্চার প্রচেষ্টা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এ অঞ্চলের সমসাময়িক ইতিহাস রচনায় অনেকটাই নির্ভর করতে হয় স্থাপত্য তথা প্রত্নতত্ত্বের উপর। মধ্যযুগে বাংলায় নির্মিত মুসলিম স্থাপত্যের যে সকল নিদর্শন আজও অতীত ইতিহাসের গৌরব বহন করে টিকে আছে, তোরণ স্থাপত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। ইতিপূর্বে বাংলা স্থাপত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা হলেও এর অন্যতম উপাদান তোরণ স্থাপত্য নিয়ে একক গবেষণার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলা স্থাপত্য নিয়ে লেখালেখির প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ব অনুরাগী ও স্থাপত্য ঐতিহাসিকের আলোচনায় তোরণ স্থান করে নিয়েছে, তাঁদের মধ্যে হেনরি ক্রেইটনের (Henry Creighton)[১] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অংকিত গৌড়ের তোরণসমূহের চিত্র এবং বিবরণ এ বিষয় নিয়ে গবেষণার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু তাঁর আলোচনা মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম রাজধানী গৌড়ের দুর্গ ও নগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে জন হেনরি র‍্যাভেনশোর (John Henry Ravenshaw) *Gaur;Its Ruins and Inscriptions,*[২] আবিদ আলীর (Abid Ali) *Memiors of Gaur and*

---

১. Henry Creighton, *Ruins of Gaur*: Described and represented in eighteen views, with a topographical map, London, 1817 A.D.

২. John Henry Ravenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

Pandua[৩] গ্রন্থে গৌড় ও পান্ডুয়ার স্থাপত্য আলোচনায় তোরণ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। আলেকজান্ডার কানিংহাম (Alexander Cunningham) তাঁর *Archaeological Survey of India, Report of a Tour in Bihaar and Bengal (1879-80 A.D.)*[৪] রচনায় গৌড় ও পান্ডুয়ার পাশাপাশি ঢাকার তোরণগুলোরও কিছুটা উল্লেখ করেছেন।

বাংলা স্থাপত্যের সামগ্রিক আলোচনার পথিকৃত হলেন আহমেদ হাসান দানী (Ahmed Hasan Dani)। কিন্তু তাঁর রচিত *Muslim Architecture in Bengal*[৫] গ্রন্থটিতে সমগ্র বাংলার সুলতানী, মুঘল ও নবাবী আমলের স্থাপত্যকীর্তি বিশ্লেষণে একক বৈশিষ্ট্যধারী তোরণ সম্পর্কিত আলোচনা সীমিত স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে জর্জ মিশেল (George Michell) সম্পাদিত *The Islamic Heritage of Bengal*,[৬] এ বি এম হোসেন (A. B. M. Husain) সম্পাদিত *Gawr-Lakhnawti, Sonargaon-Panam*[৭] প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পর্কে একই ধরনের মন্তব্য করা যায়। এ সকল গ্রন্থাবলী ছাড়া পারভীন হাসানের (Perween Hasan) *Saltanate Mosque Type of Bengal:Origin and Development*,[৮] এবং মাহমুদুল হাসানের (Mahmudul Hasan) *Pre-Mughal Mosque in Bengal* গ্রন্থে সুলতানী আমলের মসজিদগুলোর আলোচনায় তোরণসমূহের কিছুটা উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা যেমন, *Journal of Asiatic Society of Bengal, Journal of Asiatic Society of Bangladesh,*

---

৩. Abid Ali, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D.

৪. A. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing house-1994 (reprint), vol. xv.

৫.Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Socicty of Pakistan, Dacca-1961 A.D.

৬. George Michel(edt.), *Islamic Heritage in Bengal,* UNESCO, 1984, A.D.

৭. A.B.M.Hussain (edt.),*Gawr-Lakhnawti, Sonargaon-Panam*, Asiatic Society of Bangladcsh, Dhaka-1997 A.D.

৮. Perween Hasan, *Saltanate Mosque Type of Bengal: Origin and Development*, (Unpublished Ph.D Thesis) Harverd University.

Dhaka University Institutional Repository

Journal of Bengal Art, Journal of Varendra Research Museum, Dhaka University Studis, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতিতে অন্যান্য স্থাপত্য নিয়ে আলোচনাকালে প্রসঙ্গত দু-এক জায়গায় তোরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলার তোরণ নিয়ে একক আলোচনা প্রথম পাওয়া যায় শরীফ উদ্দিন আহমেদ (Sharif Uddin Ahmed) সম্পাদিত *Dhaka Past Present Future*[৯] গ্রন্থের আবু এইচ ইমামুদ্দিন (Abu H Imamuddin), শামীম আরা হাসান (Shamim Ara Hasan) এবং ওয়াহিদুল আলম (Wahidul Alam) রচিত "Gate Architecture in Dhaka" অংশটিতে। এখানে ঢাকায় মুঘল যুগে নির্মিত তোরণসমূহের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য আলোচনার পাশাপাশি সমকালীন রাজনীতি ও নগরায়নে এর গুরুত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তোরণ স্থাপত্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু স্থান এবং বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলার তোরণ স্থাপত্যের সামগ্রিক চরিত্র নির্ধারণ তথা এর উপর ভিত্তি করে সমকালীন শাসকগোষ্ঠির রাজনীতি, প্রশাসন, সমাজনীতি, তাঁদের গৃহীত নির্মাণ কৌশল এবং এ অঞ্চলের জনসাধারণের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। অথচ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে বাংলায় নির্মিত তোরণ স্থাপত্যকে এ সকল বিষয়াদির নীরব সাক্ষী বলা যায়।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহুকাল পূর্ব থেকে এ অঞ্চলে তোরণ নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সাহায্যে পাল ও সেন আমলে নির্মিত বিহারগুলোতে তোরণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[১০] আরও জানা যায়, এগুলো ইট নির্মিত এবং টেরাকোটায় অলংকৃত ছিল। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে পঞ্চদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত প্রাপ্ত শিলালিপি ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক বর্ণনায় রাজধানী গৌড়

---

৯. Sharif Uddin Ahmed (edt.), *DHAKA – PAST PRESET FUTURE*, Dhaka, The Asiatic Society of Bangladesh-1991 A.D.

১০. নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), কলিকাতা:দে'জ পাবলিশিং ১৩৫৬ সাল (বাংলা) পৃ.৬৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ও পান্ডুয়াসহ অন্যান্য নগরেও তোরণ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই বর্তমানে টিকে নেই।

স্থাপত্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কাঠামোগত উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা এর গঠন প্রকৃতি, নির্মাণ কৌশল, অলংকরণ তথা এর অবস্থান বিশ্লেষণপূর্বক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যা ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুরূহ। বাংলায় পঞ্চদশ শতকের পূর্বে নির্মিত তোরণ টিকে না থাকায় এ শতাব্দীকে বর্তমান গবেষণার প্রারম্ভ বিন্দু ধরা হয়েছে।

পঞ্চদশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা স্থাপত্য তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে। এ অঞ্চলের স্থানীয় ঐতিহ্য কুঁড়েঘর থেকে গৃহীত বাঁকানো কার্নিশ, কোণা বুরুজ, চালাছাদ প্রভৃতি উপাদান এবং সম্পূর্ণ ইটের নির্মাণ ও টেরাকোটা সজ্জায় এর স্বকীয় রূপ ফুটে উঠে। এ সময়ে নির্মিত তোরণগুলোতে এ সকল উপাদানের স্বার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকের শেষভাগে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের নিজস্ব রীতির স্থলে শাসকগণ কর্তৃক আনিত উত্তর ভারতীয় রীতি প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্যান্য স্থাপত্যের ন্যায় তোরণ নিমার্ণেও স্থান করে নেয় মুঘলদের পরিকল্পনাগত জটিলতা ও আকৃতিগত বিশালতা । কিন্তু বাংলায় তাদের সামগ্রিক পরিকল্পনার স্বার্থক প্রকাশ ঘটেনি, বরং নির্মাণে সহজলভ্য উপাদান ইটের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা মুঘল তোরণগুলো একটি স্থানীয়রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে উত্তর ভারতের সমকালীন বিশালাকার তোরণগুলো থেকে বাংলার তোরণগুলোকে সহজেই আলাদা করা যায়। সপ্তদশ শতকের পরে এ অঞ্চলে তোরণ নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীন নবাবী আমল প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা স্থাপত্যে 'মুর্শিদাবাদ রীতি' নামে একটি নতুন রীতি গড়ে উঠে। তোরণ স্থাপত্যে এ সময়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না বিধায় গবেষণার বিষয়বস্তু সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সমকালীন বাংলার রাজধানীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নগর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিকে থাকা তোরণগুলো নিয়ে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো- এগুলোর স্থাপত্যিক ও আলংকারিক চরিত্র নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থাপত্যিক উৎসের অনুসন্ধান, বাংলা স্থাপত্যে এর অবস্থান নির্ণয় এবং এ সকল সূত্র ধরে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব অন্বেষণ। এ উদ্দেশ্যে আলোচিত বিষয়কে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা স্থাপত্যের রাজনৈতিক পটভূমি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ অঞ্চলে তোরণ স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ, তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত টিকে থাকা তোরণগুলোর স্থাপত্যিক বর্ণনা - এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তু ক) সুলতানী ও খ) মুঘল শিরোনামে উপ-বিভাজন করা হয়েছে। পরিশেষে বাংলার তোরণ স্থাপত্যের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন দ্বারা সমকালীন ইতিহাস চর্চায় এর গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পটভূমি

মুসলিম বিজয়ের পর প্রতিষ্ঠিত 'বাঙ্গালা' রাজ্য যে প্রাচীন 'বঙ্গ' অঞ্চলের নামানুসারে হয়েছে তা আজ প্রায় সর্বজন স্বীকৃত মত। বঙ্গ অঞ্চলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক যুগে।[১১] বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও বঙ্গের নামোল্লেখ রয়েছে। এখানে দেশের নাম বঙ্গ এবং অধিবাসীকে বঙ্গাল বলা হয়েছে।[১২] মিনহাজ-ই-সিরাজ বাংলা বিজয়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার সময় 'বাঙ্গালা' নামের উল্লেখ না করে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ নামে এর বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন।[১৩] পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারানী সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দটি ব্যবহার করেন।[১৪] ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলিয়াছ শাহ্ (১৩৪২-৫৮ খ্রিঃ) তৎকালীন লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও একত্রিত করে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে একক রাষ্ট্র গঠন করলে শামস-ই-সিরাজ তাঁকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালীয়ন' রূপে উল্লেখ করেন।[১৫] এর পর থেকে 'বাঙ্গালা' নামের একক রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের একটা সুস্পষ্ট ভৌগোলিক বিবরণ আবুল ফজল বর্ণিত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনানুযায়ী, তৎকালীন সুবা বাংলা পশ্চিমে তোলয়াগড় হতে পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৬] সুলতানী যুগে এই সীমা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলেও মুঘল যুগে এসে তা আবুল ফজল বর্ণিত সীমায় স্থিতি লাভ করে। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চল

---

১১. রাখাল দাশ বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* - ১ম খন্ড, কলকাতা-১৯৯৫ (পূর্নমুদ্রণ), পৃ. ১৫।

১২.মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরানো বাংলার বৌদ্ধ গান ও দোঁহা*, কলকাতা- ১৩৮৮, পৃ. ১৬, ৬৫।

১৩. মিনহাজ -ই- সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী -১৯৮৩, পৃ. ২৬।

১৪. জিয়াউদ্দিন বারানি, *তারিখ-ই-ফীরূজশাহী*, পৃ.৫৩, ৯৩, ৫৯৩,- সূত্র, আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৩, পৃ.২।

১৫. শামস-ই-সিরাজ আফীফ, *তারীখ-ই-ফীরূজশাহী*, পৃ.১১৪-১১৮, সূত্র- *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২।

১৬. Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, translated by H.S. Jarret, vol-2, Delhi: Low Price Publications-1989 A.D. p.129-30. তিনি এখানে ফার্সী 'বাঙ্গালা' কে ইংরেজী 'বেঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

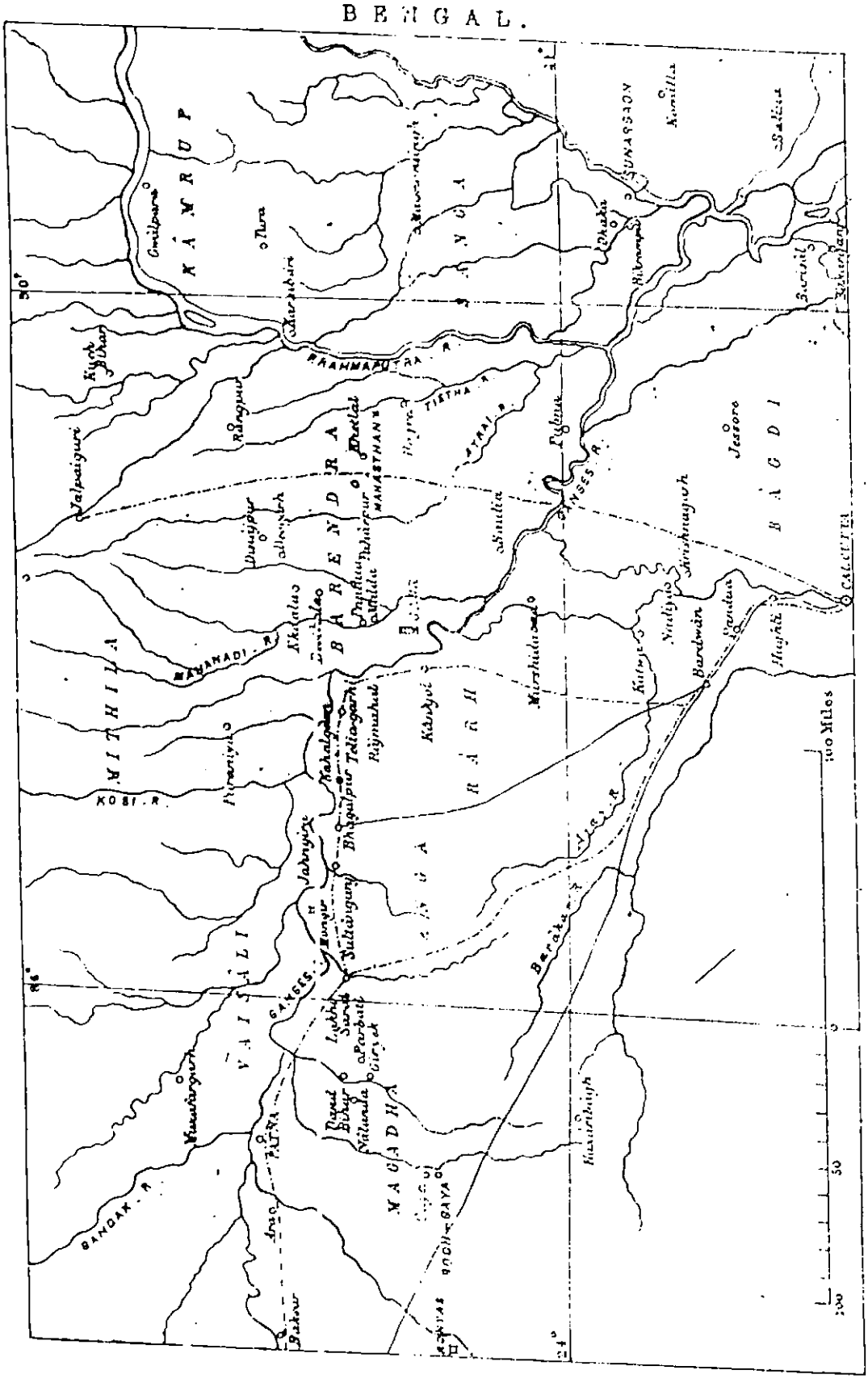

প্লেট-কঃ মধ্যযুগীয় বাংলার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

'বেঙ্গল'(Bengal) নামে প্রচলিত হয় (প্লেট-ক)। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভক্তির ফলে এর পূর্ব অংশ পাকিস্তানের 'পূর্ব পাকিস্তান' এবং পশ্চিম অংশ 'ভারতে'র 'পশ্চিম বঙ্গ' প্রদেশ নামে বাংলা বিভক্ত হয়ে যায়।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের ভাগ্যান্বেষী ইখতিয়ার উদ্দিন-মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিজয়ের[১৭] মধ্য দিয়ে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ইতিপূর্বে এ অঞ্চল ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন আর্দশে পরিপুষ্ট। মুসলিম বিজয়ের ফলে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের ভিত্তিতে বাংলার ইতিহাসে একটি নব ধারা সংযোজিত হলো। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে এই পরিবর্তন বিস্তার লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস এদেশে মুসলিম বিজয়ের সমসাময়িক। তবকাত-ই-নাসিরীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, বখতিয়ার খলজী ও তার আমীরগণ বিজিত স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, খান্‌কা নির্মাণ করেন।[১৮] মিনহাজের বর্ণনায় আরও জানা যায়, পরবর্তী সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী (১২১২-২৭ খ্রিঃ) ছিলেন বৃহৎ নির্মাতা। তিনি লখনৌতি শহরের একটি তোরণসহ বসনকোট দুর্গ (এর অবস্থান ছিল লখনৌতিতে)[১৯] ও আরও অনেক মসজিদ, কলেজ ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লীর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর বর্ণনায়ও বাংলার বিদ্রোহী শাসক

---

১৭. এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ, *মুদ্রা ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি (১২০০-১৫৩৮)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৯৯ খ্রিঃ. পৃ. ৬৩। গৌড় বিজয়ের তিনটি 'স্মারক মুদ্রা' দিল্লী, লন্ডন ও ওয়াশিংটন ডি. সি.(স্মিথসোনিয়ান যাদুঘরে) রক্ষিত আছে, সুখময় মোখপধ্যায়, *বাংলার মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব*, পৃ. ১২।

১৮. মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী -১৯৮৩, পৃ. ২৯।

১৯. মীনহাজ-ই-সিরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তুগ্রিল কর্তৃক নির্মিত শহর ও প্রাসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০] পরবর্তী শাসক রুকুনুদ্দিন কায়কায়ুসের সময় হতে মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার সাধন, মাদ্রাসা, ব্রিজ এবং অন্যান্য পূর্ত ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত প্রচুর শিলালিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সকল ইমারতের সবগুলোই স্মৃতির পাতায় স্থান করে নিয়েছে। ফলে মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরে নির্মিত ইমারতের স্থাপত্যিক চরিত্র, নির্মাণ পদ্ধতি ও অলংকরণ অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়ে গেছে। তবে এ সকল স্থাপত্য সম্পর্কে কিছু সাধারণ অনুমান করা যায়। বিজেতাগণ যে দেশ বা অঞ্চল থেকে আগমন করেন সাধারণভাবে সে দেশ বা অঞ্চলের ইমারতের পরিকল্পনাই প্রথমে অনুসরণ করেন ; বাংলা স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা বিজয়ের পর হতে পরবর্তী প্রায় একশ ত্রিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বেশীরভাগ সময় বাংলা দিল্লীর অধীনে ছিল। ফলে তাদের নির্মিত ইমারতগুলোতে সম্ভবত দিল্লী এবং পারসিক রীতিরই প্রতিফলন ঘটেছিল।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকের কয়েকটি ইমারত এ অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে। হুগলী জেলায় অবস্থিত জাফর খান গাজীর মসজিদ ও সমাধি (নি: ১২৯৮-১৩১৩ খ্রিঃ)[২১], শাহ্ সফিউদ্দিনের সমাধি, ছোট পান্ডুয়ায় অবস্থিত বড়ি মসজিদ (আ: ১৩৪২ খ্রিঃ)[২২] ও এর নিকটবর্তী একটি মিনার বিদ্যমান নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। যদিও ইমারতগুলোর বেশীরভাগ অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সংস্কারকৃত, তথাপি এগুলোর বৈশিষ্ট্যাদি থেকে তৎকালীন নির্মাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ সময়ের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় খিলান, গম্বুজ ব্যবহৃত হলেও এ অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পার্থক্যের বিষয়টি যে

---

২০. Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Bibliotheca Indic Series, 1862, p. 19.

২১. A.Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions in Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, -1992 A.D. pp. 53-55

২২. A.H.Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan-1961 A.D. fig. 8.

Dhaka University Institutional Repository

তখন থেকেই শাসকদের মাথায় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মসজিদগুলোর সাহান বিহীন পরিকল্পনায়। বৃষ্টিবহুল আবহাওয়ার কারণে সম্ভবত উন্মুক্ত অঙ্গনের নির্মাণ প্রথম থেকেই বর্জিত হয়েছে।[২৩] তাছাড়া নির্মাণ উপকরণ হিসেবে স্থানীয়ভাবে তৈরি ইট ও অলংকরণে টেরাকোটার ব্যবহার, এ অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার যে কয়েকটি নিদর্শন মহাস্থান, ময়নামতি ও পাহাড়পুরে আজও পরিলক্ষিত হয়, এর প্রত্যেকটিই পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সজ্জিত ছিল। তবে ধর্মীয় কারণে মুসলিম ইমারতসমূহে পূর্ববর্তী মূর্তিবাচক ফলকের পরিবর্তে লতা-গুল্ম বা বিমূর্ত নক্শাকে গ্রহণ করা হয়েছে।[২৪] স্থাপনা কৌশলের ক্ষেত্রে এ সময় গম্বুজের অবস্থান্তর প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমিক সমতল ও কৌণিক ইটের বিন্যাস দ্বারা গঠিত কর্বেল পান্দানতিফের[২৫](Pendentive) ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। বলা যায়, বাংলার রাজনীতি তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ সময়টি ছিল পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও গ্রহণ-বর্জনের কাল।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন হাজী ইলিয়াস নামক অপর এক ভাগ্যান্বেষী। তিনি ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন এবং ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সাতগাঁও ও সোনারগাঁও অধিকার করে সমগ্র বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি হন। কিন্তু তুঘলকদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে তিনি এ অঞ্চলে যে স্বাধীন রাষ্ট্র ও বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দিল্লীর তুঘলকীয়

---

২৩. পরবর্তীকালে নির্মিত উন্মুক্ত সাহান সম্বলিত আদিনা মসজিদটিকে (১৩৭৫ খ্রিঃ) ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ বলা যায়।

২৪. পবিত্র কোরআনে প্রাণীবাচক মোটিফের ব্যবহার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে হাদীসে প্রতিকৃতি অঙ্কন ও ভাস্কর্য তৈরী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন– Arnold, *Painting in Islam*, New York-1965 A.D. pp, 1-85.

২৫.এ বি এম হোসেন এরূপ নির্মাণকে বাংলা পান্ডানতিফ বলে আখ্যায়িত করেন। সুলতানী বাংলার স্থাপত্য – একটি পর্যালোচনা, *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ-চৈত্র ১০ম বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা-১৯৭৮, পৃ.৩০। তবে এ ধরনের সমান্তরাল ও কৌণিক ইটের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার দ্বারা তৈরী পান্দানতিফ ইতিপূর্বে ইরান ও মধ্য এশিয়ার ইমারতে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ আর্দিস্তানের জামি মসজিদ (১০৫৫-৫৮ খ্রিঃ) এবং ইস্ফাহানের জামী মসজিদের (১০৮৮ খ্রিঃ) উল্লেখ করা যায়, (A.U. Pope, *Survey of Persian Art,* vol-iv, New York,1945 A.D. p. 243, 246, 326.

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ফিরোজ শাহ্ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তবে ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-৫৮খ্রিঃ) এবং তার পুত্র ও পরবর্তী সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৮-৭৯) স্থানীয় জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতায় এ আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। জনগণের সহযোগিতা এ বংশের শাসকদেরকে একদিকে যেমন স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে, অন্যদিকে দিল্লীর সাথে রাজনৈতিক দুরত্ব এবং পারস্যের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক[২৬] বাংলা স্থাপত্যের সমন্বয়ধর্মী চরিত্র গঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

এ সময়ের (১৩৪২-১৪১৪ খ্রিঃ) প্রতিনিধিত্ব করে টিকে আছে মাত্র তিনটি ইমারত। এগুলোর মধ্যে তৎকালীন বাংলার রাজধানী পান্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা মসজিদ (নিঃ ১৩৭৫ খ্রিঃ) ও এর সাথে সংযুক্ত সিকান্দার শাহের সমাধি (নিঃ আঃ ১৩৯২ খ্রিঃ) অন্যতম। আদিনা মসজিদের পরিকল্পনায় 'ঐতিহ্যগত উন্মুক্ত অঙ্গন বিশিষ্ট হাইপোস্টাইল পদ্ধতি' গ্রহণ করা হলেও নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ও পাথর এবং অলংকরণে টেরাকোটা ও পাথর খোদাই রীতি গৃহিত হয়েছে। বাংলার কারিগরগণ এ সকল ইমারতে যে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগ এবং দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কবর ফলকের গাত্রে, আদিনা মসজিদের মিহরাব, টিমপেনাম, মাকসুরা (বাদশাহ্ কা তখত্ হিসেবে পরিচিত) ও দরজার প্যানেল অলংকরণের সামগ্রিকতায়। ফলে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে অলংকরণের প্রাচুর্য স্থান লাভ করে। মূলতঃ এ সময়ে বাংলায় বিকশিত স্থাপত্য ও অলংকরণের রীতি পরবর্তী স্থাপত্যের দিক নির্দেশনা দান করেছিল।

ইলিয়াস শাহী শাসনের সংকটময়কাল আরম্ভ হয় ১৫শ শতকের গোড়ার দিকে। স্থানীয় উপাদানের প্রতি শাসকদের সদয় আচরণ ও নির্ভরশীলতা এ অঞ্চলে উন্নত সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিকাশের পাশাপাশি স্থানীয় শক্তিশালী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটাতেও সাহায্য করে। এই শ্রেণীর অন্যতম রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা দখল করে নিলে প্রায় অর্ধ শতাব্দিরও অধিককাল

---

২৬. আ.করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৭, পৃ. ২০২,২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

জুড়ে বাংলায় যে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য বিখ্যাত সুফী নুর-কুতুবুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে আমন্ত্রণ জানান এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ফলস্বরূপ রাজা গনেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্' উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এভাবে ইসলামের ব্যানারে স্থানীয় শক্তি ক্ষমতায় আসার ফলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও কার্যকরী রূপে পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে স্থাপত্যের কাঠামো এবং মটিফ ব্যবহারে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত রীতির উপর স্থানীয় ঐতিহ্য পরিব্যাপ্ত হয়ে একটি নতুন ধারার উদ্ভব ঘটায় যা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের চরিত্রে পরিণত হয় এবং 'বাংলা রীতি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

রাজা গনেশ উদ্ভূত বংশের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালে (১৪১৫-১৪৩৫-৩৬ খ্রিঃ)[২৭] নির্মিত খুব অল্প সংখ্যক ইমারত এই রীতির প্রতিনিধিত্ব করছে। এগুলোর মধ্যে পান্ডুয়ায় অবস্থিত জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৫-৩২খ্রিঃ) সমাধি হিসেবে পরিচিত একলাখী সমাধি[২৮] বাংলা স্থাপত্যের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। সামগ্রিকভাবে ইটের তৈরী এই ইমারতটিতে প্রথম মূল পরিকল্পনার বাইরে সংযুক্ত অষ্টকোণাকার কোণা বুরুজের ব্যবহার ও বাঁকানো কার্নিশ গৃহীত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্থানীয় কুড়ে ঘর থেকে গৃহীত এবং বাংলার নিজস্ব সম্পদ রূপে পরিগণিত। তাছাড়া এর প্লাষ্টারবিহীন দেয়ালে টেরাকোটা অলংকরণে পূর্ণসজ্জার যে রীতি প্রচলিত হয়েছে, তা পরবর্তী সুলতানী স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। ফলে ইমারতটিতে স্কুইঞ্চ, খিলান, গম্বুজ এবং টালী নক্শা প্রভৃতি বহির্দেশীয় উপাদানের ব্যবহার সত্ত্বেও কার্নিশের ধনুকবক্রতা, অষ্টকোণাকার কোণা বুরুজ এবং

---

২৭. আব্দুল করিম, *পূর্বোক্ত (সুলতানী আমল)*, পৃ. ২২৮, ২৬২ ।

২৮. বুকানন ইমারতটিকে গিয়াস উদ্দিন, জয়নুল আবেদিন ও আওজুদ্দিনের সমাধি বলে উল্লেখ করেন। Montgomery Martin, *Eastern Indiya; The History, Antiquities, Topography and Statistics*, vol-iii, India, Cosmo Publications-1976, p.649. তবে বেশিরভাগ স্থাপত্য বিশারদের মতে এটি জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সমাধি।

Dhaka University Institutional Repository

বহির্গাত্রস্থ পোড়ামাটির অলংকরণ একে বাংলা স্থাপত্য রীতির প্রথম বিদ্যমান উদাহরণে পরিণত করেছে। এই রীতি সমগ্র সুলতানী আমল জুড়ে বাংলা স্থাপত্যের চরিত্র রচনা করে। ঠিক একই রকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এ সময়ের নির্মাণ হিসেবে বিবেচিত, গৌড়ের 'চিকা বিল্ডিং' নামে পরিচিত ইমারতে। একে মসজিদ, সমাধি, জেলখানা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর গঠন এবং একটি স্তম্ভযুক্ত কমপ্লেক্সের ধ্বংসস্তূপের পূর্বদিকে এর অবস্থান দেখে অনুমিত হয় যে, এটি উক্ত কাঠামোর প্রবেশ তোরণ ছিল। যদি তাই হয় তবে এটি হবে বাংলায় নির্মিত তোরণ স্থাপত্যের টিকে থাকা আদি নির্দশন।[২৯]

১৩৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াছ শাহের বংশধর নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ গণেশীয় বংশের বিলুপ্তি ঘটিয়ে দ্বিতীয় ইলিয়াছ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী শাসনকালে এ অঞ্চলের শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পূর্ববর্তী রীতির পরিবর্তন না হয়ে বরং উৎসাহিত হয় এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক প্রশান্তির ফলে তা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। এর প্রকাশ সমসাময়িক স্থাপত্যশিল্পে অধিকতর বাস্তবধর্মী রূপ নিয়ে বাংলা স্থাপত্যে উচ্চাঙ্গ রীতির জন্ম দিয়েছে যা ইমারতের বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত অলংকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইমারতসমূহ কোণা বুরুজ ও বাঁকানো কার্নিশ দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে। একঘেঁয়েমি দূরীকরণে দেয়ালগাত্র উদ্‌গত ও প্রবিষ্ট প্যানেলে বিভক্ত করে তাতে টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত করার রীতি প্রচলিত হয়। এ সময়ে রাজধানী গৌড় এবং এর বাইরের ইমারতগুলোতে একই স্থাপত্যিক ও আলংকারিক রীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজধানী গৌড়ে সে সময়ের জমকালো ইমারতগুলো এখনও টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে গৌড় নগরীর তোরণসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এ সময়ে নির্মিত দাখিল দরওয়াজাটি বাংলার তোরণ স্থাপত্যের

---

২৯. এ সর্ম্পকে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (চিকা ইমারতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে টিকে আছে। এটি তৎকালে বাংলায় বিকশিত উচ্চাঙ্গ রীতির পরিচয় বহন করছে। গৌড়ের বাইরে বাগেরহাটের খান জাহান কর্তৃক নির্মিত ইমারতসমূহ উল্লেখের দাবী রাখে। এগুলো কাঠামোগত দিক থেকে গৌড়ের ইমারত অপেক্ষা কিছুটা সরল এবং স্বল্প অলংকরণ সমৃদ্ধ। ষাট গম্বুজ মসজিদের[৩০] পূর্ব তোরণটি পরবর্তীকালে সংস্কারকৃত হলেও এর নির্মাণশৈলী ও অলংকরণ এ অঞ্চলে বিকশিত 'বাংলা রীতির' পরিচয় বহন করে টিকে আছে। তবে মসজিদটি একটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ, তা হলো এর কেন্দ্রীয় 'বে'তে (bay) চৌচালা রীতির ভল্টের ব্যবহার। স্থানীয় চালা আচ্ছাদন থেকে গৃহীত এই রীতি বাংলা স্থাপত্যের পরিচয়বাহী অপর এক উপাদান যা সমসাময়িক মুসলিম স্থাপত্য থেকে একে আলাদা রূপ দান করেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় ইলিয়াছ শাহী শাসনামলে বাংলার শিল্পকলা, সাহিত্য তথা সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে 'বাংলা রীতি' যে উচ্চাঙ্গ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তা পরবর্তী হাফসী শাসনামলে (১৪৮৬-১৪৯৩ খ্রিঃ) স্থিমিত হয়ে যায়। এ সময়কালকে বাংলার ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ শাসক সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ্ হাফসী খোজা শাহ্ জাদা কর্তৃক নিহত হলে তিঁনি বারবাক শাহ্ উপাধি ধারণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমিরুল উমারা মালিক আন্দিল তাকে হত্যা করেন এবং সাইফ উদ্দিন ফিরোজ শাহ্ উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আবিসিনীয়দের শাসনামলে শুধুমাত্র তাঁর সময়েই (১৪৮৭-৮৯খ্রিঃ) নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উল-সালাতিন' গ্রন্থে গৌড় শহরে সাইফ উদ্দিন কর্তৃক একটি মসজিদ, একটি মিনার ও পানির নহর নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে।[৩১] বর্তমানে শুধু মিনারটি টিকে

---

৩০. এই মসজিদের নির্মাতা খান জাহান (প্রচলিত) ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন– A. Karim, *Corpus, pp*, 138, 139.

৩১. Ghulam Hussain Salim, *Riyaz -us- Salatin* (1898 A.D.) Eng. Tr.by Muhammad Salim, Delhi-1903, p. 125.

Dhaka University Institutional Repository

আছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সময়ের নির্মাণে পূর্ববর্তী ইলিয়াছ শাহী ধ্যান ধারণা ও ঐতিহ্যেরই ব্যবহার হয়েছে।

তবে হাফসী শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের অবসান ঘটে মুজাফ্ফর শাহের (১৪৮৯-৯৩ খ্রিঃ) মৃত্যুর পর। এ সময় বাংলার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হুসাইন জনগণের অনুরোধে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিঁনি নিজের নামানুসারে হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের সুলতানগণ শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে গোগড়া ও গঙ্গা নদী, পূর্বে চট্রগ্রাম এবং উত্তরে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটান। এতদ্বঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জনগণের মেধার বিকাশ ঘটে। এ সময় রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায় 'মহা-ভারতের' বাংলা অনুবাদ রচিত হয়। তাছাড়া বাংলায় আরবী ও ফারসী সাহিত্য চর্চায়ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগের উপাদানগত সমৃদ্ধির বাস্তব রূপ দেখা যায় ইমারত নির্মাণে। বাংলায় টিকে থাকা সুলতানী স্থাপত্যের তিন-চতুর্থাংশ ইমারত সুলতান হুসেন শাহ্ এবং তাঁর পুত্র নসরত শাহের শাসনামলে নির্মিত হয়েছে। এগুলো নির্মাণে পরবর্তী ইলিয়াছ শাহী রীতিরই পুনর্ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের বেশিরভাগ ইমারতের গম্বুজ ও খিলান বাদে দেয়ালগুলো পাথরে আবৃত এবং পাথরখোদাই এবং রিলিফ অলংকরণে সজ্জিত। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের তোরণ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ), বড় সোনা মসজিদের তোরণ (১৫২৫ খ্রিঃ) এই রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্ববর্তী শাসনামলের ন্যায় ইটের নির্মাণেরও প্রচলন লক্ষ্য করা যায় রাজশাহীর বাঘা মসজিদের তোরণের (৯৩০ হিঃ/ ১৫২৩-২৪ খ্রিঃ) সামগ্রিকতায়। তবে অলংকরণের ক্ষেত্রে টেরাকোটার পাশাপাশি পাথরখোদাই রীতির পুনর্জাগরণ ঘটলেও মটিফ নির্বাচনে টেরাকোটাকেই অনুসরণ করাতে বৈচিত্রের ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। এ সময়ে চকচকে টালির ব্যবহার হুসেনশাহী স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গৌড়ের গোমতি দরওয়াজায় (আ:১৬শ শতকের প্রথম ভাগ) প্রচুর টালি অলংকরণের ব্যবহার দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। তাছাড়া এর একগম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার অবয়ব, বক্র কার্নিশ ও কোণা বুরুজের ব্যবহার একলাখী সমাধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত: শতাব্দীকাল পূর্বে স্থানীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় সাধন করে যে 'বাংলা রীতির' বিকাশ ঘটেছিল তা সমগ্র সুলতানী আমল (১৫৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত) জুড়ে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী স্থাপত্যের দিক নির্দেশনা দিয়েছিল।

হুসেন শাহী শাসনামলের নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রশান্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে ১৫৩৮ খ্রিঃ শুরগণ বাংলা দখল করে নিলে প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান ঘটে। শুর শাসন অতি অল্প সময় ছিল এবং তাদের সাথে কররানীদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে তেমন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ঘটে নাই। ইমারত শিল্পের ক্ষেত্রে রাজশাহীর কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮ খ্রিঃ), ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রামে নির্মিত কুতুব মসজিদ (১৬শ শতকের শেষ ভাগ) সুলতানী যুগে বিকশিত রীতিরই পরিচয় বহন করছে। মূলত, উত্তর ভারতে আফগানগণ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র ও উৎকর্ষ আনয়ন করেছিল তা বাংলায় লক্ষ্য করা যায় না।

আফগানগণ স্বাধীনতা ঘোষণা কিংবা সুলতান উপাধি গ্রহন না করলেও প্রায় ৩৫ বৎসর কার্যত স্বাধীন ভাবেই বাংলা শাসন করছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এ অঞ্চল মুঘলদের অধীনে চলে যায়। কিন্তু তাদের আধিপত্য রাজমহল ও তার আশে পাশেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কেননা ততদিনে আফগানদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে সমগ্র বাংলায় স্থানীয় জমিদারদের অপ্রতিরোধ্য প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছিল। তাঁরা একত্রে বাংলার ইতিহাসে 'বার ভূইয়া' নামে পরিচিত। তাঁদের নেতা ঈশা খাঁন সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করে পূর্ব বাংলা শাসন করছিলেন। এমতাবস্থায় মুঘল সম্রাট আকবর 'দীন-ই-ইলাহী' মতবাদের প্রবর্তন করলে বাংলায় মুঘল কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহীদের অন্যতম মাসুম খাঁন কাবুলী বার ভূঁইয়াদের সাথে যোগ দেন। বহুদিন যুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিগ্রহ চলার পর ১৬১২ খ্রিঃ এ মুঘলগণ সমগ্র বাংলার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি তাঁদের অন্যতম সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়।

এ সময়কাল পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তেমন পরিবর্তন আসেনি। যে অল্প কয়েকটি ইমারতের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা হুসেন শাহী রীতির পতনের চিহ্ন বহন করছে। পান্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদ (১৫৮৫ খ্রিঃ) এবং পুরাতন মালদহের জামী মসজিদের তোরণে (১৫৯২ খ্রিঃ) এ সময়ের নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিঃ) শাসনামলে বাংলা সম্পূর্ণভাবে মুঘলদের অধীনে চলে গেলে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন রীতির উদ্ভব ঘটে। এ রীতি পারস্যের তৈমুরীয় ঐতিহ্যের সাথে ভারতের স্থানীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে ইতিপূর্বে মুঘলদের নিজস্ব রীতিতে আগ্রা, লাহোর, ফতেহপুর সিক্রী ও দিল্লীতে গৃহীত হয়েছে। তবে, সম্ভবত বেলে পাথর এবং মার্বেল পাথরের অপ্রতুলতা এবং স্থানীয় উপাদান ইটের ব্যবহারের ফলে বাংলায় মুঘলরীতি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত না হলেও পরিকল্পনা, নির্মাণ কৌশল এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে এ সময় ভিত্তিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী প্লাষ্টারবিহীন ও টেরাকোটা সমৃদ্ধ দেয়ালে প্লাষ্টার এবং প্যানেল নক্শা স্থান করে নেয়। এ সময়ে বহুখাঁচ খিলান, চতুর্কেন্দ্রিক খিলান প্রভৃতি খিলানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা রীতির বাঁকানো কার্নিশ মুঘল আমলে সমান্তরাল হয়ে যায়। সর্বোপরি ইমারতের উচ্চতা ও গম্বুজ নির্মাণে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বাংলায় মুঘলদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো প্রবেশদ্বারে পারসিক ইউয়ানের ব্যবহার। ইউয়ানগুলো মূল ইমারত হতে কিছুটা উদ্গত এবং উভয় পার্শ্বে সরু সংযুক্ত বুরুজ দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত। রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত বড় কাটরা (১৬৪৪ খ্রিঃ) ইমারতের তোরণটি বাংলায় নির্মিত মুঘল স্থাপত্যের আদি নির্দশন যেখানে ইউয়ানসহ প্রায় সকল মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি একদিকে ইমারতকে রাজকীয় দাম্ভিকতা দান করেছে, অন্যদিকে সুলতানী যুগে

Dhaka University Institutional Repository

খিলানসারি বিশিষ্ট ফাসাদের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়েছে। ঢাকার ছোট কাটরা (আঃ ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) ও লালবাগ কমপ্লেক্সের তোরণগুলোতেও (আঃ ১৭শ শতাব্দী) অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মুঘলগণ বাংলায় স্থাপত্য নির্মাণে উত্তর ভারতীয় রীতির প্রাধান্য দিলেও এ অঞ্চলের স্থানীয় রীতিও যে প্রচলিত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় ইটের ইমারতে বাংলার বাঁশের তৈরী 'দোঁচালা'র অনুকরণে। কিশোরগঞ্জ জেলার এগার সিন্ধুতে অবস্থিত শাহ্ মুহাম্মদের মসজিদের তোরণটি (নি.আ.১৭শ শতক) দোঁচালা রীতির আচ্ছাদন সম্বলিত তোরণ স্থাপত্যের আদি এবং একক নির্দশন। পরবর্তীতে বাংলার বাইরে দিল্লী ও লাহোরে এই বৈশিষ্ট্যটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। সপ্তদশ শতক থেকে বাংলার মন্দির স্থাপত্যে দোঁচালা রীতির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুঘল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলী খাঁন বাংলায় নবাবী আমল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে (১৭০৩ খ্রিঃ) নিয়ে যান এবং নিজের নামানুসারে তা মুর্শিদাবাদ নামকরণ করেন। এ সময়ের স্থাপত্যগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মুঘল স্থাপত্যের উত্তরসূরী হলেও স্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষকরে মসজিদগুলো পূর্ববর্তী তিন গম্বুজের স্থলে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট, সম্মুখ ফাসাদের প্রতিটি প্রবেশ পথ সরু মিনার দ্বারা বিভাজিত এবং এগুলো কার্নিশের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্থিত। তাছাড়া গম্বুজগুলো পলকাটা ও উঁচু ফিনিয়াল বিশিষ্ট এবং ফাসাদ ঘন প্যানেলে সজ্জিত। ঢাকার করতলব খাঁনের মসজিদ (নিঃ ১৭০০-১৭০৪ খ্রিঃ) ও মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ (নিঃ ১৭২৪-২৫ খ্রিঃ) এ যুগের স্থাপত্য রীতির পরিচয় বহন করছে।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলায় ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দর্শনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ের স্থাপত্যে ইউরোপীয় রীতি বিশেষ করে ইংল্যান্ডের প্রভাব স্থানীয় স্থাপত্যের উপর বিস্তার লাভ করে। ঢাকার আহসান মঞ্জিল

Dhaka University Institutional Repository

(নিঃ ১৮৭২ খ্রিঃ), মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারী (নিঃ ১৮২৯ খ্রিঃ) এবং সোনার গাঁয়ের পানাম নগরীর ইমারতসমূহে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।[৩২] এম. ইসলাম, একে 'শংকর রীতি' (Hybrid Style) নামে অভিহিত করেন।[৩৩]

বাংলায় ত্রয়োদশ শতক হতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গড়ে উঠা স্থাপত্য- এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবর্তনের ইতিহাস বহন করছে। বাংলার মাটিতে ধর্ম হিসেবে ইসলামের আবির্ভাব, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম-কান্ডের সাথে বাংলার যোগাযোগ, উত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে বের হয়ে আসার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ইসলামী সংস্কৃতি ও বাংলা কৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন দ্বারা স্বাধীন স্বত্তার বিকাশ এবং পরিশেষে ইউরোপীয় সংস্কৃতির বলয়ে অনুপ্রবেশ প্রভৃতির ইতিহাস বাংলা স্থাপত্যের বিবর্তনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। মূলতঃ বাংলার প্রায় ছয়শত বছরের স্থাপত্যকে এ অঞ্চলের ইতিহাসের নিরব সাক্ষ্য ও অকাট্য দলিল বলা যায়।

---

৩২. Catherine B. Asher, The Mughal and post-Mughal periods, George Michel(edt.), *Islamic Heritage in Bengal,* UNESCO, 1984, A.D. , pp. 210-11.

৩৩. M. Islam, Introducting Bangladesh- a case study for regionalism in *Participants paper from the 2nd regional Seminer for the Aga Khan Awared for Architecture*, Dhaka-1985, pp- 9.1-4-9.

Dhaka University Institutional Repository

তোরণ স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

একটি দেশের স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ নির্ভর করে এতদঞ্চলের জনসাধারণ ও শাসক গোষ্টির চিন্তা, চেতনা, জীবন যাপন পদ্ধতি, ধর্ম, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, আবহাওয়া, মৃত্তিকা, ভূগোল, পারিপার্শ্বিকতা ও শৈল্পিক ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির উপর। তোরণ স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য স্থাপত্যের ন্যায় শাসকদের সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুরক্ষাকে অনুষঙ্গ করে বিকাশ লাভ করে তোরণ নির্মাণ রীতি। সংস্কৃতি নদীর গতির মত, এখানে কোন উপাদানের আর্বিভাব ঘটে ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। তেমনি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে তোরণের সংযোজন কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং বহু পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে তোরণ নির্মাণের ঐতিহ্য ছিল। বর্তমানে এর কোনটা টিকে না থাকলেও বিভিন্ন সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও লিখিত উৎস থেকে এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, বৈদিক যুগে গ্রামের জনসাধারণ ও গৃহপালিত পশুগুলোকে বন্য প্রাণীর আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য এর চারপাশে বাঁশের বেড়া (Palisade) দেয়া হতো।[৩৪] এর এক বাহুতে থাকতো উল্লম্ব ও সমান্তরাল বাঁশ সহযোগে নির্মিত 'গমদ্বার' (Gamadvara) বা প্রবেশ তোরণ (প্লেট-খ)।[৩৫] এরূপ তোরণের নক্শা এখনও ভারুত ও সাঁচীর স্তূপগুলোতে টিকে আছে যা 'তোরণ'(Torana) নামে পরিচিত।[৩৬] বাংলা 'তোরণ' শব্দের উৎপত্তিস্থল সংস্কৃত 'তরণ' যার আভিধানিক অর্থ গমন ও প্রবেশের স্থান বা ফটক।[৩৭] ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতিকালে যে তোরণের অস্তিত্ব ছিল তা এর শব্দগত সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায়। তাছাড়া সমসাময়িক পর্যটকদের বিবরণ থেকে এ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ

---

৩৪. P. Brown, *Indian Architecture, (Buddist and Hindu Period)* Taraporevala Sons and Company, Bombay.India-1875 A.D. p. 3.
৩৫. P.Brown, (*Buddist)*, p. 3.
৩৬. P. Brown, *(Buddist)*, p. 3.
৩৭. জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *বাংলা ভাষার অভিধান,* সাহিত্য সংসদঃ কলিকাতা - ১৯৭৯ পৃ. ১০১২।

Dhaka University Institutional Repository

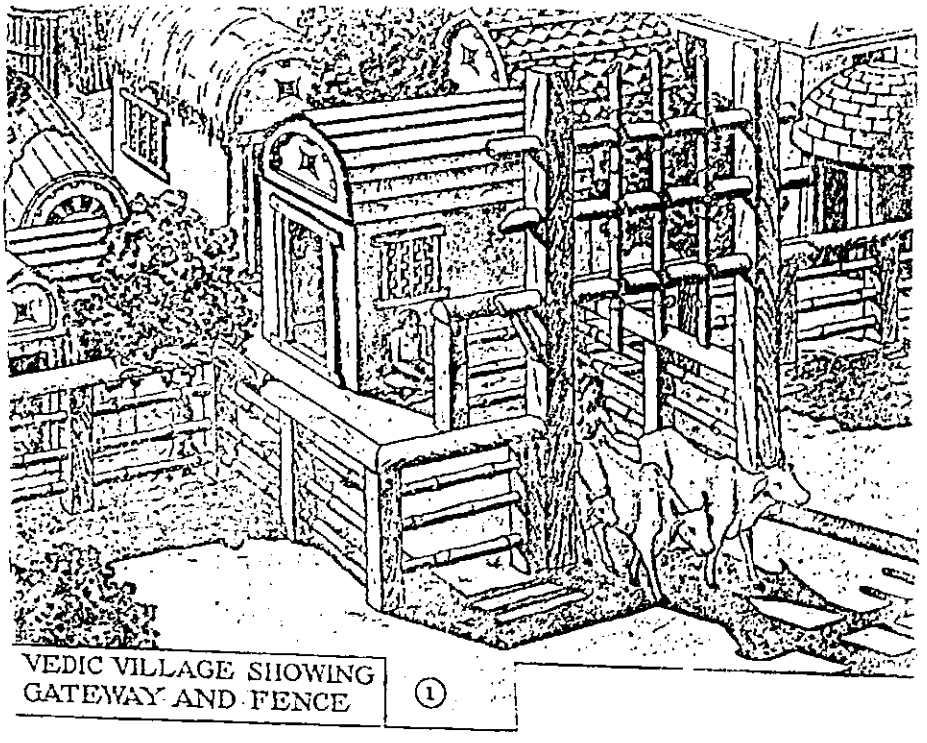

প্লেট খঃ বৈদিক যুগের গমদ্বার

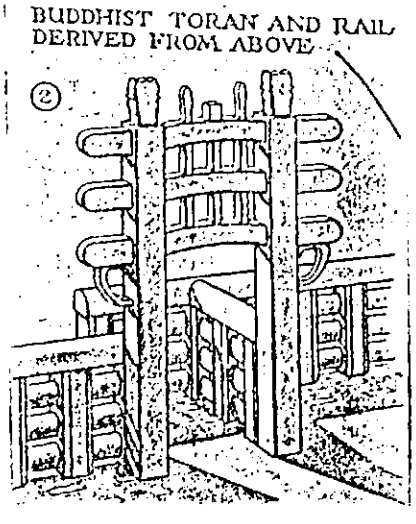

বৌদ্ধ স্তূপের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকে ফা হিয়েন ও সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ বাঙলার সর্বত্র অসংখ্য স্তূপ, বিহার ও দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৩৮] প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে যে বিহার ও মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে তোরণ নির্মাণের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই তোরণগুলো সাধারণত উত্তর বাহুতে কিছুটা বৃহদাকারে নির্মিত হতো। সিতাকুট বিহারের তোরণটি দুটি আয়তাকার স্তম্ভের সমন্বয়ে গঠিত হলেও ময়নামতির শালবন বিহারের প্রবেশ তোরণটি আয়তাকার পর পর দুটি কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত।[৩৯]

বখতিয়ারের বাংলা বিজয়কালে এ অঞ্চলে যে সুরক্ষিত নগর তোরণের অস্তিত্ব ছিল তা মিনহাজের নদীয়া আক্রমনের বর্ণনা থেকে জানা যায়।[৪০] কানিংহাম লক্ষণাবতীর অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে এর উত্তরে 'ফুলওয়ারি দরওয়াজা' ও দক্ষিণে 'পাতালচন্ডী দরওয়াজার' যে উল্লেখ করেছেন[৪১], এগুলোর নামকরণ প্রাক-মুসলিম অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। তবে মাটির উপরে তেমন কিছু টিকে না থাকায় এ সময়ের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা যায়না। বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে এটুকু অনুমান করা যায়, এগুলো ইটের তৈরী এবং টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত ছিল। এ সময়ের নির্মাণে ইটের পাশাপাশি সম্ভবত পাথরেরও ব্যবহার ছিল। আদিনা মসজিদের পশ্চিম ফাসাদে পাথরের কড়ি-বর্গায় নির্মিত প্রবেশদ্বারের কীর্তিমুখ[৪২], এ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ দেয়।

---

৩৮. নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-বাংলা ১৩৫৬ সাল, পৃ, ৬৭৩।

৩৯. বিহার সমুহের ভূমি পরিকল্পনা দ্রষ্টব্য- ভিক্ষু সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫. পৃ. ১৬৫,১৭৪।

৪০. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী -১৯৮৩, পৃ. ২৬।

৪১. Alexander Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72,* Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv. P. 42.

৪২. Fig- 18, A.H. Dani, *Muslim Architecture,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan-1961.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে এ অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার পাশাপাশি[৪৩] আলাদাভাবে তোরণ নির্মাণ সম্পর্কে জানা না গেলেও মিনহাজের বর্ণনায় সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইউয়াজ খলজী (১২১২-১২২৭ খ্রিঃ) কর্তৃক লখনৌতি শহরে একটি তোরণ নির্মাণের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৪] কিন্তু এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত কোন শিলালিপিও পাওয়া যায় না। অথচ বিভিন্ন উৎস থেকে এ সময়ে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক নির্মিত দুর্গ ও দুর্গনগরীতে সুরক্ষিত প্রবেশ তোরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বুকানন পাণ্ডুয়া ভ্রমনকালে প্রবেশ ও নির্গমন পথে দুটি তোরণের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান।[৪৫] আদিনা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাসাদের গমন পথে যে বুরুজের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তা একটি তোরণের অংশবিশেষ বলে অনিরুদ্ধ রায় অনুমান করেন।[৪৬] আবিদ আলীর মতে, এটি প্রাসাদের পশ্চিম ফটকের দুটো স্তম্ভের একটি।[৪৭] যাহোক, বিদ্যমান উদাহরণের অভাবে এগুলোর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। তবে মুসলিম বিজয়-পরবর্তী বাংলায় বিকশিত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা যায় এ সময়ের তোরণ নির্মাণে বিজয়ীদের আনিত স্থাপত্য রীতিই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

পঞ্চদশ শতকে বাংলায় আগত বিভিন্ন পর্যটকের বর্ণনা ও সমসাময়িক লেখনীতে তোরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা পর্যটক ফেই-সিন জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৮-২৯খ্রিঃ) প্রাসাদে তিনটি তোরণ লক্ষ্য করেন।[৪৮] কৃত্তিবাস গৌড় দুর্গের প্রধান তোরণ থেকে মোট নয়টি প্রবেশদ্বার (নয় মহল) পেড়িয়ে মূল প্রাসাদে প্রবেশ

---

৪৩. মিনহাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী -১৯৮৩, পৃ. ২৯।

৪৪. মিনহাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬।

৪৫. Buchanon Hemilton's description in *Stastical account of India*, vol- vii, p. 60.

৪৬. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৩৯।

৪৭. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D. p. 138.

৪৮. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা-১৯৯৮ খ্রিঃ (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ. ৫০৫।

Dhaka University Institutional Repository

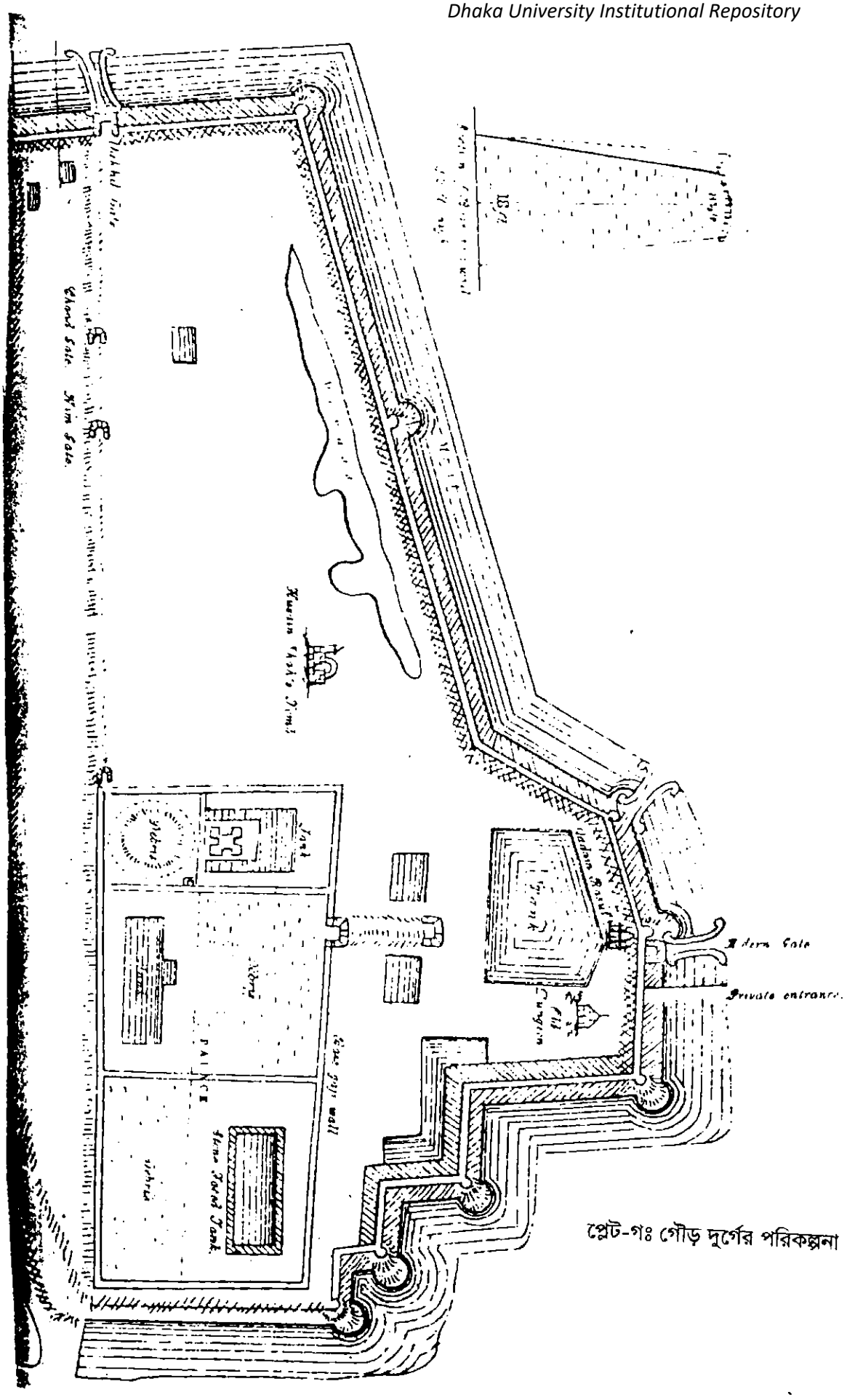

প্লেট-গঃ গৌড় দুর্গের পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৪৯] র‍্যাভেনশো, তাঁর গৌড় দুর্গের পরিকল্পনায় উত্তরে দুর্গদেয়াল থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত চারটি, প্রাসাদের পূর্ব দেয়ালে দুটি, দুগের্র পূর্ব দেয়ালে দুটি এবং প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে একটি তোরণের উল্লেখ করেন।[৫০] কিন্তু বর্তমানে দাখিল দরওয়াজা (আ:পঞ্চদশ শতক), গোমতি দরওয়াজা (আ:ষষ্ঠদশ শতক), লুকোচুরি দরওয়াজা (আ:সপ্তদশ শতক) ব্যতীত সবগুলোই ধ্বংসপ্রাপ্ত। গৌড় দুর্গের অভ্যন্তরভাগে গোমতি তোরণের ঠিক পশ্চিম দিকে স্থাপিত চিকা ইমারতটিকে (আ: ১৫শ শতকের প্রথম ভাগ) বাংলায় টিকে থাকা তোরণের আদি উদাহরণ বলা যায়। এটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা পর্ব থেকে এ ধরণের পরিকল্পনা লক্ষ্য করা গেলেও[৫১] তোরণ নির্মাণে তা ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়নি। মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে ভারতের 'আলাই দরওয়াজা' (নি:১৩০৫ খ্রিঃ) বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট পরিকল্পনার টিকে থাকা আদি উদাহরণ।[৫২] পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের তোরণ নির্মাণে এই পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা লাভ করে। তুঘলক শাসনামলে নির্মিত দিল্লীর কালান মসজিদ (১৩৭০-৭১ খ্রিঃ), জৌনপুরের জামি মসজিদে (১৪৩৮-৭৮) এরূপ উদ্‌গত প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করা যায়।[৫৩] কিন্তু চিকা ইমারতে ব্যবহৃত বক্র কার্নিশ ও অষ্টকোণাকার কোণা বুরুজ একে পূর্ববর্তী তোরণ হতে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাংলার স্থানীয় চালাঘর থেকে গৃহীত এই উপাদানগুলোর প্রাথমিক সন্নিবেশ, ঠিক একই পরিকল্পনায় নির্মিত পান্ডুয়ার একলাখী সমাধিতে লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী বাংলার স্থাপত্যে এই উপাদানগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিনত হয়। চিকা ইমারতের পরিকল্পনা ও স্থাপত্যিক অনুপ্রেরণার উৎসও যে একলাখী সমাধি তা সহজেই অনুমেয়।

---

৪৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ভারতী বুক স্টল,কলকাতা, ষষ্ট সংস্করন- ১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃ. ৫১৪।

৫০. John Henry Raenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D. p. l, 8.

৫১. চিকা ইমারতের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৫২. P. Brown, *(Islamic)*, p.17.

৫৩. R. Nath, *History of Saltanate Architecture*, New Delhi-1997 A.D. p. 69 (Plan).

Dhaka University Institutional Repository

তবে পরবর্তীকালে গৌড় দুর্গের পূর্ব বাহুতে নির্মিত গোমতি দরওয়াজা (নি: আ:১৫ শতক) ব্যতীত বাংলায় তোরণ নির্মাণে অনুরূপ পরিকল্পনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না।

সুলতানী যুগে বাংলায় নির্মিত রাজকীয় তোরণ স্থাপত্যের সর্ববৃহৎ উদাহরণ হলো গৌড় দুর্গের প্রধান তোরণ 'দাখিল দরওয়াজা'। এটি বিরাটাকার খিলান ও পাইলন সদৃশ বাট্রেস নিয়ে গঠিত। এর উভয় কোণে রয়েছে বার কোণ বিশিষ্ট ঢালু বুরুজ। এ ধরনের অবয়ব বিশিষ্ট ফাসাদ পরিকল্পনা তুঘলক শাসনামলে নির্মিত দিল্লীর খিরকি মসজিদ (১৩৭০-৭১ খ্রিঃ) ও কালান মসজিদের (১৩৭০-৭১ খ্রিঃ) উদ্‌গত প্রবেশদ্বারের পূর্ব ফাসাদে লক্ষ্য করা যায়।[৫৪] কিন্তু এর বিরাটাকার ব্যারেল ভল্টের (Barrel-vault) আচ্ছাদন ভারতবর্ষে বিরল। ভারতের জৌনপুরে অবস্থিত জামী মসজিদের (১৪৩৮-১৪৭৮) কিবলা কক্ষের ভল্ট[৫৫] ব্যতীত তেমন কোন উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় না। বাংলায় ইতিপূর্বে ভল্টের ব্যবহার পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদে দেখা গেলেও তোরণ নির্মাণে এই ব্যবস্থাপনা বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। তবে অতি প্রাচীন কাল থেকে পারস্যে বিরাটাকার ভল্ট আচ্ছাদিত প্রবেশ পথ নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল। টেসিফোনে অবস্থিত সাসানীয় প্রাসাদ তাক-ই-কিসরায় ভল্ট আচ্ছাদিত প্রবেশপথ ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৬] পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসীয় প্রাসাদে এরূপ তোরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম শতকে ট্রান্স জর্ডানের মরুভূমিতে নির্মিত খিরবাত আল-মাফজার (আ:অষ্টম শতাব্দি) ও উখাইদির প্রাসাদের (আ:৭৭৮ খ্রিঃ) তোরণগুলোর আচ্ছাদনে ভল্ট নির্মিত হয়েছিল।[৫৭] নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইরান ও মধ্য এশিয়ার ইমারতে এ উপাদানটি ব্যাপক

---

৫৪. P. Brown, *Ibid (Islamic)*, pl. xii, xv.

৫৫. James Fargessun, *History of Indian and Eastern Architecture*, Delhi-1997 (Reprint) p. 224.

৫৬. A.U. Pope, *A Survey of Persian Art- From Pre-Historic Time to The Present*, vol-iv, OUP-1938, pl. 149.

৫৭. Olag Grabar, *Art and Architecture Of Islam*, Penguin Books Ltd, p. 50, fig-20, p. 82, fig-56.

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ.বি.এম. হোসেনের মতে, পারস্যের ন্যায় বাংলায় নির্মাণ উপকরণ ইট হওয়ায় ভল্ট নির্মাণ রীতি ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৮] তবে দাখিল দরওয়াজার পরিকল্পনা, সম্পূর্ণ ইটের নির্মাণ ও টেরাকোটা অলংকরণের সজ্জায় তৎকালীন বাংলা স্থাপত্যেরই স্বরূপ ফুটে উঠেছে। একই রীতিতে গৌড় দুর্গের চান্দ দরওয়াজা (আঃ পঞ্চদশ শতক), নিম দরওয়াজা (আঃ পঞ্চদশ শতক) নির্মিত হলেও এগুলো বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ডব্লিও.ডব্লিও. হান্টার এগুলোকে 'স্মারক খিলান' বলে অভিহিত করেছেন।[৫৯] প্রাচীন কালে রোমানগণ তাদের বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ ধরনের স্মারক খিলান বা ট্রায়াম্ফাল আর্চ (Triumphal Arch) নির্মাণ করতেন। রোমের টাইটাস খিলান এ রীতির তোরণের সবচেয়ে চমক্প্রদ উদাহরণ। কিন্ত মুসলিম স্থাপত্যে এরূপ নির্মাণ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। বাংলায় ইতিপূর্বে 'স্মারক খিলান' নির্মিত হয়েছিল কিনা তা বিদ্যমান নিদর্শনের অভাবে জানা যায় না। গৌড়ের এই তোরণগুলো ছিল সম্ভবত আগন্তুকদের সামনে সুলতানের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও মর্যাদার প্রকাশ স্বরূপ ।

তবে সুলতানী বাংলায় তোরণ নির্মাণ শুধুমাত্র দুর্গেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি, সরাইখানা প্রভৃতিতে বিকাশ লাভ করেছে। ইমারতের প্রকৃতি অনুযায়ী তোরণগুলোর পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করেছে। বাগেরহাটে অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদের পূর্ব তোরণটি, ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় অনেকটা আলংকারিক অবয়ব প্রকাশ করছে। এটি আয়তাকার পরিকল্পনার একটি বৃহৎ কাঠামো যার মধ্যভাগে প্রবেশ খিলান নির্মিত হয়েছে এবং আচ্ছাদনে ব্যবহৃত হয়েছে বক্রকার্নিশ সমেত সমতল ছাদ। এটি এই শ্রেণীর ইমারতের আদি উদাহরণ হিসেবে টিকে আছে। মুসলিম স্থাপত্যে এরূপ আয়তাকার ও এক খিলান পরিকল্পনা বিশিষ্ট তোরণের অনুপ্রেরণা সম্ভবত

---

৫৮. এ বি এম হোসেন, সুলতানী বাংলার স্থাপত্য শিল্প- একটি পর্যালোচনা, 'ইতিহাস' বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ চৈত্র-১০ম বর্ষ, ১ম-৩য়সংখ্যা, ঢাকা ১৯৭৮, পৃ. ২৮।

৫৯. W.W. Hunter, *Statistical account of India*, vol- vii, p. 56 (Buchanon's description)

Dhaka University Institutional Repository

রোমানদের 'স্মারক খিলান' থেকেই গৃহীত হয়েছে। ইমারতের সম্মুখে আলংকারিক তোরণ জেরুজালেমে নির্মিত কুব্বাতুস সাখরার (নি:৬৯১ খ্রিঃ, তোরণ-আ:দশম শতক) মঞ্চে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।[৬০] এটি বহু খিলান বিশিষ্ট। এক খিলানযুক্ত উদ্‌গত তোরণ স্পেনের কর্ডোভা মসজিদ (৭৮৪-৯৮৭ খ্রিঃ), তিনমালের জামী মসজিদ (১০৩৫ খ্রিঃ) ও উত্তর আফ্রিকার মাহদিয়া মসজিদে (৯১২ খ্রিঃ) লক্ষ্য করা যায়।[৬১] মুসলিম ভারতে তোরণ স্থাপত্যের ইতিহাসে দিল্লীর কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রদেশে এই পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিজাপুরে অবস্থিত গুলবার্গা জামী মসজিদের (১৩৬৭ খ্রিঃ) রিওয়াকে এরূপ তোরণ লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় মসজিদ ও সমাধির তোরণ নির্মাণে সাধারণত এই পরিকল্পনাটিই গৃহীত হয়েছে। তবে বৃষ্টিবহুল আবহাওয়ার কারণে সাহান না থাকায় অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় তোরণটি রিওয়াকের অংশ হিসেবে নির্মিত না হয়ে নীচু বহির্দেয়ালে সংস্থাপিত হয়েছে। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ (১৫২৫-২৬ খ্রিঃ), ছোট সোনা মসজিদ(১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) ও দিনাজপুরের সুরা মসজিদের (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ-ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ) তোরণে একই পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২৬ খ্রিঃ) ও পুরাতন মালদহের জামী মসজিদের তোরণ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এগুলো কোণা বুরুজ বিশিষ্ট এবং গম্বুজে আচ্ছাদিত। ইতিপূর্বে গৌড়ে নির্মিত চিকা ইমারত ও গোমতি তোরণে এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। তবে এগুলো বর্গাকারে নির্মিত হলেও সম্ভবত নির্মাণের ক্ষেত্রে পরবর্তী তোরণগুলোকে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া ব্যবহারিক পার্থক্যের কারণেও এগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হয়েছে। সুলতানী যুগে বাংলায় নির্মিত তোরণগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী উপাদান ইট নির্মিত এবং টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত। তবে বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ ও কুতুবশাহী মসজিদের তোরণগুলো পাথরের স্লেব দ্বারা আবৃত

---

৬০. Olag Grabar, *Art and Architecture of Islam, Penguin Books ltd.* P. 28.
৬১. Olag Grabar, *Ibid,* p. 139,141,165.

Dhaka University Institutional Repository

এবং পাথর খোদাই অলংকরণে সজ্জিত। প্রাক-মুঘল যুগে দরসবাড়ি মাদ্রাসা (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ), বেলাবাড়ি মাদ্রাসা (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ), পুরাতন মালদহের সরাইখানায় তোরণ নির্মাণ সম্পর্কে জানা গেলেও এগুলোর কোনটাই বর্তমানে টিকে নাই।

বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তোরণ স্থাপত্যেও রাজকীয় মুঘল পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করে। এগুলো তাদের বৃহৎ পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিগনিত হতো। ঢাকায় নির্মিত বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণটিকে বাংলায় মুঘল রীতিতে নির্মিত তোরণ স্থাপত্যের আদি নির্দশন বলা যায়। এটি সমসাময়িক কালে উত্তর ভারতে প্রচলিত ত্রিত্বল ব্যবস্থাপনায় নির্মিত এবং মধ্যবর্তী স্থান অর্ধ-গম্বুজে আবৃত ইউয়ান সম্বলিত। এরূপ নির্মাণ উত্তর ভারতের মুঘল তোরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যা পারস্যে তৈমুরীয় তোরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে ঢাকার লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণটি এ ধরনের বিরাটাকার পরিকল্পনার সবচেয়ে জাঁকালো নিদর্শন। এর ত্রিখিলান বিশিষ্ট ত্রিতল ব্যবস্থাপনা, কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের উভয় পাশে সরু বুরুজ ও দ্বিতল ঝুলন্ত বারান্দা, অগভীর প্যানেল ও মুকার্‌নাস নক্‌শা উত্তর ভারতে বিকশিত মুঘল রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দিল্লী দুর্গের দিল্লী গেট (১৫৪৫খ্রিঃ) লাহোর গেট (১৫৪৫ খ্রিঃ) ও ফতেহপুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজায় (১৫৬৮-৭৮ খ্রিঃ) এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। তবে সম্ভবত নির্মাণে ইটের ব্যবহারের ফলে এগুলো কেন্দ্রীয় রীতির সামগ্রিকতা থেকে অনেকটা আলাদা রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মুঘল যুগের টিকে থাকা কাটরা ও কমপ্লেক্সের তোরণগুলো আকৃতিতে বৃহৎ এবং জটিল পরিকল্পনার হলেও মসজিদ, সমাধি কিংবা জলদুর্গের তোরণ নির্মাণে সুলতানী যুগের ন্যায় অনেকটা আলংকারিক অবয়ব বিশিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এগুলোর কেন্দ্রে একটি অর্ধ-গম্বুজে আবৃত প্রবেশ খিলান আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত এবং উভয়পাশে সরু মিনার দ্বারা সীমায়িত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত হাজিগঞ্জ দুর্গ (সপ্তদশ শতক), মুন্সিগঞ্জ জেলার ইদ্রাকপুর দুর্গ (সপ্তদশ শতক), ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদ (সপ্তদশ শতক), কুমিল্লা জেলার শাহ্ সুজা

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের (নি: সপ্তদশ শতক) তোরণগুলো এই রীতিতে নির্মিত। তবে জলদুর্গের তোরণগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে নির্মিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সোনাকান্দা দুর্গের তোরণ ফাসাদের মধ্যবর্তী প্রবেশ খিলানের উভয়পাশে দুটি খিলানকৃত কুলঙ্গী রয়েছে। তবে তোরণ নির্মাণে বাংলার স্থানীয় চালাঘরের প্রভাবও বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কিশোরগঞ্জে অবস্থিত শাহ্ মুহাম্মদ মসজিদের তোরণটিতে। এটি বাংলার চির প্রচলিত দোচালা রীতিতে নির্মিত। সাধারণত গৌড়ে অবস্থিত ফতেহ শাহের সমাধিকে (আ:সপ্তদশ শতক), এই পরিকল্পনার আদি নির্দশন বলা হয়। কিন্তু মুঘলদের আগমনের পূর্বে সোনারগাঁয়ের পাঁচ পীরের সমাধি ও গৌড়ের কদমরসুল ইমারতের পশ্চিমে অবস্থিত কবরস্থানের চেরাগদানে (চিত্র-১) এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী যুগে বাংলা স্থাপত্যে স্থানীয় কুড়েঘর থেকে গৃহীত বক্র কার্নিশ, কোণা বুরুজ, দোচালা, চারচালা রীতির আচ্ছাদন মুঘল আমলে তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও সম্পূর্ণ দোচালা কুড়ে ঘরটিকেই ইটের ইমারতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে ব্যাপক জনপিয়তা লাভ করেছে। তবে তোরণ নির্মাণে এই উপাদানটি আর লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলা স্থাপত্যে তোরণ নির্মাণের চর্চা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ কর্তৃক আনীত পারসিক ও উত্তর ভারতীয় রীতির সাথে আঞ্চলিক রীতির সমন্বয়ে এ অঞ্চলে তোরণ স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়। তবে শুধু রীতিগত সমন্বয় সাধন নয়, বরং এর পেছনে কাজ করেছে শাসকের রুচিবোধ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, এ অঞ্চলে সহজলভ্য উপাদান ইট ও টেরাকোটা, সর্বোপরি জনসাধারণের সদিচ্ছা ও কারিগরি দক্ষতা, যা বাংলার তোরণগুলোকে স্থাপত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য করে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১ঃ
সমাধি ক্ষেত্রের দোচালা প্রদীপ দান (কদম রসুলের পশ্চিমে)

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমল

Dhaka University Institutional Repository

চিকা ইমারত

অবস্থানঃ

মৌজাঃ চন্দনগর, পোঃ পিয়েসবাড়ি, থানাঃ ইংলিশ বাজার, জেলাঃ মালদহ।

গৌড় দুর্গের অভ্যন্তরভাগে কদম রসুল ইমারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং গোমতি তোরণের বরাবর ঠিক পশ্চিমদিকে একটি এক-গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত রয়েছে (চিত্র-২)। এটি 'চিকা ইমারত' নামে বহুল পরিচিত। এর পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি বিরাট কমপ্লেক্সের ধ্বংসাবশেষ।

স্থানীয় ভাবে ইমারতটি 'চিকা মসজিদ' নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কি কাজে ব্যবহৃত হতো তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিং (Mr. King) ইমারতটিকে 'চিকা মসজিদ' (Bat's Mosque) নামে উল্লেখ করেন।[৬২] দানীর মতে, তিঁনি সম্ভবত ইমারতটিকে চামচিকায় পরিপূর্ণ দেখতে পান।[৬৩] কিন্তু নামকরণ সম্পর্কিত অনুমানটি সম্ভবত ঠিক নয়। কেননা স্থানীয় ভাবে এরূপ প্রাণীকে 'চামগুদরি' বলা হয় এবং 'চিকা' শব্দটি ছুঁচোকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।[৬৪] যাহোক, ইমারতটির অভ্যন্তরে কোন মিহরাবের সন্ধান পাওয়া যায় না বিধায় একে মসজিদ বলা সঙ্গত নয়।

কানিংহাম ইমারতটিকে গোমতি তোরণের সাথে মিলিয়ে ফেললেও পান্ডুয়ার একলাখী সমাধির সাথে এর স্থাপত্যিক ও কাঠামোগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করে এটিকে

---

৬২. Mr. King, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1875 A.D. p. 95.

৬৩. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 83.

৬৪. প্রদ্যোত ঘোষ, *গৌড়-বঙ্গের স্থাপত্য*, পুস্তক বিপনী-কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিঃ, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

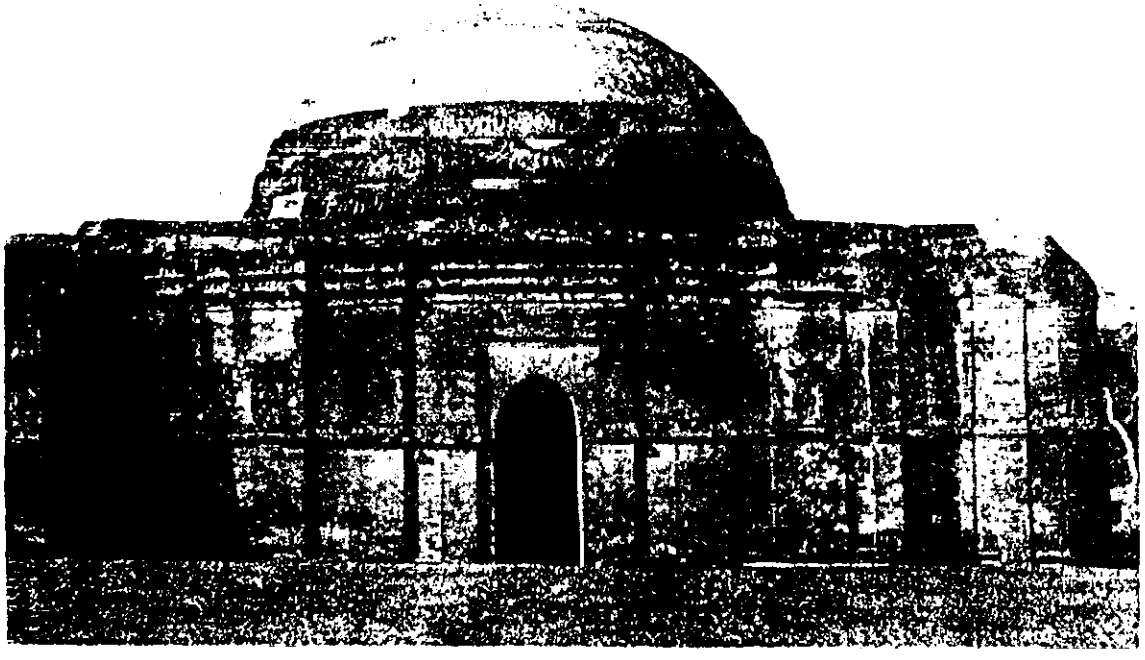

চিত্র-২ঃ চিকা ইমারত

Dhaka University Institutional Repository

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৫-৫৯ খ্রিঃ) সমাধি বলে অনুমান করেন।[৬৫] কিন্তু একলাখী সমাধিটি গনেশ বংশীয় সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৮-৩২ খ্রিঃ) সমাধি হিসেবে অধিকতর গ্রহনযোগ্য হওয়ায় এর সাথে চিকা ইমারতের স্থাপত্যিক সাদৃশ্য একে সমসাময়িক নির্মাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। 'রিয়াজ- উস-সালাতিনের' বর্ণনার[৬৬] উপর ভিত্তি করে আহমেদ হাসান দানী এটিকে 'জালালি সমাধি' বলে উল্লেখ করলেও উক্ত গ্রন্থে 'জালালি সমাধি' নামে কোন ইমারতের অস্তিত্ব নেই। দানী সম্ভবত ভুলকরে সমাধির উল্লেখ করেন।

আবীদ আলীর মতে, ইমারতটি মসজিদ কিংবা সমাধি নয়, কেননা এর অভ্যন্তর ভাগে কোন মিহরাব বা কবরফলক নেই।[৬৭] তিনি স্থানীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে একে 'জেলখানা' বা 'চোরখানা' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। একই মতের সমর্থনে আর. কে. চক্রবর্তী (R.K. Chakravarti) বর্ণনা করেন, অপরাধীদেরকে এর পূর্ব দিকের গোমতি তোরণের মাধ্যমে দুর্গের বাইরে বের করা হতো।[৬৮] তাছাড়া এ অনুমানের পক্ষে জনশ্রুতি আছে যে, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) তার হিন্দু মন্ত্রী সনাতনকে এই ইমারতে বন্দী রেখেছিলেন। কিন্তু চারদিকে প্রবেশপথ সম্বলিত ইমারতটি রাজকীয় জেলখানা হওয়া দুরূহ। তবে সনাতন পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় যদি অনুমান করে নেওয়া হয়, তিনি কোন স্বল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত গৃহে বন্দি ছিলেন এবং গৃহটি চিকা ইমারত ছিল, সেক্ষেত্রেও অনুমানটি সঠিক হওয়া অসঙ্গত। সমসাময়িক উৎস থেকে জানা যায়, সনাতন কারারক্ষীর সাহায্যে নদী পথে

---

৬৫. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv., p. 56. ক্রেইটন একলাখী সমাধির কোন চিত্র অংকন করেননি।

৬৬. Gulam Hussain Salim, *Riyaz -us- Salatin* (1898 A.D.) Eng. Tr.by Muhammad Salim, Delhi-1903, p. 188.

৬৭. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D., p. 51-52.

৬৮. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, মালদা-১৯৯০, পৃ. ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

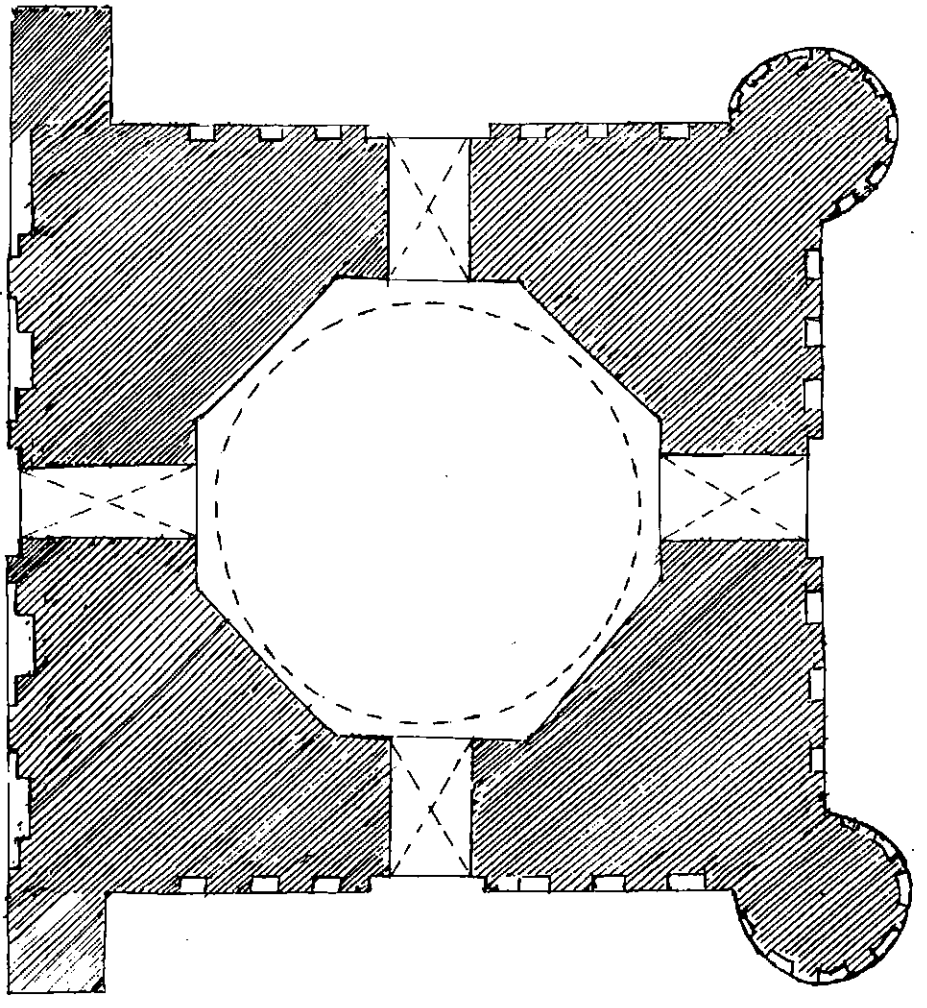

ভূমি পরিকল্পনা-১ঃ চিকা ইমারত

উঃ

০ ৫০ ১০০ মি.

Dhaka University Institutional Repository

নৌকাযোগে পালিয়ে গিয়েছিলেন।[৬৯] বিবরণ অনুযায়ী জেলখানাটি নদীর তীরে কিংবা নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু চিকা ইমারতটি নদী থেকে অনেক দূরে গৌড় দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ স্থান থেকে পালাতে হলে সনাতনকে গোমতি দরওয়াজা কিংবা দাখিল দরওয়াজা ব্যবহার করতে হতো, যেগুলো ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত।

এলাহী বক্স (Alahi Baksh) এটিকে অফিস কক্ষ বলে অনুমান করেছেন।[৭০] অন্যদিকে ১৫২১ খ্রিঃ এ জনৈক পর্তুগীজ দোভাষীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অনিরুদ্ধ রায় (Aniruddha Ray) মনে করেন, এই ইমারতটি ছিল দিওয়ান-ই-মাজ্জালিন বা বিচারালয়।[৭১] কারণ এটি প্রাসাদের খুব কাছে অবস্থিত। দোভাষীর বর্ণনানুযায়ী প্রাসাদের নিকটবর্তী একটি মসজিদে তাদের বিচার কার্য সম্পন্ন হয়েছিল।[৭২] কিন্তু স্ট্যাপলটনের (Stapleton) বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাজা গনেশ তার কাচারী হিসেবে আদিনা মসজিদকে ব্যবহার করতেন।[৭৩] সে ক্ষেত্রে একই কার্য চিকা ইমারতের ন্যায় ক্ষুদ্র ইমারতে পরিচালনা করা অসম্ভব বলে মনে হয়। কেননা উক্ত দোভাষীর বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, সুলতান তাদের (পর্তুগীজদের) এবং অন্যান্য অভিযোগকারীদের মসজিদে (মসজিদের ন্যায় গম্বুজাবৃত গৃহে) সমবেত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন যেখানে সকলে মেঝেতে পাতা মাদুরে বসেছিলেন।[৭৪] এক্ষেত্রে চিকা ইমারতের পরিবর্তে অন্য কোন বৃহৎ ইমারতের ব্যবহার অধিকতর গ্রহনযোগ্য।

---

৬৯ . কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, সূত্র- সুখোময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করন-১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃ. ৩৫৬।

৭০ . এলাহী বকস্ *খুরশীদ - জাহাননুমা*, { বেভারিজ (Bevaridge) কর্তৃক অনুদিত, সূত্র- আ. করিম *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী-১৯৯৪, পৃ. ১২২.

৭১. Aniruddha Ray, The Reconstruction of Mediaeval Gaur from Documentary and Exploratory Findings, *Journal of Bengal Art, Vol. 2*, The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka-1997 A.D. p. 186.

৭২. সুখোময় মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৯-৫১।

৭৩. Stapleton, *Gaur and Hazrat Pandua*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987 A.D. p. 46

৭৪. সুখোময় মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৯-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

একলাখী ইমারতের সাথে এর স্থাপত্যিক ও কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকায় রিয়াজ-উস-সালাতিনের বরাত দিয়ে মাহমুদুল হাসান এটিকে জালালুদ্দিন কর্তৃক নির্মিত সরাইখানা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর পশ্চিমে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষকে মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৭৫] কিন্তু এত ক্ষুদ্র ইমারত সরাইখানা হতে পারে না এবং ধ্বংসাবশেষে কোন মিহরাবেরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তবে চিকা ইমারতের পশ্চিম ফাসাদের গঠন প্রনালীর সাথে অন্যান্য ফাসাদের বৈসাদৃশ্য এবং এ অংশের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের সংযুক্তি (চিত্র-৩) থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে, এটি উক্ত ইমারতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আবিদ আলী খান এই ধ্বংসাবশেষকে সভা কক্ষ (Audience Hall)[৭৬] এবং অনিরুদ্ধ রায়, বিরাটাকার অফিস কমপ্লেক্স[৭৭] বলে অভিহিত করেন। যদি তাই হয় তবে চিকা ইমারতটিকে এই কমপ্লেক্সের অংশ এবং প্রবেশ পথ হিসেবে অনুমান অসঙ্গত নয়। কেননা, গোমতি দরওয়াজা বরাবর এর অবস্থান এবং ধ্বংসাবশেষের পূর্ব বাহুতে এর উপস্থিতি এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণ দেয়। এক্ষেত্রে চিকা ইমারতটির স্থাপত্যিক বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

চিকা ইমারতটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে (ভূমি পরিকল্পনা-১)। এর চার কোণে চারটি ষোল কোণ বিশিষ্ট বুরুজ এবং চার বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে চারটি প্রবেশ খিলান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পূর্ব দিকের খিলানটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অন্যান্য ফাসাদ অপেক্ষা পশ্চিমের ফাসাদটি আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। এর মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ খিলান ছাড়াও উভয়পাশে মোট তিনটি বদ্ধ খিলান রয়েছে। এগুলো সম্ভবত ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের অংশ ছিল। এর কার্নিশ একলাখী সমাধির ন্যায় বাঁকানো এবং উপরিভাগে একই পরিমাপের গম্বুজ দ্বারা আবৃত। এর অভ্যন্তর ভাগে একলাখীর ন্যায় অষ্টকোণাকার রূপ দিয়ে তার উপর গম্বুজ নির্মিত

---

৭৫. Sayed Mahmudul Hasan; *Gaur and Hazrat Pandua*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987 A.D. p. 49.

৭৬. Abid Ali Khan , *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D. p. 52.

৭৭. Aniruddha Ray, *Ibid*, p.186.

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। অলংকরণেও একই রকম ঝুলন্ত চেইন ও ঘন্টা মটিফ সমেত প্যানেল ব্যবহৃত হয়েছে।

চিকা ইমারতটির সাথে একলাখী সমাধির স্থাপত্যিক ও কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকায়[৭৮] প্রায় সকল স্থাপত্য ঐতিহাসিক একে একলাখী ইমারতের সমসাময়িক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে এটি গোমতি দরওয়াজার (আ: ১৫১২ খ্রিঃ) পূর্বে নির্মিত হয়েছে। ফলে এটি চিকা ইমারতের বরাবর নির্মিত হওয়ায় অন্তত এটুকু অনুমান করা যায় যে, উক্ত ইমারতটি কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যার ফলে এ অংশে প্রবেশের জন্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পরবর্তীকালে এর বরাবর দুর্গ দেয়ালে অপর একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৫-৫৯ খ্রিঃ) কর্তৃক গৌড় দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পূর্বেই চিকা ইমারত ও এর পশ্চিম দিকের কমপ্লেক্সটির অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। কেননা র‍্যাভেনশো কর্তৃক অংকিত গৌড় দুর্গের মানচিত্রে প্রাসাদের পূর্ব দেয়ালে পর পর দুটি তোরণের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন রয়েছে[৭৯] যা এর পূর্ব দিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নির্দেশ দেয়। ফলে বিরাটাকার এই কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য অবশ্যই তোরণের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে যদিও কমপ্লেক্সের সম্মুখের বারান্দার স্তম্ভ ও মূল ইমারতে ব্যবহৃত পিয়ারের (Pier) ভিত ব্যতীত কিছুই টিকে নেই, তথাপি চিকা ইমারতের পশ্চিম ফাসাদের অন্ধ খিলান ও কুলঙ্গীর অবয়ব এবং অন্যান্য ফাসাদ হতে এর ভিন্নতা একে কমপ্লেক্সের একটি অংশ হিসেবে প্রমাণ দেয়। চিকা ইমারতটির আকৃতি একলাখী সমাধির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এর অভ্যন্তর ভাগে কবরফলক কিংবা মিহরাবের অনুপস্থিতি একে যেমন সমাধি কিংবা মসজিদ হিসেবে অনুমানের বিপক্ষে রায় দেয়, তেমনি পশ্চিম দিকের বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত কমপ্লেক্সের ধ্বংসাবশেষের পূর্ব দিকে এর অবস্থান

---

৭৮. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv. P. 56.

৭৯. John Henery Ravenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D. p. 18.

Dhaka University Institutional Repository

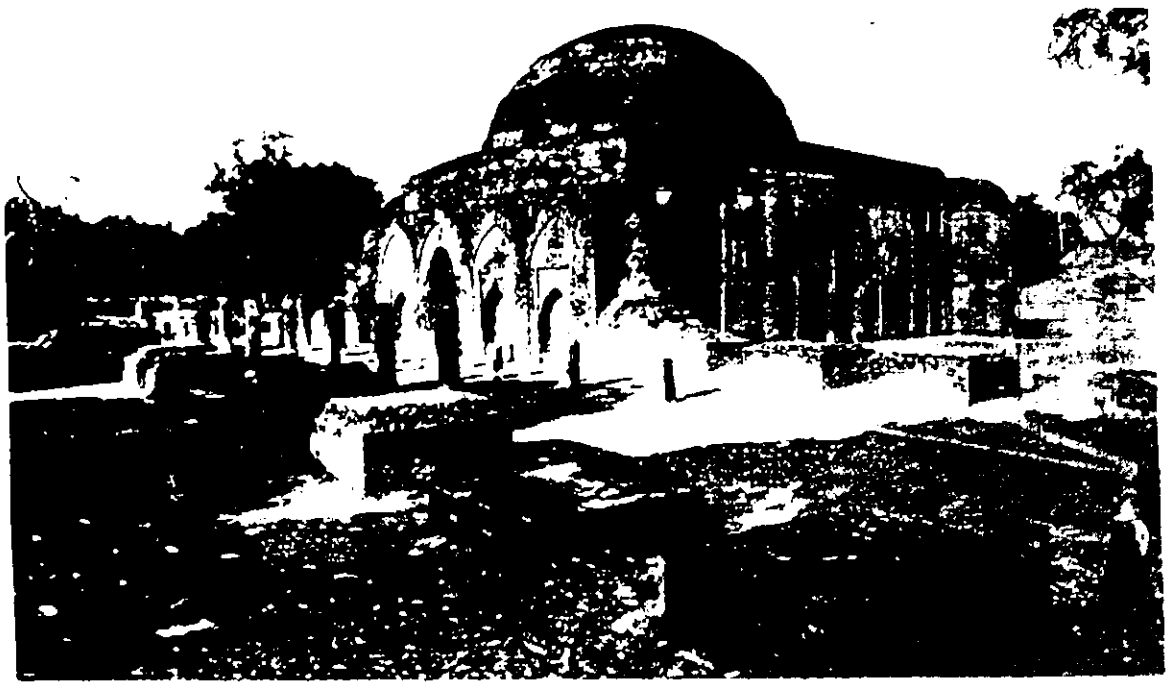

চিত্র-৩ঃ চিকা ইমারত কমপ্লেক্স

Dhaka University Institutional Repository

এবং ইমারতটির পশ্চিম ফাসাদের খিলাকৃত অবয়ব এটিকে উক্ত কমপ্লেক্সের প্রবেশ তোরণ হিসেবে অনুমান করার পক্ষে যুক্তি দেয়। তাছাড়া কমপ্লেক্সটিকে যদি আদালতও ধরা হয় তথাপি এটি ঐ আদালতের প্রবেশ তোরণ হিসেবেই থেকে যায়। এ সকল দিক বিবেচনা করে চিকা ইমারতকে কমপ্লেক্সের তোরণ এবং এর সূত্র ধরে এটিকে বাংলায় তোরণ স্থাপত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দাখিল দরওয়াজা

অবস্থানঃ

মৌজা: বাদুল্লা বাড়ি, থানা: ইংলিশ বাজার, জেলা: মালদহ।

গৌড় দুর্গ সুলতানী বাংলার অন্যতম রাজধানী গৌড় বা লখনৌতি নগরীর অভ্যন্তরে নির্মিত দুর্গগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি গৌড় নগরীর দক্ষিণ তোরণ হিসেবে পরিচিত কতোয়ালী দরওয়াজা ও ফুলবাড়ি দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে এক সময় পুরাতন গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা অনেক দূরে সরে গেছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এবং অর্ধ-মাইল বিস্তৃত এই দুর্গটি অসম পঞ্চভূজ পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল। দাখিল দরওয়াজা গৌড় নগরীর অভ্যন্তরস্থ রাজকীয় দুর্গের টিকে থাকা মোট তিনটি প্রবেশ তোরণের অন্যতম। এর অবস্থান বড় সোনা মসজিদ হতে অর্ধ-কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দুর্গ দেয়ালের উত্তর বাহুর পূর্ব প্রান্তে। পার্শ্ববর্তী দুর্গ দেয়াল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে তোরণটি একক ইমারত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে (চিত্র-৪)।

দাখিল দরওয়াজার নামকরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এটি গৌড় দুর্গের প্রধান প্রবেশ তোরণ ছিল। কেননা 'দাখিল' শব্দটি আরবী 'দখল' (دخل) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'প্রবেশ করা'।[৮০] আর 'দরওয়াজা' শব্দের উৎপত্তিস্থল সম্ভবত ফার্সী 'দর' (در) শব্দটি এবং এর অর্থ 'কোন অট্টালিকায় প্রবেশের রাস্তা বা

৮০. ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *তিন ভাষায় পকেট অভিধান, বাংলা-ইংরেজী-আরবী*, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী-১৯৯৭, পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪ঃদাখিল দরওয়াজা

Dhaka University Institutional Repository

ফটক'।[৮১] এটি 'সালামী দরওয়াজা' নামেও পরিচিত। কানিংহামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এর পার্শ্ববর্তী দুর্গবুরুজ হতে অভ্যর্থনাসূচক তোপ নিক্ষেপ করা হতো।[৮২]

নির্মাণ কালঃ

তোরণ গাত্রে কোন শিলালিপি না থাকলেও গৌড় দুর্গ এবং এর পার্শ্ববর্তী স্থান হতে তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি দাখিল দরওয়াজার কিনা, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই তোরণের নিকটবর্তী স্থান থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এতে ৯২৬ হিজরী/১৫১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দে নাসির উদ্দিন নসরত শাহ্ কর্তৃক একটি তোরণ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। জি. ইয়াজদানীর (G. Yaxdani) মতে, উক্ত শিলালিপিটি দাখিল দরওয়াজার।[৮৩] ক্যাথরিন বি আশারও নসরত শাহ্ কর্তৃক নির্মিত বড় সোনা মসজিদ ও দাখিল দরওয়াজাকে গৌড়ের অন্যান্য ইমারত হতে অপেক্ষাকৃত কঠিন অবয়ব বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[৮৪] কিন্তু আবীদ আলী খান এটিকে কোন মসজিদ কিংবা সমাধির তোরণের শিলালিপি বলে মত প্রকাশ করেন।[৮৫] এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কানিংহাম তোরণটিকে গৌড় দুর্গের নির্মাতা দ্বিতীয় ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নাসির উদ্দিন মাহ্মুদ শাহের(১) নির্মাণ বলে উল্লেখ করেন।[৮৬] পরবর্তীতে আবিদ আলী, আহমেদ হাসান দানী প্রমূখ একই মত প্রকাশ করেন।[৮৭] অন্যদিকে হেনরী র‍্যাভেনশো, ব্যারেজ

---

৮১. আলহাজ্ব মৌলভী ফিরোজ উদ্দিন, ফিরোজুল লুগাত, দিল্লী-১৯৯৫, পৃ. ৬২৩।

৮২. A.Cunningham, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv. p. 50.

৮৩. G.Yazdani, *EIM*. 1911-12, pp. 5-7, plate-xxxi, (Source, Syed Mahmudul Hasan, *Ibid*. p. 67.

৮৪. C.B. Asher, Inventory Key Monuments, *Ibid*, p. 70.

৮৫. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D., p. 51

৮৬. A. Cunnigham, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv. p. 51.

৮৭. C.B. Asher, *Ibid*, p. 70.

Dhaka University Institutional Repository

(Burgess), ফারগশুন ও পার্সী ব্রাউনের মতে, এটি পরবর্তী শাসক বরবক শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[৮৮] গৌড়ে ৮৭১ হিজরী/১৪৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বরবক শাহ্ কর্তৃক একটি তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপি পাওয়া গেছে এবং উক্ত শিলালিপিতে গৌড় দুর্গের মধ্যবর্তী তোরণ 'নিম দরওয়াজা' নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে।[৮৯] অবশ্য ক্রেইটনের চিত্রে বরবক শাহের নির্মিত এই তোরণের স্থাপত্যিক অবয়বের সাথে দাখিল দরওয়াজার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়াও 'চান্দ দরওয়াজা'কেও কানিংহাম দাখিল দরওয়াজার প্রতিলিপি বলে উল্লেখ করেছেন। তথাপি 'তোরণগুলো একই শাসক নির্মাণ করেছেন' এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো নাসির উদ্দিন মাহ্মুদ শাহ্ কর্তৃক গৌড় দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ, যেখানে একটি সুরক্ষিত 'প্রধান প্রবেশ তোরণ' নির্মাণের গুরুত্ব সর্বাগ্রে। দাখিল দরওয়াজাটি দুর্গের প্রধান প্রবেশ তোরণ হওয়ায় অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এটি অন্তত নিম দরওয়াজার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। তাছাড়া নিম দরওয়াজার নামকরণ থেকে বুঝা যায়, এটি প্রাসাদে যাওয়ার মধ্যবর্তী তোরণ ছিল এবং ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার একে 'স্মারক খিলান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে এর সম্মুখে একটি সুরক্ষিত তোরণের অবস্থান স্বাভাবিক। দাখিল দরওয়াজার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে অন্তত: এটুকু অনুমান করা যায়, এটি দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী শাসনামলে এবং চান্দ ও নিম দরওয়াজার পূর্বে নির্মিত হয়েছে। চান্দ ও নিম দরওয়াজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এটিকে পরবর্তী নির্মাণ বলা যাবেনা। এরূপ হতে পারে, তোরণটির অবস্থান এবং কাঠামোগত গুরুত্বের কারণে সম্ভবত পরবর্তী শাসকগণ কর্তৃক এর সংস্কার সাধিত হয়েছে।

---

৮৮. P. Brown, (*Islamic)*, p.39. Jhon Henry Ravenshaw *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, p.16.

৮৯. A.Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions in Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, -1992 A.D. pp. 165-66.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থাঃ

১৭৮৮-৮৯ খ্রিষ্টাব্দে থমাস ডানিয়্যাল (Thomas Daneills) দাখিল দরওয়াজার একটি সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করেন।[৯০] অত:পর ক্রেইটন এর অপর একটি মনোমুগ্ধকর এবং বাস্তবধর্মী চিত্রাংকন করেন । এই চিত্র হতে দাখিল দরওয়াজার আদি রূপ পাওয়া যায় (চিত্র-৫)। ভগ্নাবস্থায় পতিত হওয়ার পূর্বে পার্সী ব্রাউনও একটি অত্যন্ত সুন্দর স্কেচ করেন যাতে এর কাঠামোগত দৃঢ়তা ও আলংকারিক নক্শার আদি উপস্থাপনা স্থান পেয়েছে (চিত্র-৬)।[৯১] বর্তমানে এটি পশ্চিম বঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের মালদহ্ জেলা যাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। এর আদি পরিকল্পনা এখনও বিদ্যমান থাকলেও কালের আবর্তে কোণা বুরুজগুলো সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর প্যারাপেট টিকে নেই। তাছাড়া অলংকরণও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে এর কিছু কিছু বর্তমানে অন্যান্য অলংকরণের সাথে মিলিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

তোরণটি দুর্গ দেয়ালের সমান্তরালে না হয়ে লম্বভাবে নির্মিত হয়েছে। পরিকল্পনায় এটি একটি আয়তাকার ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-২)। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৩৪.৪৫ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২২.৩৭ মিটার প্রশস্ত। এর কেন্দ্রে প্রায় ১০.৩৬ মিটার উঁচু এবং ৩.৭৪ মিটার বিস্তৃত একটি কৌণিক খিলান রয়েছে যা পাইলন সাদৃশ্য বাট্রেস থেকে উদ্ভূত। এগুলো তোরণটিকে মজবুত এবং দৃঢ় অবয়ব দান করেছে। মূল ফাসাদ হতে এ অংশটি ৩.০৫ মিটার উদ্গত হয়ে একটি পিস্তাকের রূপ লাভ করেছে। এর উভয় পাশে ফাসাদের মূল দেয়াল ৩.০৫ মিটার প্রবিষ্ট এবং

---

৯০. William and Thomas Daniells, The Daniells in India, in *Bengal Past andPresent*, Vol.xxv, Part.1, Sr. No. 49.
৯১. Percy Brown, *(Islamic)*, pl. xxix.

Dhaka University Institutional Repository

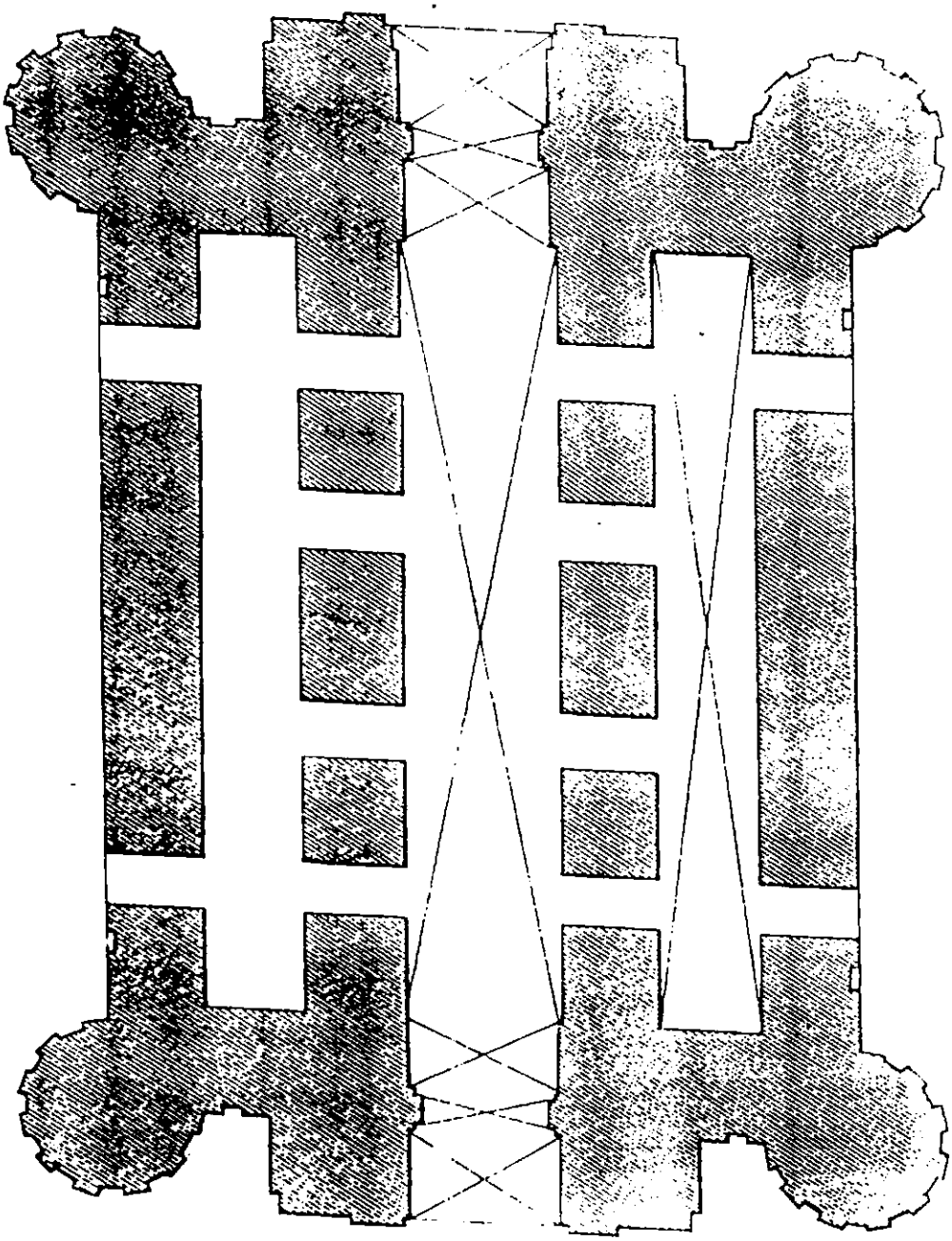

ভূমি পরিকল্পনা-২ঃ দাখিল দরওয়াজা

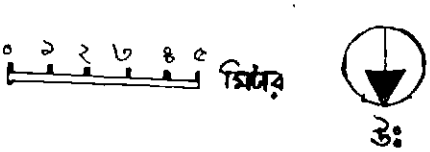

Dhaka University Institutional Repository

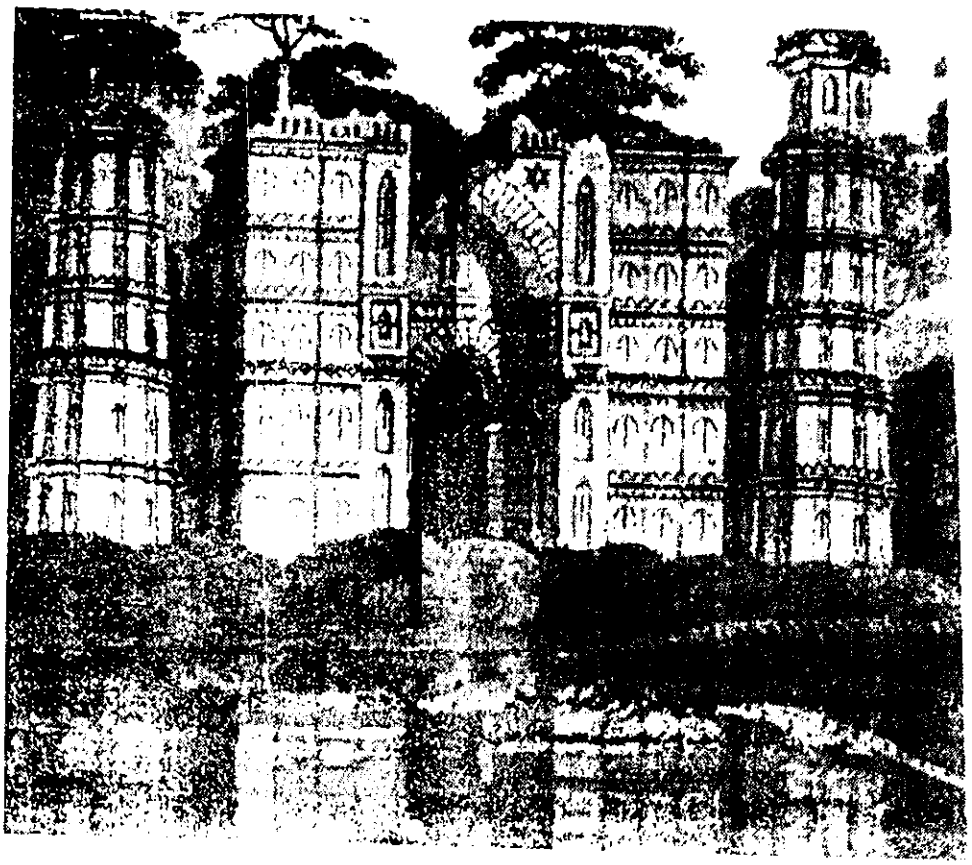

চিত্র-৫ঃ ক্রেইটনের আঁকা দাখিল দরওয়াজা

Dhaka University Institutional Repository

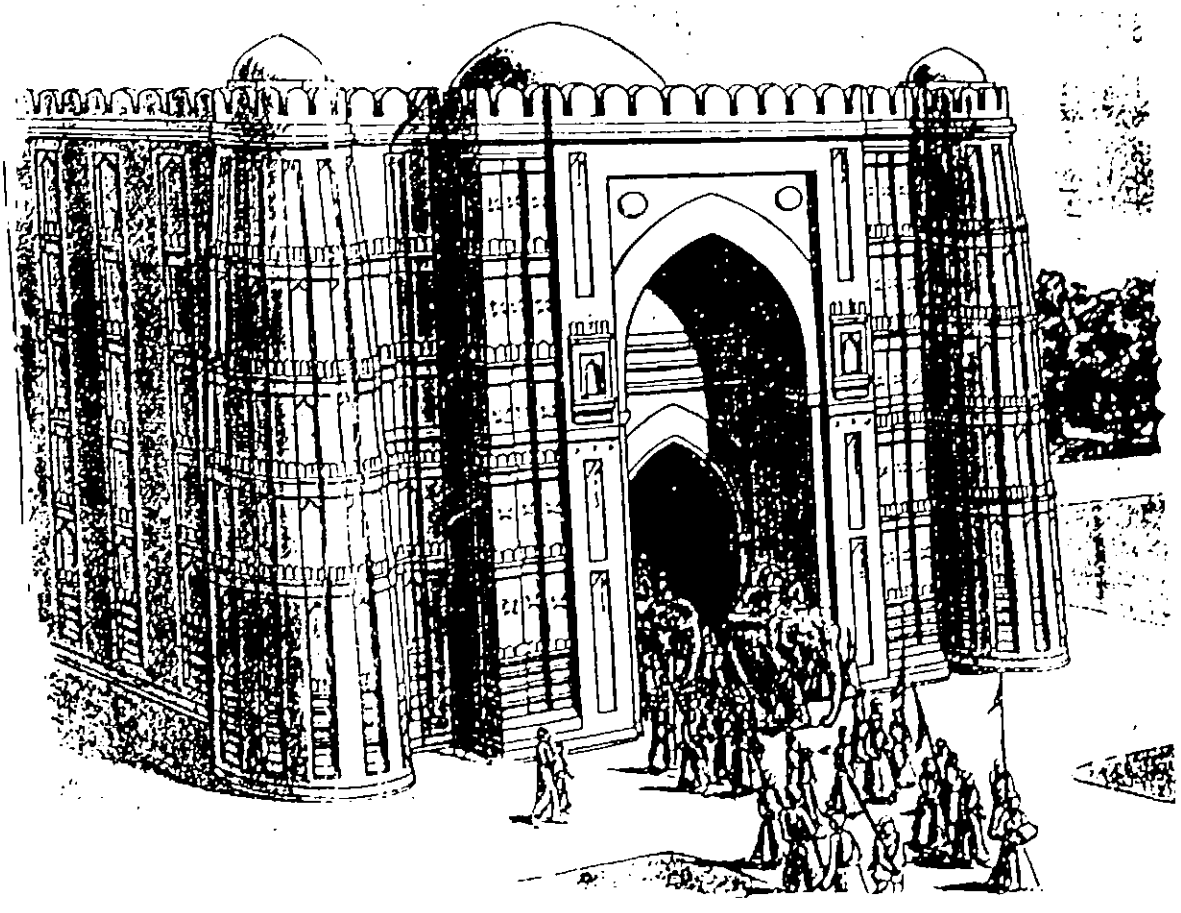

চিত্র-৬ঃ দাখিল দরওয়াজা(পার্সী ব্রাউনের স্কেচ)

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের উভয় কোণে দ্বাদশ কোণ বিশিষ্ট বুরুজ রয়েছে। এগুলো ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে নির্মিত। ক্রেইটনের চিত্রে বুরুজগুলো তোরণের উচ্চতা পর্যন্ত বিদ্যমান এবং শীর্ষ ভাগ ক্ষুদ্র গম্বুজে আচ্ছাদিত। কিন্তু বর্তমানে গম্বুজগুলো টিকে নেই এবং বুরুজগুলোও ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়েছে। তাছাড়া ক্রেইটনের চিত্রে বুরুজগুলোকে যত ঢালু করে আকাঁ হয়েছে প্রকৃতপক্ষে এগুলো ততটা ঢালু নয়। বরং পার্সী ব্রাউনের স্কেচে এটি অধিকতর বাস্তবধর্মী রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কোণা বুরুজ এবং কেন্দ্রীয় পিস্তাক সমেত সম্পূর্ণ ফাসাদটি গঠনে যে আলো আধারির অবতারণা করা হয়েছে তা তোরণটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থাপনায় পরিণত করেছে। এর কার্নিশ, পাইলন ও কোণা বুরুজের উপরিভাগ সমেত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় তোরণটিতে কি ধরনের কার্নিশের ব্যবহার হয়েছিল তা জানা যায় না। পার্সী ব্রাউনের স্কেচে এটি অনেকটা বক্রাকার ধারণ করলেও এর আদি চিত্রকর ক্রেইটন সমতল কার্নিশ অঙ্কন করেছেন।

তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য কেন্দ্রীয় বৃহাদাকার আলংকারিক খিলানের নিম্নভাগে মূল প্রবেশ খিলান রয়েছে। এটি ৩.৭৪ মিটার প্রশস্ত এবং ১০.৩৭ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি দ্বিকেন্দ্রিক খিলান। ফলে উভয় খিলানের সমন্বয়ে গঠিত সম্পূর্ণ অংশটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট খিলানের রূপ লাভ করেছে। বাংলায় তোরণ নির্মাণে এরূপ প্রবেশ খিলানের ব্যবহার দাখিল দরওয়াজায় প্রথম লক্ষ্য করা যায়। প্রবেশ দ্বারে দ্বি-স্তর খিলান প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় না। তবে মুসলিম স্থাপত্যে এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়, আব্বাসীয় প্রাসাদসমুহের প্রবেশ দ্বারে। সামারায় অবস্থিত জাওসাক আল-খাকানী প্রাসাদের (নির্মাণ, ৮৩৬-৩৭ খ্রিঃ) 'বাব-আল-আম্মা' নামক তিন খিলান বিশিষ্ট তোরণটিতে এরূপ দ্বি-স্তর খিলান এখনও বিদ্যমান রয়েছে।[৯২] দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে সেলজুক স্থাপত্যে এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে সেলজুক আনাতোলীয়ার মাদ্রাসার তোরণে এরূপ প্রবেশ খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। কোনীয়ার ইন্‌চে মিনারেলী মাদ্রাসার (নির্মাণ, ১২৫৮ খ্রিঃ) প্রবেশ তোরণে

---

৯২. Olegravear & Richard Ettinghausen, *Art and Architecture of Islam*, p.86.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত দ্বি-স্তর খিলানটি আলোচ্য খিলানের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ।[৯৩] মুসলিম স্থাপত্য চর্চার প্রথম পর্যায়ে ভারতের রাজকীয় স্থাপত্যে দ্বি-স্তর প্রবেশ খিলানের ব্যবহার দেখা না গেলেও তুঘলকদের সকল প্রকার স্থাপত্যে এরূপ স্থাপনার বহুল ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। দিল্লীতে নির্মিত গিয়সিউদ্দিন তুঘলকের সমাধির প্রবেশদ্বারের খিলানটি বিদ্যমান উদাহরণের অন্যতম।[৯৪] পরবর্তীতে পশ্চিম এশিয়ার তৈমুরীয় এবং ভারতের মুঘল স্থাপত্যে প্রবেশ খিলান আরো বর্ধিত অবয়ব ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে উপরিভাগের খিলানটি একটি অর্ধ-গম্বুজ এবং পার্শ্ববর্তী দেয়ালের সমন্বয়ে গঠিত ইউয়ানরূপে[৯৫] আবির্ভূত হয়েছে। ফতেহপুর সিক্রিতে অবস্থিত বুলান্দ দরওয়াজা (Gate of Magnificance-নিঃ১৫৬৮-৭৮খ্রিঃ) এরূপ নির্মাণের সবচাইতে জমকালো নিদর্শন। ফলে অর্ধ-গম্বুজে আবৃত ইউয়ান বিশিষ্ট প্রবেশ দ্বারের উৎস পূর্ববর্তী দ্বি-স্তর খিলান সম্বলিত প্রবেশদ্বার থেকে এসেছে –এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। দাখিল দরওয়াজায় দ্বি-স্তর খিলানের ব্যবহার তুঘলক স্থাপত্যের প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তোরণের অভ্যন্তর ভাগ তিনটি অংশে বিভক্ত। এর মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে ৩৪.৪৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৪.২৭ মিটার প্রশস্ত একটি পথ। পথটি একটি টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। পার্সী ব্রাউন তার স্কেচে ভুলবশতঃ ভল্টের স্থলে গম্বুজ অংকন করেছেন।[৯৬] কিন্তু এরূপ দীর্ঘ স্তম্ভবিহীন স্থান গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদন সম্ভব নয়। এর উভয় পার্শ্বে একটি করে ২২.৩০ মিটার দীর্ঘ এবং ২.৮৫ মিটার প্রস্থের কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলোও টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এগুলোতে প্রবেশের জন্য চারটি করে খিলানকৃত পথ রয়েছে। এগুলোর মধ্যবর্তী ২.৭৫ মিটার ঘনত্ব বিশিষ্ট দেয়াল একেকটা পিয়ারের (Pier) রূপ ধারণ করেছে। কক্ষগুলো হতে আবার বাইরে যাওয়ার জন্য

---

৯৩. Olegravear & Richard Ettinghausen, *Art and Architecture of Islam*, p. 329, pl. 349(b).

৯৪. Percy Brown, *(Islamic)*, pl.xi, fig,1.

৯৫. প্রাক- ইসলামী যুগে ইউয়ানের উৎপত্তি হলেও প্রবেশদ্বারে অর্ধ-গম্বুজে আবৃত ইউয়ানের ব্যবস্থাপনা তৈমুরীয়দের সময়েই প্রথম দেখা যায়।

৯৬. চিত্র -৬ দেখুন।

Dhaka University Institutional Repository

বহির্দেয়ালে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এবং মেঝে হতে ৬২ সে.মি. উঁচুতে দুটি করে খিলান পথ রয়েছে। দানী এর অভ্যন্তর ভাগ হতে দুর্গ প্রাচীরে উত্তরণের জন্য সিঁড়ির[৯৭] উল্লেখ করলেও বর্তমানে এখানে সিঁড়ির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তোরণের কেন্দ্রীয় খিলান পথের উভয় পাশে অভ্যন্তর ভাগে দুটি করে বিরাটাকার ছিদ্র রয়েছে যা সম্ভবত দরজা আটকানোর কাজে ব্যবহৃত হতো।

দাখিল দরওয়াজার উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদ একই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে। এমনকি অলংকরণের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তবে পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদ আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। এর প্রত্যেকটিতে দুটি খিলান পথ ব্যতীত সমগ্র দেয়াল উদ্‌গত ও প্রবিষ্ট প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এগুলো আবার মোল্ডিং নক্‌শা দ্বারা বিভক্ত। এখানে দুর্গ প্রাচীরের চিহ্ন নেই। ফলে প্রাচীরটি ফাসাদের কোন্ অংশের সাথে সংযুক্ত ছিল তা সনাক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। আবিদ আলীর মতে, ইমারতটি প্রথমে আলংকারিক আবরণ দ্বারা সর্বময় ঢাকা ছিল এবং পরে পূর্ব ও পশ্চিমে মাটি দ্বারা আবৃত করে দুর্গ দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।[৯৮] কানিংহাম এর মতে, প্রহরী কক্ষের বহির্দরজার একটি দুর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরের দিকে ছিল।[৯৯] সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, প্রবেশ দ্বারগুলো ব্যতীত সম্পূর্ণ অংশই মাটি দ্বারা আবৃত হয়ে দুর্গ প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত ছিল।

অলংকরণঃ

দাখিল দরওয়াজাকে টেরাকোটা অলংকরণের যাদুঘর বললে অত্যুক্তি হবে না। সজ্জিতকরণের জন্য বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে যত রকম আলংকারিক মটিফের উদ্ভব হয়েছে তার বেশীর ভাগই দাখিল দরওয়াজায় লক্ষ্য করা যায়। এতে রোজেট, জ্বলন্ত

---

৯৭. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961A.D, p.101.

৯৮. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D., p. 51.

৯৯. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv., p. 51.

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য, ঝুলন্ত মটিফ, আন্দোলিত বর্ডার, আলংকারিক কুলঙ্গী প্রভৃতি অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গতভাবে সাজানো হয়েছে। এর সমগ্র বহির্ফাসাদ ও কোণা বুরুজগুলো উদ্‌গত ও প্রবিষ্ট নক্‌শায় বিভক্ত করে তাতে ঝুলন্ত চেইন এবং ফুলের অলংকরণ সম্বলিত নক্‌শা খিলানে পূর্ণ করা হয়েছে।

তোরণের সম্মুখ ফাসাদে অলংকরণের বৈচিত্র ও জাঁকালোতার পরিচয় পাওয়া যায়। এটি সমান্তরালভাবে পাঁচটি ও লম্বভাবে তিনটি আলংকারিক স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ খিলানের উভয় দিকে রয়েছে একটি করে অপেক্ষাকৃত গভীর প্যানেল। এগুলো আয়াতাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে স্তম্ভের উপর নির্মিত খাঁজ বিশিষ্ট নক্‌শা খিলানে সজ্জিত। ইতিপূর্বে নির্মিত আদিনা মসজিদের বহির্ফাসাদে এবং কোতোয়ালী দরওয়াজার টিকে থাকা পার্শ্ববুরুজের গায়ে প্রায় একই রকম খিলান প্যানেল রয়েছে। মূলত অলংকরণের এই মটিফটি সমগ্র সুলতানী আমল জুড়েই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ফাসাদের অন্যান্য অংশে প্রথিত হয়েছে ঝুলন্ত চেইন মটিফ সম্বলিত খাঁচ যুক্ত নক্‌শা খিলান।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের টিমপেনামে (Tympanum) অত্যন্ত চমকপ্রদ টেরাকোটার প্যানেল রয়েছে। এটি মূল দেয়াল হতে উদ্‌গত এবং অনেকটা ঝুলন্ত বারান্দার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে আলংকারিক স্তম্ভের উপর নির্মিত খাঁজ খিলান। এরূপ শিখরযুক্ত প্যানেল গৌড়ের চিকা ইমারতে লক্ষ্য করা যায়। প্যানেলের উভয়পাশে দুটি বিরাটাকার গোলাপ রয়েছে (চিত্র-৭)। পার্সী ব্রাউন এগুলোকে জ্বলন্ত সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন।[১০০] প্রবেশ খিলানের স্প্যান্ড্রিলেও অনুরূপ উদ্‌গত গোলাপ নক্‌শা রয়েছে। সম্মুখ ফাসাদের ন্যায় এর কোণা বুরুজগুলোও উল্লম্ব ও সমান্তরাল ভাবে পলকেটে তাতে ঝুলন্ত চেইনে ফুলেল নক্‌শার প্রান্তভাগ সমন্বিত খাঁজ খিলানের রিলিফ নক্‌শায় পূর্ণ করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় কোণা

---

১০০. Percy Brown, *(Islamic)*, p. 39.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৭ঃ টিমপেনামের সূর্য ও খিলানকৃত প্যানেল অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

বুরুজগুলো মোল্ডিং দ্বারা পাঁচটি আলংকারিক স্তরে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর বেশিরভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে।

তোরণটির সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদ একইভাবে উল্লম্ব ও সমান্তরাল আলংকারিক স্তরে বিভক্ত এবং ঝুলন্ত চেইন সম্বলিত খাঁজকৃত নক্শা খিলান রয়েছে। তাছাড়া সমগ্র ফাসাদ জুড়ে স্তরীকরণের জন্য যে মোল্ডিং ব্যবহৃত হয়েছে তার নিম্নভাগ জালি নক্শা এবং উপরিভাগ ক্ষুদ্রকার অন্ধ মারলন নক্শার বেন্ড দ্বারা জাঁকালো রূপ লাভ করেছে।

তোরণের অভ্যন্তর ভাগেও অলংকরণ রয়েছে। প্রহরী কক্ষের খিলানের উপরিভাগ তিন সারির ফুল, পাতা ও বরফি নক্শার বেন্ড ছাড়াও এর স্প্যান্ড্রিল চার পাপড়ির ফুল দ্বারা অলংকৃত। এ সকল অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও দৃঢ়তায় বাংলার কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইটের তৈরী ইমারতে টেরাকোটা অলংকরণ দ্বারা সজ্জিতকরণের রীতি বাংলায় প্রচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই স্থাপনাটিতে তার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

নির্মাণ উপাদানঃ

নির্মাণে সামগ্রিক ভাবে ইটের ব্যবহার করা হলেও প্রবেশ খিলানের স্প্রিং লাইন পযর্ন্ত পাথরে আবৃত। পূর্বে অভ্যন্তর ভাগেও অনুরূপ আচ্ছাদন ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে তা টিকে নেই। তবে খিলানের স্প্রিং লাইনে এখনও পাথরের বীম দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনাঃ

দাখিল দরওয়াজাটি সুলতানী আমলে বাংলায় নির্মিত তোরণ স্থাপত্যের সর্ববৃহৎ ও সমগ্র বাংলায় টিকে থাকা তোরণগুলোর মধ্যে সবচাইতে জাঁকালো নিদর্শন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অঞ্চলে স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে বহির্দেশীয়

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানের সমন্বয় সাধনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার সার্থক প্রয়োগ এ তোরণটিতে লক্ষ্য করা যায়। এখানে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক আনিত খিলান, ভল্টের সাথে স্থানীয় উপাদান ইটের নির্মাণ ও টেরাকোটা অলংকরণের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সর্বোপরি আকৃতিগত বিশালতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার সাথে ক্রমহ্রাসমান কোণা বুরুজ এবং পাইলন নির্মাণের মাধ্যমে তোরণটিতে রাজকীয় তোরণ স্থাপত্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কোতোয়ালী দরওয়াজা

অবস্থানঃ

মৌজা– সাতগদা, গ্রাম– মহদীপুর, জেলা– মালদহ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম রাজধানী গৌড় নগরীর দক্ষিণ তোরণটি কোতোয়ালী দরওয়াজা নামে পরিচিত। এটি ছোট সোনা মসজিদ হতে ৩ কি.মি. উত্তরে এবং গৌড় দুর্গের ৩ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত। বর্তমানে এটি ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত রেখায় (চাপাই নবাবগঞ্জ – মালদহ) পড়েছে।

এই তোরণের নামকরণ সংক্রান্ত দুটি মত পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত মতে, এটি 'কতল দরওয়াজা' (আরবী) বা হত্যা তোরণ। কেননা এখানে অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হতো।[১০১] দ্বিতীয় মত যা অধিক প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্য তা হলো 'কোতোয়ালী দরওয়াজা'। এই 'কোতোয়ালী' শব্দটি ফার্সী 'কতোয়াল' হতে উদ্ভুত। এর অর্থ দুর্গ বা নগরীর প্রধান বা প্রধান পুলিশ। এর উৎপত্তি স্থল পারস্য হতে শব্দটি শহর কিংবা দুর্গের গভর্ণরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং সুলতানী বাংলার প্রশাসনেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অনুমান করা সঙ্গত, এ স্থানে নগরাধ্যক্ষের আবাস স্থল কিংবা অফিস ছিল এবং তা থেকেই তোরণটির নাম 'কোতোয়ালী দরওয়াজা' হয়েছে।[১০২] শ্যাম প্রশাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, নগরীর এই তোরণে পালাক্রমে প্রায় ৫০০ প্রহরী কাজ করত। এলাহী বক্স এটিকে 'সালামী দরওয়াজা' হিসেবে উল্লেখ করলেও এই নামটি গৌড় দুর্গের উত্তর তোরণ 'দাখিল দরওয়াজা'র ক্ষেত্রে অধিক প্রচলিত।

---

১০১. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. Xv, p.69.

১০২. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 94.

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কালঃ

কোতোয়ালী দরওয়াজার নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এলাহী বক্স তোরণগাত্রে একটি শিলালিপি দেখেছিলেন যা কানিংহামের সময়েও বর্তমান ছিল। ব্লকম্যান (Blockmen) এর অনুবাদ করেন এবং তাতে ৮৬২ হিঃ/১৪৫৭ খ্রিঃ এ একটি পাঁচ খিলানের সেতু নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৩] স্থাপত্য বিশারদগণ এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান বিশ্লেষণপূর্বক নির্মাণকাল নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। কানিংহাম গৌড়ের অন্যান্য তোরণের সাথে এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য তুলনা করে একে আরও পূর্ববর্তী নির্মাণ বলে উল্লেখ করেন।[১০৪] তিনি এর ক্রমহ্রাসমান অর্ধ-বৃত্তাকার সংযুক্ত বুরুজ, ফাসাদের উভয় পার্শ্বে অলংকৃত স্তম্ভের উপর কৌণিক খিলান নক্শা সম্বলিত গভীর কুলঙ্গী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে দিল্লীর প্রাথমিক যুগের মুসলিম স্থাপত্যের সাথে মিলিয়ে একে সমসাময়িক কালে বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝিতে নির্মাণ বলে অনুমান করেন। পার্সী ব্রাউন এর কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পাশে ব্যবহৃত ঢালু বুরুজের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে সমসাময়িক ভারতের রাজকীয় তুঘলক স্থাপত্যের উপাদান হিসেবে বর্ণনা করে এর প্রভাব স্বরূপ তোরণটিকে ১৪শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের স্থাপনা বলে মত প্রকাশ করেন।[১০৫] কিন্তু দাখিল দরওয়াজা (নির্মাণ-পঞ্চদশ শতক), চান্দ দরওয়াজা (নির্মাণ-পঞ্চদশ শতক) প্রভৃতি গৌড় দুর্গের তোরণসমূহের সাথে কোতোয়ালী দরওয়াজার আকৃতিগত বিশালতা, ব্যান্ডযুক্ত ক্রমহ্রাসমান সংযুক্ত বুরুজ, বিরাটাকার খিলানের অভ্যন্তরে মূল প্রবেশ খিলান নির্মাণের রীতি এবং এর উভয় পাশে আলংকারিক স্তম্ভের উপর খিলান নক্শা সম্বলিত গভীর প্যানেল এবং সর্বোপরি এ সকল স্থাপত্যিক উপাদানের সমন্বয় সাধন একে পূর্বোক্ত তোরণসমূহের কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে গৌড়ের অন্যান্য ইমারত অপেক্ষা এটি কম

---

১০৩. A. Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions in Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka -1992 A.D. p. 134.
১০৪. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv, p. 70.
১০৫. P.Brown, *Ibid (Islamic)*, p. 38.

Dhaka University Institutional Repository

অলংকৃত। আহমেদ হাসান দানী এর ইটের কাজের দক্ষতা, নির্মাণ রীতিসহ সমসাময়িক ইতিহাস বিশ্লেষণপূর্বক ১৪শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পূর্বে গৌড়ে এরূপ সুরক্ষিত তোরণ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নাকোচ করে দেন এবং দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ্ পান্ডুয়া হতে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরের পরেই একে একটি সুরক্ষিত নগরীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তোরণটি নির্মাণ করেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[১০৬] কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসের কোন্ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এরূপ সুরক্ষিত তোরণ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ছিল না তিনি তা উল্লেখ করেননি। গৌড় নগরীটি মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগ থেকেই রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ৬৬৪ হিঃ/১২৪৩ খ্রিঃ এ তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের রচয়িতা মিনহাজের গৌড় ভ্রমনের বর্ণনায় ত্রয়োদশ শতকে লখনৌতিতে তোরণ নির্মানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৭] ১৪শ শতক এবং এর পূর্ববর্তীকালে বাংলা বার বার দিল্লীর শাসকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে সুরক্ষিত প্রবেশ তোরণের প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রথম থেকেই এ স্থানে সুরক্ষিত নগরীর অস্তিত্ব ছিল এবং সুরক্ষিত তোরণও ছিল। ইলিয়াস শাহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাজধানী গৌড় হতে পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে গৌড়ের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থার পতন ঘটে। পরবর্তীতে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ্ ইলিয়াস শাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গৌড়ের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার তথা নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি কোতোয়ালী দরওয়াজা ও লটন মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে পাঁচ খিলানের সেতুর নির্মাণ (১৪৫৭ খ্রিঃ) করেন। এর কারণ, সম্ভবত দক্ষিণে রাজধানীর সীমানা বৃদ্ধি। কেননা, কোতোয়ালী তোরণ ও লটন মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে ১৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর খুব কাছাকাছি তিনটি মসজিদ (চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ ও লটন মসজিদ)

---

১০৬. A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 94.

১০৭. মিনহাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ উক্ত স্থানে জনসংখ্যার আধিক্যের প্রমাণ দেয়। এ সকল বিষয়াদি থেকে ধারণা করা যায়, সুলতান নাসিরউদ্দিনের রাজধানী পরিবর্তনের পর গৌড়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি দক্ষিণে সেতু নির্মাণ করে নগরীর সীমা বৃদ্ধি করেন এবং কোতোয়ালী দরওয়াজা নির্মাণ করে নগরীর সর্ব দক্ষিণ সীমা নির্ধারণ করে দেন। যদি তাই হয়, তাহলে তোরণটি সেতু নির্মাণের নিকটবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

বর্তমান অবস্থাঃ

থমাস দানিয়েল (Thomas Daneill) ১৮২৮ খ্রিঃ এ রাজকীয় একাডেমীতে 'কোতোয়ালী দরওয়াজার' একটি চিত্র প্রদর্শন করেন। চিত্র বর্ণনায় তিনি তোরণটিকে গৌড়ে টিকে থাকা অন্যতম জমকালো স্থাপনা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমানে দুই দিকের রেমপার্টের কিছু অংশ ব্যতীত তোরণটি সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত। রেমপার্টগুলো ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর (বি.এস.এফ) চেকপোষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলোর উপরে তারা ক্যাম্প নির্মাণ করেছেন। ফলে এটি সংরক্ষিত এবং ফটোগ্রাফ নেয়া সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ। ভগ্নাবস্থায় পতিত হওয়ার পূর্বে হেনরী ক্রেইটন এটির একটি মনোরম চিত্র অংকন করেন যা এর সবচেয়ে প্রাচীন দলিল হয়ে টিকে আছে (চিত্র-৮)। পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পূর্বে হেনরী র‍্যাভেনশো প্রমুখ স্থাপত্য প্রেমিক এর ফটোগ্রাফ নেন (চিত্র-৯)। তাদের সংগৃহীত চিত্র এবং তথ্যাদিই কোতোয়ালী দরওয়াজা সম্পর্কে জানার একমাত্র মাধ্যম।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও স্থাপত্য বিষারদদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তোরণটির স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্যের পুর্নগঠন সম্ভব। জানা যায়, কোতোয়ালী দরওয়াজাটি গৌড় নগরীর দক্ষিণ প্রাচীরের কেন্দ্র বিন্দুতে নির্মিত হয়েছিল। তোরণের

Dhaka University Institutional Repository

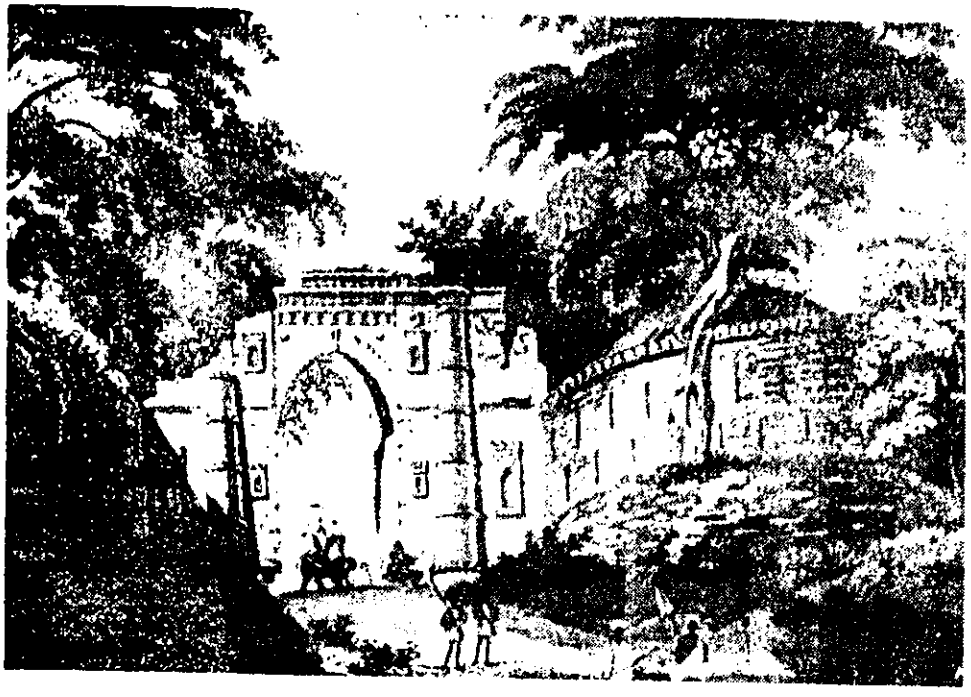

চিত্র-৮ঃ কতোয়ালী দরওয়াজা (ক্রেইটন)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৯: লোকোখানী পরওয়ানা (গায়েনবো)

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্ববর্তী রেমপার্টের আকৃতি, এর উচ্চতা এবং মধ্যবর্তী ফাকা স্থানের সাথে ক্রেইটনের চিত্র মিলালে এর বিরাটাকার কাঠামোর পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কানিংহামের বিবরণ হতে জানা যায়, এর কেন্দ্রীয় খিলান উত্তর-দক্ষিণে ১৭ ০৪´ দীর্ঘ, পূর্ব-পশ্চিমে ১৬ ০৯´ প্রস্থ বিশিষ্ট যা অনেকটা বর্গাকারের রূপ ধারণ করেছে এবং ৩১ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল। ক্রেইটনের সময় তোরণের সম্মুখ ফাসাদের সার্বিক উচ্চতা ছিল ৪০। কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পাশে তোরণের ৬ ডায়ামিটারের দুটি ক্রমহ্রাসমান সংযুক্ত বুরুজ রয়েছে। এগুলো অর্ধ-বৃত্তাকারে নির্মিত এবং পাঁচটি মোল্ডিং নক্শার ব্যান্ড দ্বারা বিভাজিত। মাহমুদুল হাসান বুরুজগুলোতে চূড়া ছিল বলে বর্ণনা করেন এবং এগুলো ইমারতের উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন।[১০৮] কিন্তু ক্রেইটনের চিত্রে চূড়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। বুরুজগুলোর উভয় পাশে দুই সারিতে আয়তাকার উদ্গত প্যানেল অত্যন্ত চমকপ্রদ। এর অভ্যন্তরে নক্শাকৃত স্তম্ভের উপর কৌণিক ত্রিখাঁজ খিলান রয়েছে যার অভ্যন্তরের কুলঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত গভীর। এরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্যানেল পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদের (নি: ১৩৭৫ খ্রিঃ) পশ্চিম ফাসাদে এবং গৌড়ের দাখিল দরওয়াজার উভয় ফাসাদে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে নক্শা খিলানগুলো বহুখাঁজ বিশিষ্ট। তোরণের সর্বোচ্চে দুই সারি মারলন নক্শা রয়েছে। এর আচ্ছাদনের জন্য সম্ভবত ভল্টের ব্যবহার করা হয়েছিল। কি ধরণের ভল্ট এখানে ব্যবহৃত হয়েছিল তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে এর অনেকটা বর্গাকার পরিমাপ গম্বুজের প্রতি অধিকতর সমর্থন দেয়। ক্রেইটনের চিত্রে তোরণের পাশে অর্ধ-বৃত্তাকার প্রাচীর বুরুজ থাকলেও এর চূড়ায় যে মারলনের সারি ছিল তা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। যদিও তার চিত্রে তোরণের সম্মুখ ফাসাদ অংকিত হয়েছে তথাপি সুলতানী যুগে নির্মিত গৌড়ের অন্যান্য তোরণের সাথে তুলনা করলে (চিকা ইমারত ব্যতীত) অনুমান করা যায়, এর উভয় ফাসাদ একই বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হয়েছিল।

---

১০৮. Sayed Mahmudul Hasan, *Gaur and Hazrat Pandua*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987 A.D. p. 57.

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

ক্রেইটনের চিত্রে তোরণটিতে অলংকরণের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এর কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের স্প্যান্ড্রিলে উদ্‌গত টেরাকোটা ফুলের নক্‌শা রয়েছে। সম্ভবত অনেকটা একই রকম নক্‌শা পার্শ্ব দেয়ালে প্যানেলের উপরিভাগে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া ফাসাদের প্যানেল এবং শীর্ষ ভাগের মারলন নক্‌শাসমূহ সম্পূর্ণ আলংকারিক। তবে গৌড়ের দাখিল দরওয়াজার অলংকরণের সাথে এর তুলনা করে কোতোয়ালী দরওয়াজাটি অনেক বেশি সরল নির্মাণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

সাধারণ আলোচনাঃ

প্রায় ২০ বর্গ কি.মি. জুড়ে গৌড় নগরীর বিস্তৃতি থাকলেও এই একটি মাত্র তোরণের চিহ্ন এখনও কিছুটা হলেও বর্তমান আছে। ফলে নগরীর অন্যান্য তোরণের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য জানার জন্য এই তোরণটির পরিকল্পনা বা গঠনগত বৈশিষ্ট্যাদির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কোতোয়ালী দরওয়াজার ভূমি পরিকল্পনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যাদি পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন বিবরণ থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে নগর তোরণ হিসেবে একটি তোরণে যে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তার সবই এটিতে বিদ্যমান ছিল বলে ধারণা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ষাট গম্বুজ মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

মৌজা- সুন্দরঘোনা, ইউনিয়ন- ষাট গম্বুজ, থানা- বাগেরহাট সদর, জেলা- বাগেরহাট।

ষাট গম্বুজ মসজিদটি বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ এবং সর্বাধিক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ (চিত্র-১০)। মধ্যযুগীয় বাংলার মসজিদগুলোর সাথে তুলনা করলে বিশালত্বের দিক থেকে গৌড়ের আদিনা মসজিদের পরেই এই মসজিদটি স্থান করে নেয়। বিশাল ঘোড়াদিঘির পূর্ব তীরে একটি প্রাচীর ঘেরা এলাকার পশ্চিম বাহুর নিকটবর্তী স্থানে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। প্রাচীরের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বাহুতে তিনটি তোরণ রয়েছে। দক্ষিণ বাহুতেও অনুরূপ একটি তোরণের ভিত আবিস্কৃত হয়েছে[১০৯]; কিন্তু বর্তমানে এ স্থানটি প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ষাট গম্বুজ মসজিদের তোরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, আর তা হলো এর পশ্চিম দিকের প্রাচীর দেয়ালে একটি তোরণের অবস্থান। বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে এ ধরণের উদাহরণ দ্বিতীয়টি লক্ষ্য করা যায় না। তোরণটি সম্ভবত পশ্চিম দিকে দিঘিতে যাওয়ার পথ ছিল এবং একই সাথে এটি উত্তর দিকে খান জাহানের বাসস্থান থাকার নির্দেশ দেয়।

---

১০৯. ১৯৯৫ খ্রিঃ এ বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীর দেয়ালটি পুনর্নির্মান কালে আরও তিনটি তোরনের ভিত আবিস্কার করেন, Sayeed Mustaque Ahmed, *Choto Sona Mosque in Gaur : An Early Example of Islamic Architecture of Bengal,* Institute Fur Baugeschichte, Der Universitat, 1997, p. 140.

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কালঃ

ষাট গম্বুজ মসজিদ কিংবা এর তোরণে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি । জানা যায়, পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩৮-৫৯ খ্রিঃ) খান জাহান বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।[১১০] প্রচলিত মতানুযায়ী উক্ত মসজিদটি খান জাহান কর্তৃক ১৫শ শতকে নির্মিত হয়েছে। তবে তাঁর সমাধির শিলালিপির সাক্ষ্য[১১১] এবং বাগেরহাট ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার নির্মিত ইমারতের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, উক্ত মসজিদটি খান জাহান কর্তৃক ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। পার্সী ব্রাউনের মতে, মসজিদটি ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছে।[১১২]

বর্তমান অবস্থাঃ

বর্তমানে মসজিদটিতে মোট তিনটি তোরণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ব দিকের তোরণটি অত্যন্ত ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান ছিল, যা পরবর্তীতে পুনর্নির্মিত হয়েছে।[১১৩] ১৯৯৫ খ্রিঃ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর দেয়াল পুনর্নির্মাণের সময় উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের তোরণগুলোর ভিত আবিষ্কার হয়। ভিতের পরিকল্পনানুযায়ী সম্প্রতি উত্তর ও পশ্চিম দিকের তোরণ দুটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ তোরণটি পুনর্নির্মাণ না করে সেই স্থানে প্রাচীর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া উত্তর ও পশ্চিম দিকের তোরণ দুটির নির্মাণও সুসম্পন্ন করা হয়নি। শুধুমাত্র পূর্ব দিকের তোরণটি পূর্ণ অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে পূর্ব তোরণটি নেয়া হয়েছে।

---

১১০. A. Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions in Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka -1992 A.D., L.S.S. O'Mally, *Bengal District Gazetteers: Khulna*, Calcatta-1908 A.D. p. 27.

১১১. খান জাহানের কবরে খোদিত লিপি অনুযায়ী তিনি ১৪৫৯ খ্রিঃ এ মৃত্যুবরণ করেন। A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 141.

১১২. P. Brown, *Ibid, (Islamic)*, India-1997, p. 39.

১১৩. Johana E. Van Louizen de Leeuw, *Ibid*, p. 176-177.

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

ষাট গম্বুজ মসজিদের পূর্ব তোরণটি বৃহৎ পরিসরে নির্মিত (চিত্র-১১)। এটি মসজিদের মূল প্রবেশ তোরণ ছিল। পূর্ব দিকের প্রাচীরের কেন্দ্রে এবং মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বার বরাবর স্থাপিত এই তোরণটি আয়তাকার পরিকল্পনা বিশিষ্ট (ভূমি পরিকল্পনা -৩)। উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি ৯.৯২ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৬৫ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের অঙ্গনে প্রবেশের জন্য তোরণটির কেন্দ্রে খিলান পথ রয়েছে। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ২.৩৯ মিটার এরং শীর্ষ বিন্দুতে উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৪.০৫ মিটার। খিলানটি একটি আয়তাকার ফ্রেমের ১০ সে.মি. অভ্যন্তরে প্রথিত। তবে খিলানের উৎক্ষেপণ অংশ পর্যন্ত নিম্নভাগ এই ফ্রেমের দেয়ালের সাথে মিশে গেছে। পার্শ্ববর্তী দেয়াল হতে খিলানের ফ্রেমটি ১০ মিটার উদ্‌গত হয়ে কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে।

তোরণের ভিত উপরিভাগের দেয়াল হতে কিছুটা উদ্‌গত। এ অংশে ভূমি পর্যন্ত মোট ৩টি মোল্ডিং নক্‌শার বেন্ড রয়েছে। এর পূর্ব দিকের এই ফাসাদে খিলানের শীর্ষ বিন্দু বরাবর একটি সমান্তরাল অলংকৃত মোল্ডিং নক্‌শার বেন্ড রয়েছে। তাছাড়া ফাসাদটি একেবারেই সাদামাটা। তোরণের কার্নিশ মসজিদের কার্নিশের ন্যায় বাঁকানো। তবে এ অংশে মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগের কার্নিশের ন্যায় পেডিমেন্টের (Pediment) উপস্থিতি দেখা না। কার্নিশটি সামনের দিকে ১৫ সে.মি. উদ্‌গত। এর নিম্নভাগে তিন সারি নক্‌শার বেন্ড রয়েছে এবং কার্নিশটিও অলংকৃত। তোরণটির আচ্ছাদনে সমতল ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগ একটি টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। ভল্টটি খিলানের সাথে মিশে গেছে। ফলে ভূমি হতে শীর্ষ বিন্দুতে এর উচ্চতা খিলানের উচ্চতার সমান্তরালে উঠে গেছে (৪.০৫ মিটার)। এর নিম্নভাগে তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি আয়তাকার ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে এবং এগুলোর উচ্চতা ৩০ সে.মি. ও প্রস্থ ১৫ সে.মি.। এগুলো ফাসাদের নিকটে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

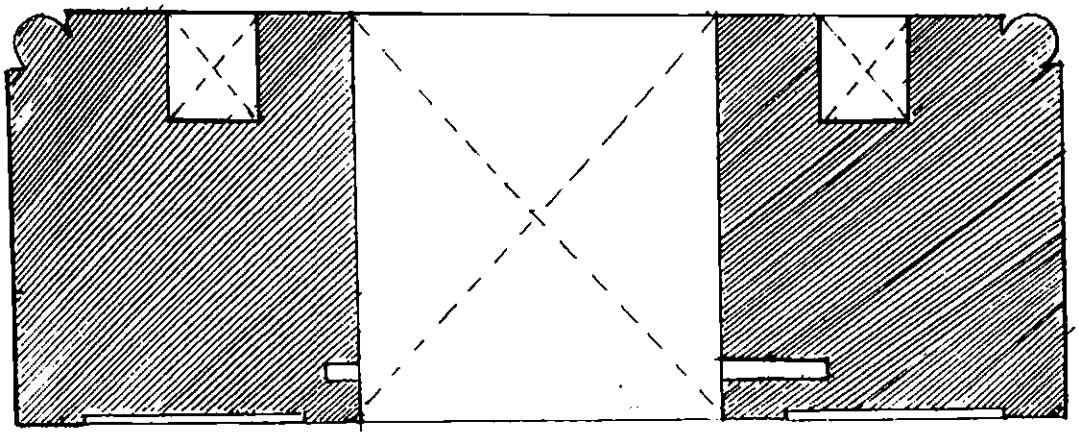

ভূমি পরিকল্পনা-৩ঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের পূর্ব তোরণ

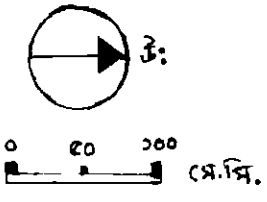

Dhaka University Institutional Repository

যদিও উপরিভাগে বর্তমানে দরজার পাল্লা আটকানোর জন্য কোন লুব এর অস্তিত্ব দেখা যায় না। তথাপি ছিদ্রগুলো প্রমাণ করে যে, এগুলো দরজার খিল লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হতো এবং দরজায় পাল্লা আটকানোর ব্যবস্থাও ছিল যা পুনর্নির্মাণের সময় সম্ভবত ভুলবশতঃ নির্মাণ করা হয়নি।

তোরণের পশ্চিম ফাসাদটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য পূর্ব ফাসাদ অপেক্ষা ভিন্নতর। এক্ষেত্রে ফাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুটি প্রবিষ্ট সংযুক্ত বুরুজ রয়েছে। এই বুরুজগুলোর ভিতে পরপর তিনটি মোল্ডিং নক্শার বেন্ড ছাড়াও উপরিভাগে সম্পূর্ণ বুরুজে আরও ছয়টি মোল্ডিং নক্শার বেন্ড রয়েছে যা গোলাকার বুরুজটিকে কার্নিশ পর্যন্ত ছয়টি অংশে ভাগ করেছে। এই ফাসাদের উভয় দেয়ালে কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী অংশে একটি করে কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো ১.২০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট, ৬০ সে.মি. প্রশস্ত ও ৭০ সে.মি. গভীর এবং খিলানাকৃতির ক্ষুদ্র টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। কুলঙ্গীগুলো বর্তমান ভূমি হতে ৭৫ সে.মি. উপরে অবস্থিত।

পশ্চিম ফাসাদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানটি পূর্ব খিলানের অনুরূপ। এক্ষেত্রে খিলান ফ্রেমটি ভূমি থেকে উত্থিত না হয়ে খিলানের উৎক্ষেপণ অংশ হতে ফাসাদের দেয়ালটাকে ১০ সে.মি. উদ্গত করে নির্মিত হয়েছে। তবে পূর্ব ফাসাদের ন্যায় খিলানের শীর্ষ বিন্দু বরাবর কোন মোল্ডিং নক্শার বেন্ড দেখা যায় না। তোরণের কার্নিশটি একই ভাবে বাঁকানো। এর উচ্চতা কেন্দ্রে ৫.৫০ মিটার হলেও এক কোণে তার উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৫ .৩৫ মিটার।

তোরণটির উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদে ২.২০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত প্রাচীর দেয়ালের অংশ উঠে গেছে। যদিও মূল প্রাচীরটি মাত্র ১.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। এছাড়া উভয় প্রাচীরে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে এ অংশের কার্নিশগুলোও বাঁকানো ভাবে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১১ঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

খাঁন জাহান কর্তৃক নির্মিত স্থাপনাগুলোতে অলংকরণের ক্ষেত্রে সমসাময়িক গৌড়ের রীতিরই অবতারণা করা হয়েছে।[১১৪] তবে গৌড়ের ইমারতগুলোর ন্যায় অলংকরণের আধিক্য দেখা যায় না।[১১৫] তবে ষাট গম্বুজ মসজিদের প্রবেশ তোরণে কিছু অলংকরণ রয়েছে। এগুলো ভিতের মোল্ডিং নক্‌শায়, খিলানের স্প্যান্ড্রিলের রোজেট এবং কার্নিশের নিম্নভাগের বরফি নক্‌শায় পরিলক্ষিত হয়। যদিও তোরণটির বেশীর ভাগ পূণর্নির্মাণ করা হয়েছে তথাপি খাঁন জাহানের নির্মিত অন্যান্য ইমারতসমূহ, যেমন- বাগেরহাটের চুনাখোলা মসজিদ, রনবিজয়পুর মসজিদ, জিন্দাপীর মসজিদ, খাঁন জাহানের সমাধি প্রভৃতি ইমারতে টিকে থাকা আদি অলংকরণ প্রমাণ করে যে, এখানেও অলংকরণ ছিল এবং এ সকল অলংকরণের ভিত্তিতেই তোরণে তা পুনর্স্থাপন করা হয়েছে।

সাধারণ আলোচনাঃ

ষাট গম্বুজ মসজিদের তোরণটি বাংলায় নির্মিত মসজিদের তোরণগুলোর মধ্যে টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের মসজিদ ও সমাধির তোরণ নির্মাণে এর স্থাপত্য পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্যই সাধারণত গৃহীত হয়েছে।

---

১১৪. Mohammad Hafizullah Khan, *Tarracotta Ornamentation in Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1988 A. D. p. 139.

১১৫. ষাট গম্বুজ মসজিদটির বিরাটাকৃতি, অবনমিত গোলাকার কোনা বুরুজ, গম্বুজের আধিক্য, দেয়ালের উপরিভাগের অমসৃণতা এবং অলংকরণের স্বল্পতার কারণে অনেকে ষাট গম্বুজ মসজিদে তুঘলক স্থাপত্যের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খান জাহানের সমাধির তোরণসমূহ

অবস্থানঃ

মৌজা ও ইউনিয়নঃ ষাট গম্বুজ, জেলাঃ বাগেরহাট।

বাগেরহাট অঞ্চলটি খান জাহানের স্মৃতি বিজড়িত। এই খান-আল আযম খান জাহান অথবা উলুঘ খান জাহান[১১৬] বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, অথচ রহস্যাবৃত একটি চরিত্র। ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস তাঁর সমাধিলিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী, তিনি তৎকালীন বাংলার শাসক দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিঃ) সমসাময়িক ছিলেন। যতদুর জানা যায়, তিনি বর্তমান যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং এগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকা শাসন করতেন।[১১৭] তবে তিনি সম্ভবত স্বাধীন শাসক ছিলেন না। কেননা তাঁর নামে প্রচলিত কোন মুদ্রা কিংবা এ সম্পর্কিত শিলালিপি পাওয়া যায় না।[১১৮]

খান জাহান তৎকালীন দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় সমগ্র অঞ্চল শাসন করলেও প্রশাসনিক কেন্দ্র বাগেরহাটে ছিল বলে মনে হয়। এ অঞ্চলে তার নির্মিত বহু স্থাপত্যকীর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রচলিত আছে, তিনি ৩৬০টি মসজিদ এবং

---

১১৬. হাবিবা খাতুন, *সমাধি লিপিতে বাগেরহাটের খান জাহান পরিচিতি*, হাবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ২৬২.

১১৭. Johana E. Vanlohuizn de Leeuw, *The Early Muslim Monuments at Bagerhat in Islamic Heritage in Bengal,* (edt.) by George Miechell, UNESCO, 1984, p. 167.

১১৮. Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh*, Dhaka, The University Press Limited, 1984, p.135.

Dhaka University Institutional Repository

তৎসংলগ্ন সমসংখ্যক মিষ্টি পানির পুকুর খনন করেছিলেন। এর মধ্যে বাগেরহাটে অবস্থিত তার নিজের সমাধি কমপ্লেক্সটি অন্যতম উদাহরণ হিসেবে টিকে রয়েছে।

বিরাটাকার ঠাকুর দিঘির উত্তর তীরে কমপ্লেক্সটি নির্মিত হয়েছে (প্লেট-গ)। পুকুর হতে সিঁড়ির সাহায্যে এখানে প্রবেশ করা যায়। প্রায় ৬০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৬০ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট নীচু প্রাচীরে ঘেরা এলাকায় এটি অবস্থিত। এর পশ্চিম বাহুতে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, পূর্ব বাহুতে খাজাঞ্চিখানা হিসেবে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ইমারত এবং মধ্যবর্তী স্থানে এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি সৌধ নির্মিত হয়েছে। কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য প্রাচীর দেয়ালের চারদিকে রয়েছে মোট ৬ টি তোরণ। এর মধ্যে তিনটি দক্ষিণ বাহুতে খাজাঞ্চিখানা, সমাধি এবং মসজিদের বরাবর, একটি পূর্ব বাহুতে, একটি পশ্চিম বাহুতে এবং অপরটি উত্তর বাহুতে অবস্থিত। সমাধি সৌধটি আবার অপর একটি নিচু প্রাচীরে ঘেরা। এই প্রাচীরের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৩.৫০ মিটার। এখানে প্রবেশের জন্য প্রাচীরে মোট তিনটি প্রবেশ তোরণ রয়েছে। এর একটি দক্ষিণ বাহুর মাঝামাঝি প্রথম প্রাচীরের তোরণ এবং সমাধির প্রবেশ দ্বার বরাবর নির্মিত হয়েছে। অপর দুটি যথাক্রমে পশ্চিম বাহুতে মসজিদের দিকে এবং পূর্ব বাহুতে খাজাঞ্চিখানার দিকে উন্মুক্ত।

নির্মাণ কালঃ

খান জাহানের সমাধিলিপি হতে এর নির্মাণ কাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর বিবরণ অনুযায়ী, তিনি ১৪৫৯ খ্রিঃ এ মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই সম্ভবত তিনি নিজের সমাধিটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। কেননা জানা যায়, মৃত্যুর পরের দিন তিনি একটি অত্যন্ত সুন্দর ইমারতে সমাহিত হন।[১১৯] সমাধির তোরণগুলোতে আলাদা

---

১১৯. Johana E. Vanlohuizn de Leeuw, *The Early Muslim Monuments at Bagerhat in Islamic Heritage in Bengal,* (edt.) by George Miechell, UNESCO. 1984, p. 167.

Dhaka University Institutional Repository

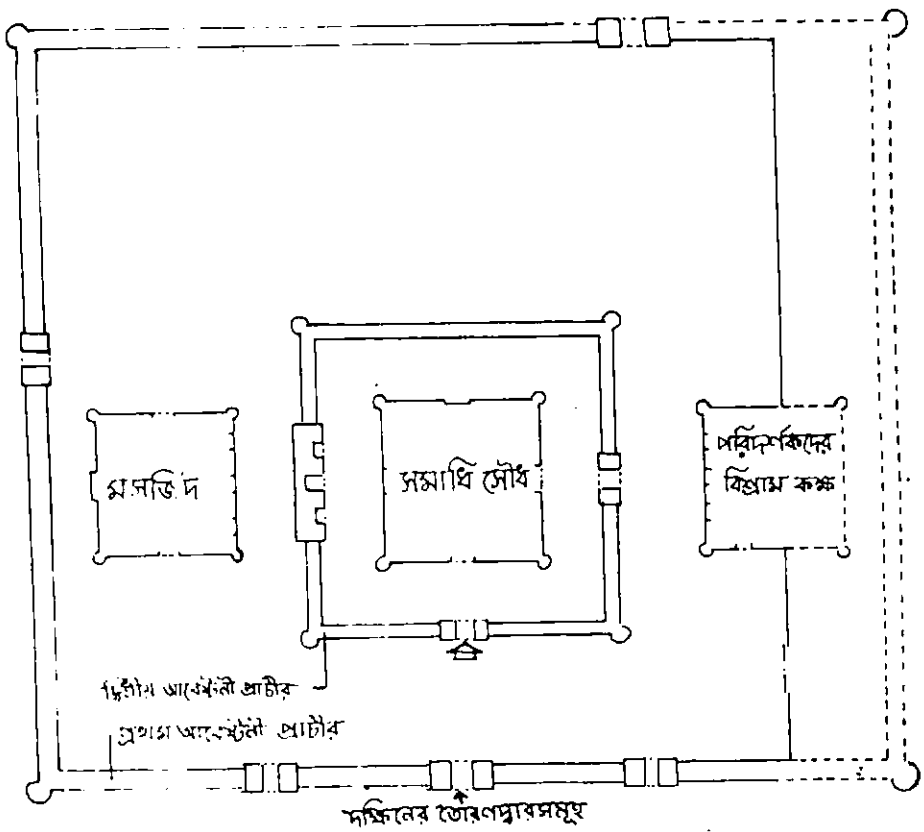

প্লেট-ঘঃ খান জাহানের সমাধি কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

কোন শিলালিপি পাওয়া না গেলেও সমাধি কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা হতে অনুমান করা যায় যে, এগুলো একই সময়ে নির্মিত।

বর্তমান অবস্থাঃ

সর্বপ্রথম ১৯১৩ খ্রিঃ এ বৃটিশ সরকারের অধীনে খান জাহানের সমাধি কমপ্লেক্সটি সংরক্ষিত হয়। এর সমাধি প্রাচীরে নির্মিত তোরণগুলো এখনও আদি পরিকল্পনায় টিকে আছে। বহির্প্রাচীরের প্রায় সবগুলোই বিশেষ করে পূর্ব দেয়ালের তোরণটি কিছু দিন পূর্বে নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে পূর্ব দেয়ালে একটি তোরণের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল।[১২০] তাছাড়া মোসতাক আহমেদ দক্ষিণ দেয়ালের দুটি তোরণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বর্তমানে অবস্থিত তিনটির মধ্যে কোন্ দুটি তোরণ তা স্পষ্ট করে বলেননি। দক্ষিণ দেয়ালের পূর্ব দিকের তোরণটি দৃষ্টে মনে হয় এটি নতুনভাবে নির্মিত। কিন্তু উত্তর তোরণ বরাবর এই তোরণটির স্থলে আদি কোন তোরণ ছিল কিনা তা জানা যায় না। তাছাড়া স্থানীয় লোকজন তথা ফকির বা খাদেমগণ সংস্কারের নামে অপরিকল্পিত এবং স্থাপত্য রীতি বহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করে প্রত্যেকটি তোরণের দেয়ালেই প্লাষ্টার ও বিভিন্ন ধরনের নক্শা করে এর আদি অবস্থার বিকৃত সাধন করেছেন। তবে তোরণগুলোর পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের তেমন কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। বর্তমানে সমগ্র সমাধি কমপ্লেক্সটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

সমাধির তোরণ সমূহের স্থাপত্য বিবরণঃ

খান জাহানের সমাধি কমপ্লেক্সে নির্মিত মোট নয়টি তোরণের আটটিই একই পরিকল্পনায় নির্মিত(চিত্রঃ ১২-১৫), এগুলো এক খিলান বিশিষ্ট। শুধুমাত্র সমাধি

---

১২০. হাবিবা খাতুন, *সমাধি লিপিতে বাগেরহাটের খান জাহান পরিচিতি*, হাবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ২৬৩-৬৪.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১২ঃ সমাধির দক্ষিণ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১৩ঃ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

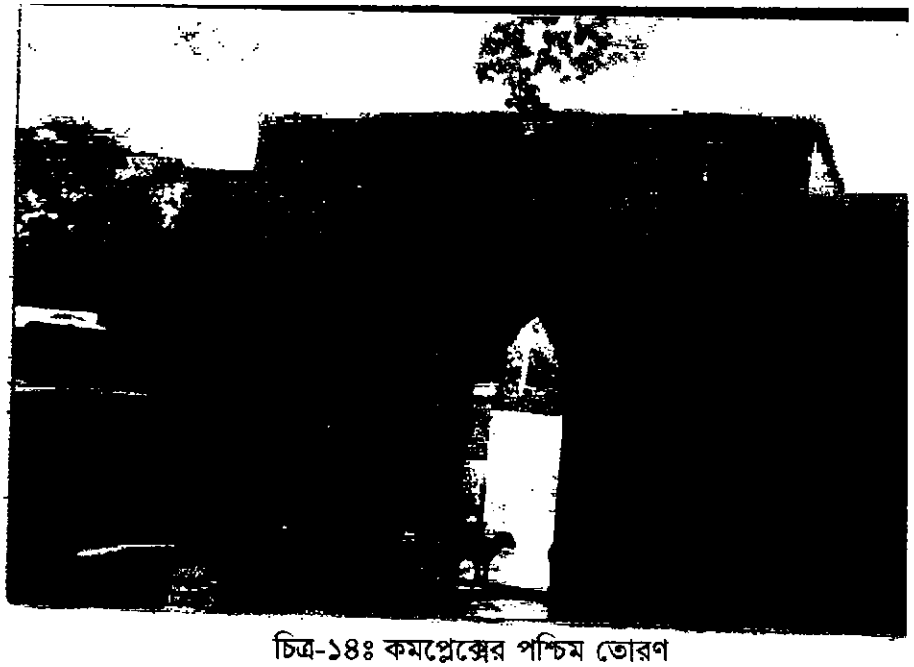

চিত্র-১৪ঃ কমপ্লেক্সের পশ্চিম তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২ঃ সমাধির পূর্ব তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীরের পশ্চিম বাহুতে অবস্থিত মসজিদে প্রবেশের জন্য নির্মিত তোরণটি ব্যতীক্রমধর্মী এবং এটি তিন খিলান বিশিষ্ট। তোরণগুলোর মধ্যে প্রত্যেক পরিকল্পনার একটি করে উদাহরণ হিসেবে নেয়া হয়েছে।

সমাধি কমপ্লেক্সের উত্তর তোরণ

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

খান জাহানের সমাধির বহির্প্রাচীরের উত্তর বাহুর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত প্রবেশ তোরণটি বর্তমানে সমাধি কমপ্লেক্সের মূল প্রবেশ তোরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (চিত্র-১৬)। পরিকল্পনায় এটি একটি এক খিলান বিশিষ্ট আয়তাকার ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-৪)। এর পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ৬.৫১ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২.০৯ মিটার বিস্তৃত। সমাধি কমপ্লেক্সে পৌঁছানোর জন্য তোরণটির কেন্দ্রে নির্মিত হয়েছে খিলান পথ। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ২.৬০ মিটার বিস্তৃত হয়ে তোরণকে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করেছে।

তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রে অবস্থিত দুটি কৌণিক দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের সমন্বয়ে প্রবেশ পথটি গঠিত। এর মধ্যে উত্তর দিকের খিলানটির ঘনত্ব ৭১ সে.মি. এবং উচ্চতা শীর্ষ বিন্দুতে ৩.৩১ মিটার। এটি অভ্যন্তর ভাগের দেয়াল হতে কমপক্ষে ১৫ সে.মি. অগ্রসর এবং উৎক্ষেপণ অংশে খিলানের দেয়াল অপেক্ষা উদ্‌গত। তবে খিলানের বর্তমান আকৃতি অনেকটা পরিবর্তিত বলে মনে হয়। কেননা, এটি মূল সমাধির খিলান অপেক্ষা কিছুটা ফাঁকা। খিলানটি এর স্প্যান্ড্রিলসহ তোরণের ফাসাদে প্রবিষ্ট। এর পার্শ্ববর্তী অংশগুলো অনেকটা পিলাস্টারের (Pilaster) ন্যায় একেকটি কিউব। তবে এগুলোর ফাসাদে একটি করে কুলঙ্গী রয়েছে যা খাঁজ খিলানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো ৩০ সে.মি. প্রস্থ এবং ৫৫ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট। তোরণের ভিত হতে

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি পরিকল্পনা-৪ঃ খান জাহান সমাধি কমপ্লেক্সের উত্তর তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

কমপক্ষে ১ মিটার উচ্চতায় কুলঙ্গীগুলোর অবস্থান। এ ধরনের ক্ষুদ্রাকারের কুলঙ্গী সাধারণত বাতি রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো এবং তোরণের অভ্যন্তরে থাকতো। কিন্তু তোরণের ফাসাদে এ ধরনের কুলঙ্গী খান জাহানের সমাধির তোরণসমুহ এবং ষাটগম্বুজ মসজিদের পূর্ব তোরণের পশ্চিম ফাসাদ ব্যতিরেকে অন্য কোন তোরণে দেখা যায় না। ফলে এই কুলঙ্গীগুলো কি কাজে ব্যবহার হতো তা জানা যায় না। এরূপ হতে পারে, এগুলোতে বাতি রেখে পথচারীদের পথ দেখানো হতো কিংবা সাপদসংকুল অঞ্চল হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীদের ভীতি প্রদর্শন করা হতো।

তোরণের কার্নিশ অনেকটা সমান্তরাল এবং ভূমি হতে এর উচ্চতা ৪ মিটার যা ছাদসহ ৪.০৭ মিটারে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে আদিতে যে কার্নিশটি সমাধির কার্নিশের ন্যায় বাঁকা ছিল তা সমাধির তিন খিলানযুক্ত তোরণের কার্নিশ থেকেই বুঝা যায়। আচ্ছাদনের জন্য সমতল ছাদ কিছুটা ঢালু ভাবে নির্মিত হয়েছে। তোরণটির অভ্যন্তর ভাগ সরল হলেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এখানে আচ্ছাদনের জন্য যে চৌচালা ভল্ট নির্মিত হয়েছে তা শিরযুক্ত এবং কুঁড়ে ঘরে ব্যবহৃত বাঁশের ফালিতে বাধাই করা চালার ন্যায় সজ্জিত।[১২১] এ ধরনের নক্শা ষাট গম্বুজ মসজিদের চৌচালার অন্তঃছাদে লক্ষণীয়। পরবর্তীতে নির্মিত চামকাটি মসজিদের (নিঃ ১৪৭৫ খ্রিঃ) চত্তরে প্রস্তরাবৃত কবরের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য আছে।[১২২] অভ্যন্তর ভাগে (যার পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ১.১৭ মিটার) পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশে পূর্ব খিলানের কাছাকাছি দুটি ছিদ্র যুক্ত পাথর দেয়ালে প্রবিষ্ট। এগুলোর মধ্যে পশ্চিম দেয়ালের ছিদ্রটি বৃহৎ। তাছাড়া, এই ছিদ্র বরাবর খিলানের অভ্যন্তর ভাগে দুটি ছিদ্র যুক্ত পাথর রয়েছে। এগুলো দরজার পাল্লা আটকানোর কাজে ব্যবহৃত হতো। খিল লাগানোর জন্য মধ্যবর্তী ছিদ্রগুলো ব্যবহার করা হতো। এই ছিদ্র বরাবর পশ্চিম দেয়ালে অপর একটি ক্ষুদ্র কুলঙ্গী রয়েছে। ৩০ সে.মি. উচ্চতা, ১৮ সে.মি. প্রস্থ এবং ২০ সে.মি. গভীর এই

---

১২১. হাবিবা খাতুন, *সমাধি লিপিতে বাগেরহাটের খান জাহান পরিচিতি*, হাবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ২৬৩.

১২২. হাবিবা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৩.

Dhaka University Institutional Repository

কুলঙ্গীটি একটি খাঁজ খিলানের সমন্বয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রাকৃতির ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কুলঙ্গীটি যে বাতি রাখার কাজে ব্যবহৃত হতো তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তোরণের দক্ষিণ ফাসাদটি স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্যে উত্তর ফাসাদের অনুরূপ। এর কেন্দ্রে খিলানকৃত প্রবেশ পথ ও পার্শ্ববর্তী অংশে কুলঙ্গী রয়েছে যা আয়তাকার প্যানেলের অভ্যন্তরে প্রথিত।

অলংকরণঃ

বাংলা স্থাপত্যের ইতিহাসে খান জাহান কর্তৃক নির্মিত ইমারতসমূহ অলংকরণবিহীন ইমারত হিসেবে সমাধিক পরিচিত। তবে অলংকরণ যে একেবারেই ছিল না তা সমীচীন নয়। যদিও তোরণের ভল্টে বাঁশের ফালির নক্শা ব্যতীত অন্য কোন অলংকরণ নেই তথাপি সমাধির কার্নিশ ও কোণা বুরুজে এখনও যে অলংকরণের বেন্ড টিকে আছে তা থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তোরণের ক্ষেত্রেও এরূপ হালকা অলংকরণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর গায়ে প্লাষ্টার করে তাতে নানা ধরনের নক্শা করা হয়েছে যার কোনটাই আদি নয়।

নির্মাণ উপাদানঃ

তোরণটি সম্পূর্ণ ইট দ্বারা নির্মিত। তবে এ অঞ্চলের জলবায়ু এবং পানির লবণাক্ততা থেকে ইটকে রক্ষা করার জন্য সমাধির ন্যায় তোরণগুলোতেও নিশ্চয়ই কিছু কিছু পাথরের ব্যবহার হয়েছিল। অবশ্য বর্তমানে প্লাষ্টারের কারণে এগুলো চিহ্নিত করা যায়না।

Dhaka University Institutional Repository

ভল্টে বাঁশের ফালি অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

সমাধি প্রাচীরের পশ্চিম তোরণ

খান জাহানের সমাধি প্রাচীরের পশ্চিম বাহুতে তোরণটির অবস্থান। এটি সমাধি এবং মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার বরাবরে, সম্ভবত সমাধি হতে মসজিদে প্রবেশের জন্য নির্মিত হয়েছিল। কমপ্লেক্সে নির্মিত মোট নয়টি তোরণের মধ্যে এই তোরণটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী (চিত্র-১৭)। পূর্বে তোরণটি সমাধিতে পৌছানোর মূল প্রবেশ পথ ছিল।[১২৩] কিন্তু বর্তমানে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

সার্বিক পরিকল্পনায় তোরণটি একটি তিন খিলান বিশিষ্ট আয়তাকার ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-৫)। এর বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে ১১.১৬ মিটার। তোরণটির উত্তর ও দক্ষিণে দুই স্তর বিশিষ্ট সিঁড়ির ন্যায় দুটি বর্ধিত অংশ রয়েছে। এই তোরণের খিলানগুলো কৌণিক দ্বিকেন্দ্রিক। মোট তিনটি খিলানের মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানটি অপরাপরগুলো অপেক্ষা বৃহত্তর। এটি উত্তর-দক্ষিণে ১.৪৫ মিটার দীর্ঘ। এর ঘনত্ব ৫০ সে.মি. এবং উচ্চতা শীর্ষ বিন্দুতে ২.৪৪ মিটার।

পার্শ্ববর্তী খিলান দুটি একই প্রস্থ বিশিষ্ট হলেও কেন্দ্রীয় খিলান অপেক্ষা নিচু। এর প্রত্যেকটির উচ্চতা শীর্ষ বিন্দুতে ১.৯৮ মিটার এবং প্রস্থ ১.০৫ মিটার। খিলানগুলো আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং প্যানেলগুলো ফাসাদের দেয়ালে প্রবিষ্ট। এক্ষেত্রে ফাসাদের দেয়াল হতে খিলান স্তম্ভটি প্রায় ১০ সে.মি. প্রবিষ্ট, যা সমাধির অপরাপর তোরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে খিলানের স্তম্ভ ফাসাদের দেয়ালের সাথে মিশে গেছে। তিন খিলানের মাঝে এবং পার্শ্ববর্তী অংশে তোরণের ফাসাদে একটি করে কুলঙ্গী রয়েছে। কুলঙ্গীগুলো আয়তাকার প্যানেলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট।

---

১২৩. হাবিবা খাতুন, *সমাধি লিপিতে বাগেরহাটের খান জাহান পরিচিতি*, হাবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ২৬৩.

Dhaka University Institutional Repository

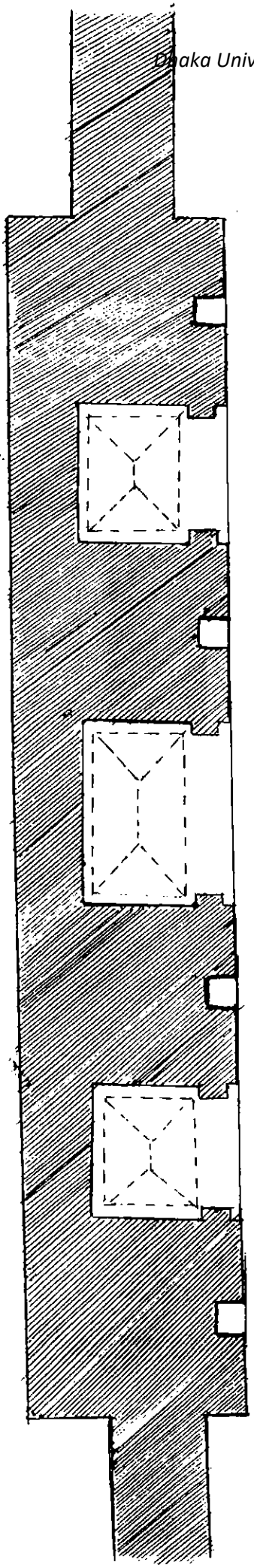

ভূমি পরিকল্পনা ৫ঃ সমাধি প্রাচীরের পশ্চিম তোরণ

উ:

0 ৫০ ১০০ মেমি.

Dhaka University Institutional Repository

এগুলো খাঁজ খিলানের সমন্বয়ে নির্মিত এবং ক্ষুদ্রাকার ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী কুলঙ্গীগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এগুলো প্রায় ১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট আয়তাকার ছিদ্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। কুলঙ্গীগুলো ৩০ সে.মি. প্রশস্ত এবং ৭৫ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট। অপরাপর কুলঙ্গীর প্যানেলের উচ্চতা ৭৫ সে.মি. এবং প্রস্থ ২৫ সে.মি.। কুলঙ্গীর উচ্চতা ৫০ সে.মি.। কুলঙ্গীগুলো ব্যতীত তোরণের ফাসাদে আর কোন স্থাপনা নেই। তোরণের কার্নিশটি কিছুটা বাঁকানো। মধ্যবর্তী স্থানে এর সামগ্রিক উচ্চতা কমপক্ষে ৪ মিটার এবং পার্শ্ববর্তী কোণায় তা প্রায় ৩০ সে.মি. বেঁকে গিয়ে উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৩.৭০ মিটার। বহির্ভাগে তোরণের ছাদটি সমতল, তবে কার্নিশের দিকে ঢালু করে দেয়া হয়েছে।

তোরণের প্রত্যেকটি খিলানের অভ্যন্তর ভাগ চৌচালা ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এগুলো সমাধির অন্যান্য তোরণের ভল্টের ন্যায় কুঁড়ে ঘরের চালার বাঁশের ফালির ন্যায় অলংকরণে সজ্জিত। কেন্দ্রীয় খিলানের ক্ষেত্রে ভল্টটি বর্তমান মেঝ হতে উৎক্ষেপণ স্থানে ২.৭৫ মিটার যা শীর্ষ বিন্দুতে ৩.৬৬ মিটারে পরিণত হয়েছে। এর নিম্নভাগে খিলানের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের দেয়ালের পরিমাপ ৮৩ সে.মি.। তোরণটিতে কোন স্থাপনা কিংবা বাতি রাখার কুলঙ্গী অথবা দরজার খিল লাগানোর ছিদ্র কোনটাই নাই। পার্শ্ববর্তী খিলানের ক্ষেত্রেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, কিন্তু এক্ষেত্রে ভল্টের উচ্চতা কমে গিয়ে ৩ মিটার হয়েছে।

পূর্বে এই তোরণের সাহায্যে মসজিদে যাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে এর পশ্চিম বাহু বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এটি কতদিন পূর্বে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তা জানা যায় না। তবে প্রবেশ তোরণ এবং খান জাহানের সমাধি সৌধের পশ্চিম প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী স্থানে পাথরে আচ্ছাদিত একটি কবরের অবস্থান সন্দেহের উদ্রেক করে। সম্ভবত কবরটি নির্মাণের পর উক্ত তোরণটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর যদি তাই হয় তবে তোরণটি বেশিদিন ব্যবহার করা হয়নি। জানা যায়, কবরটি খান জাহানের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী পীর আলী আবু তাহিরের সমাধি এবং খান জাহানের মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১৭ঃ সমাধি প্রাচীরের পশ্চিম তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। সমাধিটি ১৫শ শতকেই নির্মিত, সেক্ষেত্রে তোরণটি ১৫শ শতকেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে এটি যে একটি তোরণ ছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা প্রবেশ পথগুলো আটকানোর জন্য যে দরজা ব্যবহার করা হতো তার পাল্লা লাগানোর লুব এখনও অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালে রয়েছে।

অলংকরণঃ

বর্তমানে সম্পূর্ণ তোরণটি লাল রং এর প্লাষ্টারে আবৃত। তোরণের ফাসাদে কিংবা অভ্যন্তর ভাগে শুধু মাত্র চৌচালা ভল্টের বাঁশের ফালির নক্শা ব্যতীত অন্য কোন অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় না। তবে বর্তমানে ফাসাদে যে অলংকরণ দেখা যায় তা সাম্প্রতিক কালের।

সাধারণ আলোচনাঃ

খান জাহানের সমাধি কমপ্লেক্সের তোরণগুলো সুলতানী যুগে টিকে থাকা সমাধির তোরণের আদি ও একক উদাহরণ। আদি অবয়ব নিয়ে বিদ্যমান না থাকলেও তোরণগুলো উপস্থিতি সমসাময়িক কালে সমাধির তোরণ নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট সোনা মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

মৌজা - ফিরোজপুর, গ্রাম- শাহপুর, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ছোট সোনা মসজিদটি সুলতানী বাংলার অন্যতম রাজধানী গৌড় নগরীর সর্ব দক্ষিণ সীমায় নির্মিত হয়েছে। মসজিদ হতে মাত্র অর্ধ কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে মুঘল যুগে নির্মিত নিয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ, সমাধি এবং তাহ্খানা রয়েছে। ভারতীয় সীমান্তে ছোট সোনা মসজিদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ইমারত হলো ৩ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত কোতোয়ালী দরওয়াজা।

ক্রেইটন সর্ব প্রথম মসজিদটি আবিষ্কার করেন এবং এর নামকরণের কারণ স্বরূপ মসজিদটির গিল্টি কাজের উল্লেখ করেন এবং কানিংহামও মসজিদটি পরিদর্শনের সময় গিল্টির কিছু অংশ সংগ্রহ করেন।[১২৪] গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ থেকে আলাদা করার জন্যও এটি ছোট সোনা মসজিদ নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

এই মসজিদের সম্মুখে রয়েছে একটি অনিন্দ্য সুন্দর আনুষ্ঠানিক প্রবেশ তোরণ (চিত্র-১৮)। পূর্বে মসজিদটি প্রাচীরে ঘেরা ছিল[১২৫], এবং প্রাঙ্গনে প্রবেশের জন্য এর পূর্ব বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত হয়েছিল এই প্রবেশ তোরণ। কিন্তু প্রাচীরটি বর্তমানে টিকে না থাকায় এটি একটি একক ইমারত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

---

১২৪. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv, p.73. এর অন্য নাম খাওয়াজা-কি-মসজিদ। Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p.79.

১২৫. A.B.M.Hussain,*Gaur- Laknawti*, (edt), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997, P- 89.

Dhaka University Institutional Repository

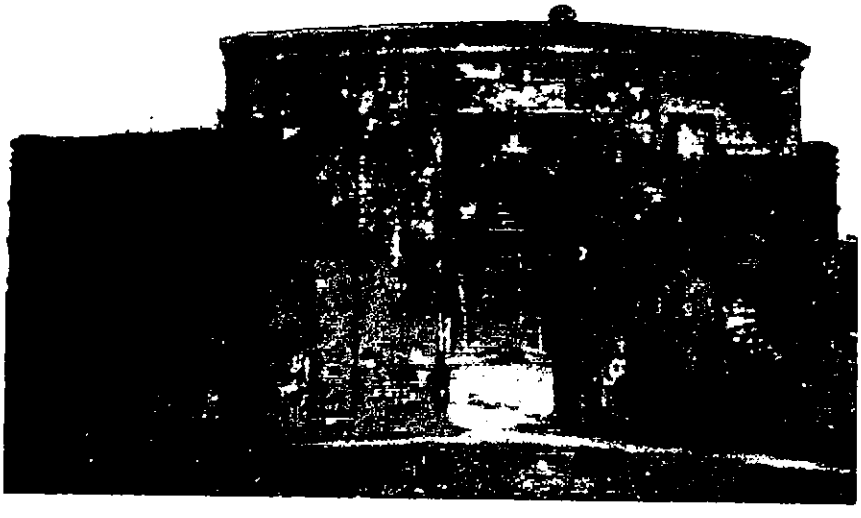

চিত্র-১৮ঃ তোরণসহ ছোট সোনা মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কালঃ

তোরণটিতে শিলালিপি নেই। তবে নির্মাণ উপাদান ও কৌশল এবং স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ একে মসজিদের সমসাময়িক নির্মাণ হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এক্ষেত্রে মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের উপরে যে শিলালিপিটি আজও বিদ্যমান তা থেকে তোরণের নির্মাণকাল অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী মসজিদটি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) মজলিস-ই-মজলিস মজলিস মনসুর ওয়ালী মুহাম্মদ-বিন-আলী নির্মাণ করেন।[১২৬] শিলালিপির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এর নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। সম্ভবত তোরণটি একই সময়ে নির্মিত হয়েছে।

বর্তমান অবস্থাঃ

আবীদ আলী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ লিপিবদ্ধ করার সময় তোরণটি ভগ্নাবস্থায় দেখতে পান এবং তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, পূর্বে এর গাত্রে পাথরের যে কাজ ছিল বর্তমানে তা টিকে নেই এবং স্থানে স্থানে ইট বের হয়ে গেছে।[১২৭] ১৯০২-০৩ খ্রিঃ থেকে মসজিদে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কার্য পরিচালনা করা হলেও তোরণটির সর্ব প্রথম সংস্কার সাধন করা হয় ১৯৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। এই সংস্কার কার্য বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে সম্পন্ন হয়েছিল।[১২৮] এ সময় জঙ্গল পরিষ্কার করে খসে পড়া পাথরগুলো পুনরুদ্ধার করা হয়। তবে বেশীর ভাগ পাথরই ততদিনে হারিয়ে গিয়েছিল। পাথরের এই অভাব মেটাতে বিকল্প হিসেবে সিমেন্ট ও কংক্রিটের শ্লেব তৈরী করে তার উপর পাথরের রং করে তা তোরণের গাত্রে লাগানো হয়েছে। এর পরবর্তী সংস্কার

---

১২৬. A karim,(*Corpus)*, p.314–316. P-136 Z.A.Dassai নামটি শুধু মুহাম্মদ বিন আলী পাঠ করেন-some Aspect of the Study of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal in *Journal of Varendra Research Museum*, Vol-7, 1991-92,

১২৭. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 83 .

১২৮. ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে এই সংস্কার কার্য পরিচালিত হয় (edt.) A. B. Hussian, (*Gawr-Lakhnawi0i), Ibid,* p.162.

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালিত হয় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়ার যাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আঞ্চলিক ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে, কিন্তু এই সংস্কারের পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে তারা কোন তথ্যাদি সংগ্রহ করেন নাই।[১২৯] বর্তমানে ইমারতটির বিভিন্ন জায়গায় তোরণটি পরিকল্পনার দিক কংক্রিট বেড়িয়ে পড়েছে। এ সত্ত্বেও ছোট সোনা মসজিদের তোরণটি পরিকল্পনার দিক থেকে তার আদিরূপ নিয়ে একটি সুন্দর ইমারত হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে রয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

তোরণটি মসজিদের সম্মুখ ফাসাদ হতে ১৮.৮৫ মিটার পূর্বে কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের সমান্তরালে নির্মিত হয়েছে। এটি সামগ্রিক পরিকল্পনায় একটি আয়তাকার ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-৬)। এর বাইরের দিক উত্তর-দক্ষিণে ৭.৯৫ মিটার বিস্তৃত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৩৫ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের অঙ্গনে প্রবেশের জন্য এর কেন্দ্রে রয়েছে খিলান পথ, যা সম্পূর্ণ স্থাপনাটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে (চিত্র-১৯)। প্রবেশ পথটি পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি কৌণিক খাঁজ খিলানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো মসজিদের প্রবেশ খিলানের অনুরূপ। পূর্ব খিলানের প্রস্তরটি একক। ফাসাদ হতে ৭ সেঃ মিঃ বহির্গত খিলানের এই খাঁজ কাটা অংশটি প্লাষ্টারবিহীন এবং আদি অবস্থায় বিদ্যমান। এটি ফাসাদে প্রবিষ্ট একটি আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে নির্মিত। খিলানের স্প্যান্ড্রিলের উপরিভাগে ১০ সেঃ মিঃ উদ্‌গত মোল্ডিং নক্‌শা রয়েছে। সংস্কারের ফলে তোরণ-ফাসাদের পূর্ববর্তী অনেক বৈশিষ্ট্যই বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষ করে গাত্রালংকারের তেমন কিছুই টিকে নেই। খিলান ফ্রেমের উভয় পাশে দুটি প্যানেল এর উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে। এ ধরনের লম্বা (৩.৮২ মিঃ) প্রবিষ্ট প্যানেল এই মসজিদের

---

১২৯. Abu Sayed Mostaque Ahmed, *Choto Sona Mosque in Gaur : An Early Example of Islamic Architecture of Bengal,* Institute Fur Baugeschichte, Der Universitat, 1997, p. 29.

ভূমি পরিকল্পনা-৬ঃ ছোট সোনা মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

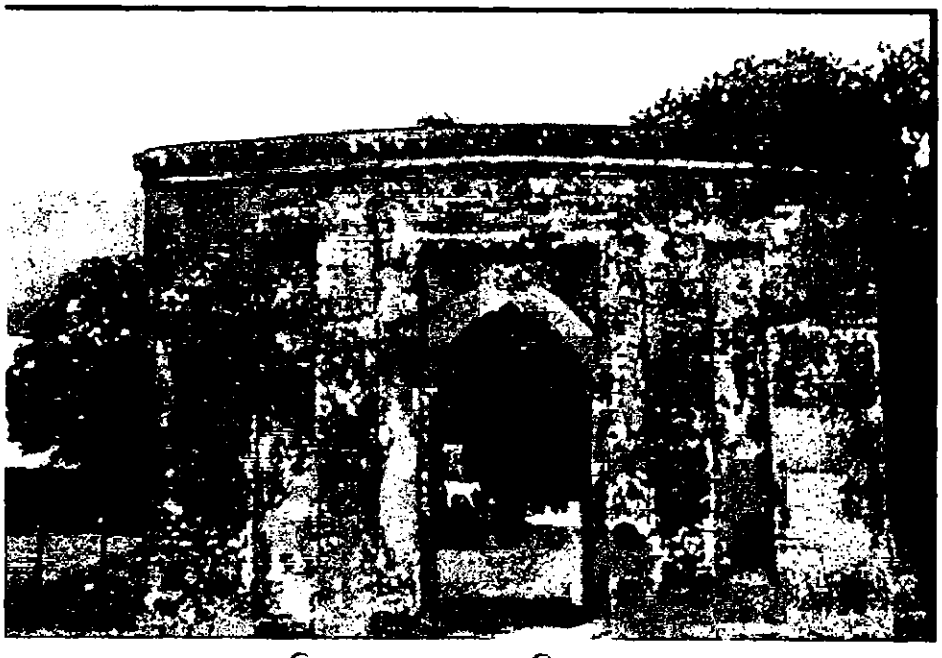

চিত্র ১৯ঃ তোরণের পশ্চিম ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

কোন অংশে এমনকি বাংলার অন্য কোন তোরণ স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায় না। এই প্যানেলগুলো সম্ভবত অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল।

তোরণের কার্নিশ মসজিদের কার্নিশের ন্যায় বাঁকানো। এর ডান এবং বাম দিকের কোণা ভূমি হতে ৫.১২ মিটার উঁচু। কেন্দ্রে কার্নিশের উচ্চতা ৫.৩৩ মিটার। এখানে যে মোল্ডিং নক্শা রয়েছে তা আদি অবস্থায় বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে পাথরের খোদাই নক্শার বেন্ড রয়েছে। মোল্ডিংগুলো ফাসাদ হতে ১৪ সেঃ মিঃ উদ্গত। তোরণের আচ্ছাদনে যে ছাদ নির্মিত হয়েছে তা সমতল হলেও কার্নিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বেঁকে গেছে।

তোরণের মধ্যবর্তী খিলান পথটি একটি টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত যার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ১.৪৭ মিটার এবং প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ২.১৭ মিটার। এর নিম্ন ভাগে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে কুলঙ্গী রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যবর্তী কুলঙ্গীটি বৃহৎ এবং গভীর (চিত্র-২০)। এগুলো দেয়ালের ঠিক মাঝে না হয়ে কিছুটা পশ্চিম দিকে নির্মিত হয়েছে। দেয়ালের এই অংশের উভয় দিকে বর্গাকার দুটি ছিদ্র রয়েছে। উভয় ছিদ্রই সমান্তরালে এবং ভূমি হতে ১.১১ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এগুলোর আকৃতি এবং অবস্থান দেখে অনুমিত হয়, ছিদ্রগুলো দরজার খিল লাগানোর জন্য ব্যবহৃত কাঠের বাট আটকানোর স্থান। তবে উত্তর দেয়ালের ছিদ্রটি অপেক্ষাকৃত গভীর এরং দেয়ালের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য জুড়ে বর্তমান। এতে মনে হয়, দরজাটি যখন খোলা থাকতো তখন কাঠের বাটটি এই ছিদ্রতে ঢুকিয়ে রাখা হতো।[১৩০] আদি অবস্থায় ছিদ্রটি সম্ভবত বাইরের দিক থেকে বন্ধ করা ছিল, কিন্তু দেয়ালের পাথর খসে যাওয়ার ফলে পরবর্তীতে এটি বেড়িয়ে যায় এবং সংস্কারের সময় ভুলক্রমে তা বাইরের ফাসাদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পূর্ব খিলানের উত্থানরেখা বরাবর ভেতরের দেয়ালে উত্তর ও দক্ষিণে দুটি ছিদ্র বিশিষ্ট

---

১৩০. Abu Sayeed Mostaque Ahmed, *Choto Sona Mosque in Gaur : An Early Example of Islamic Architecture of Bengal,* Institute Fur Baugeschichte, Der Universitat, 1997, p. 30.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২০ঃ অভ্যন্তরের বৃহৎ কুলঙ্গী

Dhaka University Institutional Repository

পাথর দেয়ালে প্রবিষ্ট। এগুলোতে সম্ভবত দরজার পাল্লা লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে খিলানপথটি উন্মুক্ত।

প্রবেশ পথের অভ্যন্তর দেয়ালের বৃহৎ কুলঙ্গী ১.৭ মিটার প্রশস্ত এবং ২.২৫ মিটার গভীর। ভূমি হতে ১৬ সেঃ মিঃ উঁচু ভিতের উপর এগুলো অবস্থিত এবং দীর্ঘ টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কুলঙ্গীগুলো কি কাজে ব্যবহৃত হতো তা এখনও পরিষ্কার নয়। প্রচলিত ধারণানুযায়ী, প্রবেশ তোরণে সাধারণত প্রহরী কক্ষ থাকে। কিন্তু এগুলো উচ্চতার দিক থেকে একজন মানুষের সাধারণ উচ্চতা থেকেও কম বিধায় প্রহরী কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা কঠিন। তাছাড়া সুলতানী যুগে নির্মিত জামী মসজিদগুলোর তোরণের উভয়পাশে নিচু দেয়াল তৈরীর যে রীতি লক্ষ্য করা যায়, তাতে তোরণে প্রহরীকক্ষ নির্মাণ প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কুলঙ্গীগুলো গভীরতার ক্ষেত্রে অবশ্য একজন ব্যক্তির বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত। মোশতাক আহমেদের মতে, এটি সম্ভবত মসজিদের রক্ষণা-বেক্ষণকারী কিংবা মুয়াজ্জিনের বিশ্রামের স্থান ছিল।[১৩১]

বৃহৎ কুলঙ্গীর বামে রয়েছে অপর একটি ক্ষুদ্র কুলঙ্গী। এটি সম্ভবত বাতি রাখার স্থান ছিল। একই রকম নির্মাণ উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দেয়ালেই আদি অবস্থায় বিদ্যমান।[১৩২] এগুলো পাথর কেটে তৈরী এবং ক্ষুদ্র টানেল ভল্ট দ্বারা আবৃত। তোরণটির পশ্চিম খিলান পাড় হয়ে মসজিদের অঙ্গনে পৌছানো যায়। অঙ্গন হতে তোরণের যে পশ্চিম ফাসাদ দৃশ্যমান তা পূর্ব ফাসাদের অনুরূপ। তবে এ অংশেও কিছু আদি বৈশিষ্ট্য টিকে আছে। এর মধ্যে খিলানটি যে আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে রয়েছে তার ভিতে একটি প্লাষ্টারবিহীন অলংকৃত পাথর আদি অবস্থায় বিদ্যমান।

---

১৩১. Abu Sayeed Mostaque Ahmed, *Choto Sona Mosque in Gaur : An Early Example of Islamic Architecture of Bengal,* Institute Fur Baugeschichte, Der Universitat, 1997, p. 31.

১৩২. আবু মোশতাক আহমেদের মতে শুধুমাত্র উত্তর দেয়ালেই এরূপ বাতি রাখার কুলুঙ্গি রয়েছে। Sayeed Mostaque ahmed, *Ibid*, p. 31.

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া খাঁজ খিলান নির্মাণে যে একক পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তাও আদি রূপে টিকে আছে।

তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদ সংস্কারকৃত এবং এগুলোতে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তবে কার্নিশে অন্যান্য অংশের ন্যায় মোল্ডিং নক্শার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

অলংকরণঃ

ছোট সোনা মসজিদটি পাথর খোদাই অলংকরণের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তোরণটিতে তেমন কোন জাঁকালো অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় না। টিকে থাকা অলংকরণের মধ্যে খিলান প্রস্তরে খোদাই করা সর্পিল লতা-পাতার নক্শা এবং স্প্যান্ড্রিলে উদ্গত গোলাপ নক্শা রয়েছে। স্প্যান্ড্রিলের উপরিভাগে পাড় খোদাই অলংকরণ সম্বলিত মোল্ডিং নক্শাও রয়েছে। কার্নিশের মোল্ডিং এ খোদাইকৃত জ্যামিতিক নক্শা এবং মোল্ডিংগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে এবং নীচে বিভিন্ন মটিফ বিশিষ্ট অলংকরণের বেন্ড রয়েছে। কার্নিশের নীচে সারিবদ্ধভাবে পর পর পাঁচটি উদ্গত গোলাপ নক্শা সাজানো হয়েছে। তবে তোরণটি যে মসজিদের ন্যায় প্রচুর অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল তার বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পশ্চিম ফাসাদে খিলানের ফ্রেমের নিম্নভাগে যে আদি প্লাষ্টারবিহীন পাথরে খোদাই নক্শা রয়েছে তা মসজিদের পার্শ্ববর্তী প্রবেশ দ্বারের অলংকরণের অনুরূপ। ফলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তোরণের এ অংশটিতে মসজিদের প্রবেশ দ্বারের ন্যায় সম্পূর্ণ ফ্রেম জুড়ে অলংকরণ ছিল। তাছাড়া এর ফাসাদে যে লম্বা সরু প্রবিষ্ট প্যানেল রয়েছে তাতে পূর্বে সম্ভবত অলংকৃত প্যানেল বসানো ছিল। মোশতাক আহমেদ অনুমান করেন, এ অংশে দুটো অলংকৃত প্যানেল একটি অপরটির উপরে নির্মিত হয়েছিল।[১৩৩] এ ক্ষেত্রে প্যানেলগুলো যদি মসজিদের

---

১৩৩. Abu Sayeed Mostaque Ahmed, *Choto Sona Mosque in Gaur : An Early Example of Islamic Architecture of Bengal,* Institute Fur Baugeschichte, Der Universitat, 1997, p. 31.

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের অলংকৃত ফ্রেমের সমান (প্রতিটি ১.২৫ মিঃ দীর্ঘ এবং ৬২ সেঃ মিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট) হয় তাহলে কুলঙ্গীটি (৩.৮২ মিঃ উচ্চতা বিশিষ্ট) পূর্ণ করার জন্য অন্তত তিনটি প্যানেলের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া প্রশস্ততার দিক থেকে কুলঙ্গীর মাপের সাথে মসজিদের প্যানেলের মাপ মিলে যায়। ফলে উক্ত কুলঙ্গীতে দুটির পরিবর্তে তিনটি প্যানেল থাকার সম্ভাবনা অধিক। আর এ সকল দিক বিবেচনা করলে তোরণটিও যে এক সময় মসজিদের ন্যায় জমকালো ও দৃষ্টি নন্দন ইমারত ছিল তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নির্মাণ উপাদানঃ

হুসেন শাহী যুগে বহুল ব্যবহৃত ইট এবং পাথরের সমন্বয়ে তোরণটি নির্মিত। এরূপ নির্মাণ লক্ষ্য করা যায় গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ (১৫২৫খ্রিঃ) ও পান্ডুয়ায় অবস্থিত কুতুবশাহী মসজিদের তোরণে (১৫৮৫ খ্রিঃ)।[১৩৪]

সাধারণ আলোচনাঃ

সুলতানী যুগে বাংলায় নির্মিত যে কয়েকটি তোরণ টিকে আছে, ছোট সোনা মসজিদের তোরণটি এগুলোর মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। বড় সোনা মসজিদ ও কুতুব শাহী মসজিদে পাথরের আচ্ছাদন ব্যবহৃত হলেও কোনটাই এরূপ অলংকরণ সমৃদ্ধ ছিল না। যদিও বর্তমানে এর গাত্রের পাথরের শ্লেব এবং জমকালো অলংকরণ নেই, এর নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের সমন্বয় সাধন মসজিদের সাথে বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণগত সাদৃশ্য একে সংলগ্ন মসজিদের ন্যায় অনন্য দৃষ্টান্তে পরিনত করেছে।

---

১৩৪. পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গোমতি দরওয়াজা

অবস্থানঃ

গ্রাম: কনকপুর, পো: পিয়েস বাড়ি, থানা: ইংলিশ বাজার, জেলা: মালদহ।

গোমতি দরওয়াজাটি গৌড় দুর্গের পূর্ব তোরণ হিসেবে পরিচিত। এটি কোতোয়ালি দরওয়াজা হতে প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তরে, লোকচুরি দরওয়াজা ও কদম রসুল ইমারতের দক্ষিণে অবস্থিত। এর বরাবর ঠিক পশ্চিম দিকেই রয়েছে চিকা ইমারত। তোরণটির উভয়দিকে দুর্গ দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। পার্শ্ববর্তী লুকোচুরি দরওয়াজা নির্মাণের পূর্বে সম্ভবত এটিই রাজকীয় দুর্গের পূর্ব তোরণ ছিল। ক্ষুদ্রাকার অবয়ব ও জমকালো অলংকরণের জন্য একে রাজকীয় দুর্গের ব্যক্তিগত তোরণ বলেও অভিহিত করা হয় (চিত্র -২১)।

নির্মাণকালঃ

তোরণগাত্রে কোন শিলালিপি নেই বিধায় এর সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, এটি হুসেন শাহী শাসনামলে নির্মিত হয়েছে। তবে গৌড় ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপির বিশ্লেষণ এবং গোমতি দরওয়াজার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণের ভিত্তিতে স্থাপত্য ঐতিহাসিকগণ এর নির্মাণকাল নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন। গৌড়ে অবস্থিত লটন মসজিদের স্থাপত্য শৈলী এবং অলংকরণে প্রচুর চকচকে টালির ব্যবহার দেখে তোরণটি হুসেন শাহী শাসনামলের নির্মাণ বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন। হেনরী ক্রেইটন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের চিত্র প্রকাশকালে গোমতি দরওয়াজাটি ৯০৯ হিজরী/ ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২১ঃ গোমতি দরওয়াজা

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।[১৩৫] ফ্রেঙ্কলিনের (Francklin) মতে, কদম রসুল ইমারতের তোরণের শিলালিপিটি মূলত গোমতি দরওয়াজার, যেখানে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ কতৃক একটি তোরণ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। কারণ কদম রসুল ইমারতটি সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহ্ ৯৩৭ হিজরী/১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন,[১৩৬] সেক্ষেত্রে উক্ত ইমারতের তোরণ তাঁর পিতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কর্তৃক নির্মাণ সম্ভব নয়। কিন্তু শিলালিপিটি যে গোমতি দরওয়াজার এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। হুসেন শাহের শাসনামলে তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত অপর একটি শিলালিপি গৌড়ের (ফিরোজপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ) শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর খানকাহে পাওয়া গেছে।[১৩৭] উক্ত শিলালিপিতে ৯১৮ হিজরী/১৫১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'দুর্গেরতোরণ' (বাব আল-হাসান) নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। কানিংহাম, আবিদ আলী খান প্রমূখ একে গোমতি দরওয়াজার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৩৮] কিন্তু তাদের মতের স্বপক্ষেও কোন প্রমাণ দেননি। তবে এ এইচ দানী এই তোরণে ব্যবহৃত টালির নান্দনিক সৌন্দর্যের সাথে দাখিল দরওয়াজার বৃহৎ ও দৃঢ় অবয়ব এবং অলংকরণের সমুদ্র সমান বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করে একে হুসেন শাহের নির্মাণ বলে অভিহিত করেন।[১৩৯] এর নির্মাণশৈলী ও অলংকরণ নিকটবর্তী লটন মসজিদের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, উভয় ইমারত সমসাময়িক কালে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু লটন মসজিদেরও শিলালিপি না থাকায় এগুলোর সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না।

---

১৩৫. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994 (reprint), vol. xv, p, 56.
১৩৬. A. Karim, *Corpus,* p, 355.
১৩৭. A. Karim, *Corpus,* p, 298.
১৩৮. Cunninghum, *Ibid,* p, 52. A.A.Khan, *Ibid,* p, 67.
১৩৯. A.H.Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p, 119.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থাঃ

গোমতি দরওয়াজার পরিকল্পনা ও স্থাপত্যশৈলীর কোন পরিবর্তন সাধিত না হলেও এর কোণা বুরুজগুলোর কোনটাই পূর্ণ অবয়ব নিয়ে টিকে নেই। ফাসাদের প্যানেলের টাইল অলংকরণ ও টেরাকোটা নক্শারও বেশিরভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তোরণটিকে যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছিল। এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ইমারতের পাথর খোদাই অলংকরণ সম্বলিত বীম, টেরাকোটার প্ল্যাক (Plaque) ছাড়াও গোমতি দরওয়াজার বহির্ফাসাদ থেকে খসে পরা টাইল এবং ৯২৬ হিজরী/ ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে নসরত শাহ্ কর্তৃক তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত একটি শিলালিপিও সংরক্ষিত আছে। তবে বর্তমানে যাদুঘরটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

প্রাক-মুঘল যুগে গৌড়ে নির্মিত কোতোয়ালী দরওয়াজা, দাখিল দরওয়াজার বিরাটত্বের পরিবর্তে গোমতি দরওয়াজাটি ক্ষুদ্র, বর্গাকার একগম্বুজ বিশিষ্ট কাঠামো নিয়ে গঠিত হয়েছে (ভূমি পরিকল্পনা-৭)। এর চারকোণে রয়েছে চারটি কোণা বুরুজ। বাইরের দিকে তোরণের আয়তন ১৩.০২ বর্গমিটার। এর দেয়াল ২.৬৪ মিটার ঘনত্ব বিশিষ্ট। এর চার বাহুতে চারটি খিলান পথ রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি ১.৫২ মিটার চওড়া। খিলানগুলো দিল্লীর আলাই দরওয়াজার ন্যায় বর্শা ফলক (spear head) দ্বারা সজ্জিত। আয়তাকৃতির প্যানেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ খিলানগুলো অবস্থিত। এর উপরিভাগে রয়েছে ক্ষুদ্র কুলঙ্গীর সারি। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম খিলান পথের উভয় দিকে গোলাকার সংযুক্ত বুরুজ রয়েছে। এগুলো ১২ (বার) খাঁজবিশিষ্ট এবং মোল্ডিং নক্শা দ্বারা তিনটি স্তরে বিভক্ত (চিত্র-২২)। এরূপ খাঁজবিশিষ্ট বুরুজ পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদের (নির্মাণ:১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) কোণায় লক্ষ্য করা গেলেও এর টাইল অলংকরণ নিকটবর্তী লটন মসজিদের সাথে মিলে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদে সংযুক্ত বুরুজ নেই। এগুলোর স্থলে আয়তাকার উদ্গত ও প্রবিষ্ট প্যানেল রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

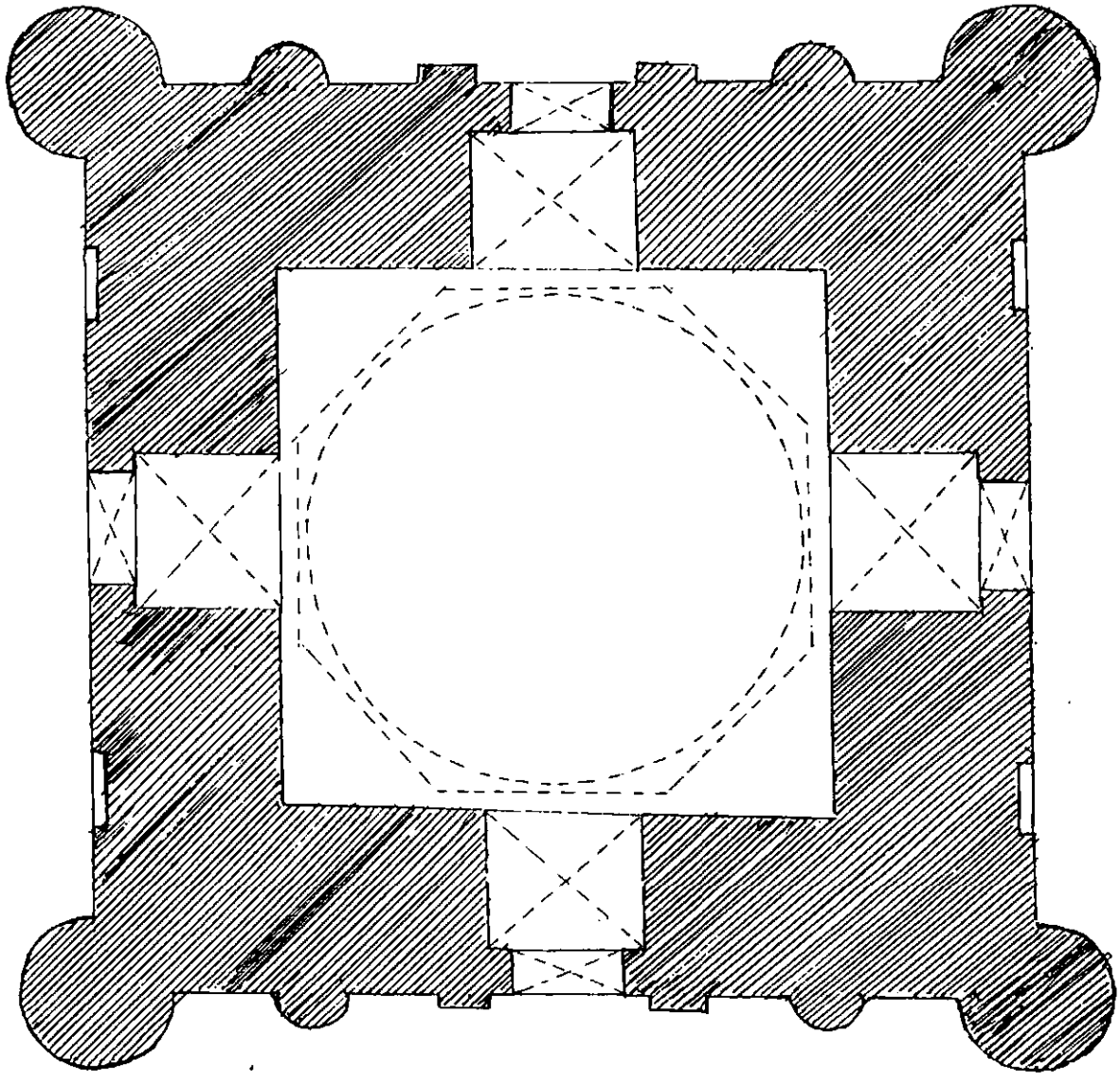

ভূমি পরিকল্পনা-৭ঃ গোমতি দরওয়াজা

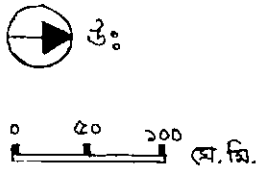

Dhaka University Institutional Repository

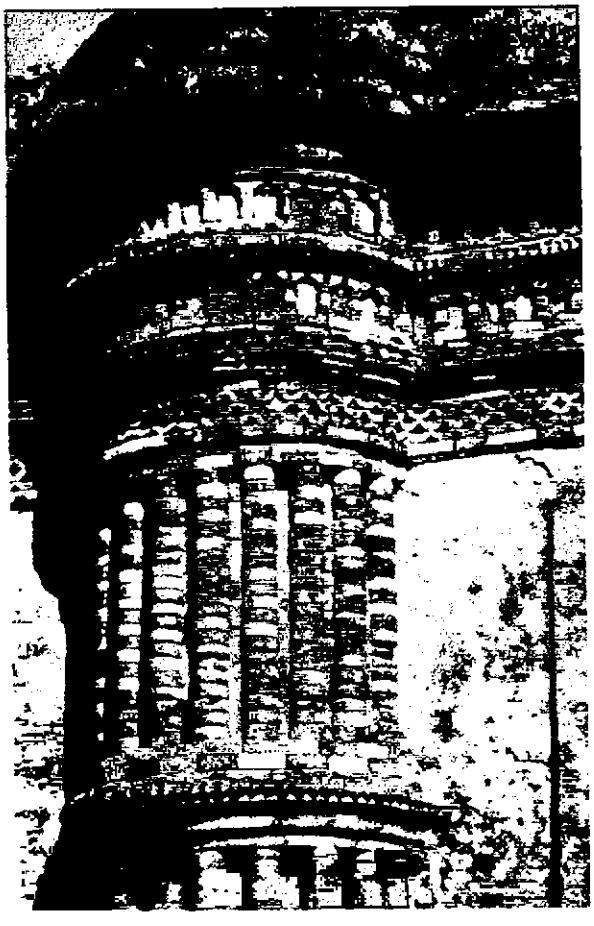

চিত্র-২২ঃ কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী বুরুজ

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের চারকোণে রয়েছে চারটি বুরুজ। ভিতে এগুলো ৫.১৫ মিটার ডায়ামিটার। প্রাথমিক অবস্থায় কোণা বুরুজগুলো সম্ভবত তোরণের কার্নিশ পর্যন্ত উত্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১.৬৮ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত টিকে আছে। ফলে এর উপরিভাগও প্রবেশ খিলানের পার্শ্ববর্তী বুরুজের ন্যায় খাঁজযুক্ত ছিল কিনা তা বলা যায় না। তবে লোটন মসজিদের কোণা বুরুজের ভিতের সাথে প্রবেশ খিলানের পার্শ্ববর্তী বুরুজের মিল থাকায় অনুমান করা যায়, লটন মসজিদের কোণা বুরুজের ন্যায় এখানেও খাঁজকৃত বুরুজ ছিল।

তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য খিলান ছাদে আবৃত চারটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এর আচ্ছাদনের জন্য যে গম্বুজ রযেছে তা নির্মাণে বাংলা পান্দানতিফের পরিবর্তে স্কুইঞ্চের ব্যবহার করা হয়েছে। সুলতানী যুগে নির্মিত তোরণ স্থাপত্যে এরূপ স্কুইঞ্চের ব্যবহার দ্বিতীয়টি লক্ষ্য করা যায় না।

অলংকরণঃ

গোমতি দরওয়াজার অলংকরণে চকচকে টালি এবং টেরাকোটা নক্শার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সমগ্র ইমারতটি আদিতে সম্ভবত টাইল অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল যার বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে যেটুকু টিকে আছে তা থেকে এর আলংকারিক জমকালোতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর কোণা বুরুজ, কার্নিশ এবং দেয়ালে অলংকৃত প্যানেলগুলো নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা রংয়ের টাইলে সজ্জিত করা হয়েছে (চিত্র-২৩)। তাছাড়া অভ্যন্তরভাগে ফুল, লতা-পাতার মটিফ সম্বলিত টাইলগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে টেরাকোটার মটিফই প্রাধান্য পেয়েছে। প্যানেলগুলোতে আবার টেরাকোটা ও টালি অলংকরণের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সংযুক্ত বুরুজগুলোতে এখনও বিভিন্ন রংয়ের টালি অলংকরণ টিকে আছে। একই সজ্জিতকরণ প্রক্রিয়া গৌড়ের লটন মসজিদের কোণা বুরুজ ও ফাসাদের সংযুক্ত বুরুজে দেখা যায়। মূলতঃ আলংকারিক সৌন্দর্যের জন্য এই তোরণটি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৩ঃ চকচকে টাইল অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ আলোচনাঃ

বাংলার মধ্যযুগীয় তোরণ স্থাপত্যের ইতিহাসে গোমতি দরওয়াজাকে এর পরিকল্পনা ও অলংকরণের জন্য একক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কেননা এরূপ এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার পরিকল্পনায় তোরণ ইতিপূর্বে নির্মিত হলেও টাইল অলকরণের সজ্জায় অুলনীয় রূপ লাভ করেছে। এরূপ টাইলের ব্যবহার হুসেন শাহী আমলেই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঘা মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

জেলা: রাজশাহী, থানা: বাঘা, মৌজা: বাঘা থানা সদর।

বাঘা মসজিদটি রাজশাহী বিভাগীয় সদর হতে প্রায় ৪৭ কি:মি: দক্ষিণ-পূর্বে এবং বাঘা বাসষ্ট্যান্ড হতে প্রায় ১ কি:মি: দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বিরাটাকার দিঘির পশ্চিম তীরে অবস্থিত। প্রায় ৪৮.০৩ মিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার উঁচু প্রাচীর ঘেরা ভূমির পশ্চিম বাহুতে মসজিদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রে দুটি প্রবেশ তোরণ নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে উত্তর দিকের তোরণটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তদ্স্থলে নতুন তোরণ নির্মিত হয়েছে। তবে দক্ষিণ দিকের অনিন্দ্য সুন্দর প্রবেশ তোরণটি বাংলার হুসেনশাহী স্থাপত্যের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে এখনও টিকে আছে (চিত্র-২৪)।

নির্মাণ কালঃ

বাঘা অঞ্চলটি বিখ্যাত সুফী শাহ্ দৌলা ও তার উত্তরসূরীদের স্মৃতি বিজড়িত। এই বিখ্যাত সুফীর প্রকৃত নাম ছিল মাওলানা শাহ্ মুয়াজ্জম দানিশমান্দ।[১৪০] তিনি শাহ্ দৌলা হিসেবেই সমাধিক পরিচিত। কথিত আছে, তিনি আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদের বংশধর ছিলেন।[১৪১] সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ)[১৪২] মতান্তরে সুলতান নসরত শাহের শাসনামলে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ)

---

১৪০. A. Karim, *Corpus*, p. 334.

১৪১. A. Karim, *Corpus*, p. 334.

১৪২. আ.ক.ম. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ২৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৪ঃ বাথা মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদ থেকে[১৪৩] বাঘায় এসেছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের নিকটবর্তী মখদুমপুরের প্রভাবশালী জায়গীরদার আলা বখস্ বরখুরদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তখন থেকে তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ এ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। বলা হয়, সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহ্ এই বিখ্যাত সূফীর সম্মানে বাঘা মসজিদটি নির্মাণ করেন। কিন্তু মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে নসরত শাহ্ কর্তৃক ৯৩০ হিঃ/১৫২৩-২৪ এ মসজিদটি নির্মাণের উল্লেখ থাকলেও বিখ্যাত সূফী অথবা তার কোন উত্তরসূরীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এ অঞ্চলটি যে তৎকালীন সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল তা এই জামী মসজিদের নির্মাণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।[১৪৪]

মসজিদটিতে দুটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়, যার একটিতে মসজিদ এবং অপরটিতে একটি তোরণ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে।[১৪৫] মসজিদের নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপিটি কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের উপরে এখনও বিদ্যমান। পূর্বে তোরণ সংক্রান্ত শিলালিপিটি এর অভ্যন্তরে পাওয়া গেলেও বর্তমানে কোথায় রয়েছে তা জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তোরণটি একই বৎসর নির্মিত হয়েছিল।[১৪৬] আ. ক. ম. জাকারিয়া বাঘা মসজিদের একটি শিলালিপি করাচি যাদুঘরে রয়েছে বলে জানতে পারেন।[১৪৭] তার জানা মতে, শিলালিপিটি মসজিদের সামনে স্থাপিত ছিল। কিন্তু মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার উপরের শিলালিপিটি পূর্ব হতে এখানেই ছিল বলে বেশীর ভাগ সূত্র হতে জানা যায়। সে ক্ষেত্রে উল্লেখিত শিলালিপিটি হারিয়ে যাওয়া শিলালিপিটি কিনা তাতে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাছাড়া তোরণ সংক্রান্ত যদি কোন শিলালিপির অস্তিত্ব থাকে তাহলে তা কোন দিকের তোরণে ছিল তাও জানা যায় না। বর্তমানে

---

১৪৩. *Bengal District Gazetteer,* 1908, p. 115.

১৪৪ . অইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলটি সরকার বারবাকাদের অধীনে ছিল। ১৬২৪ খ্রিঃ এ শাহ জাহানের আগমনের পূর্বেই এখানে মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। সুত্র- A. Karim, *Corpus* ,p. 333-34.

১৪৫ . মসজিদ সংক্রান্ত শিলালিপিটি এর কেন্দ্রীয় খিলানের উপরে এবং অপরটি মসজিদের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। *Bengal District Gazetteer,* 1908, p.115.

১৪৬ . আ. ক. ম. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ২৯৩।

১৪৭ . *Bengal District Gazetteer*, 1908, p.115.

Dhaka University Institutional Repository

টিকে থাকা দক্ষিণ দিকের তোরণে শিলালিপি স্থাপনের জন্য তেমন কোন প্যানেলের অস্তিত্ব নেই। এরূপ হতে পারে, শিলালিপিটি সম্ভবত উত্তর তোরণের ছিল এবং তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর মসজিদের অভ্যন্তরে রেখে দেয়া হয়েছিল।

বর্তমান অবস্থাঃ

বাঘা মসজিদ কম্পাউন্ডটি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মসজিদ ও এর তোরণটিতে বহুবার সংস্কারের ছাপ রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯১ খ্রিঃ তোরণের কিছু সংস্কার কাজ করা হয়। তবে সংস্কার সত্ত্বেও এটি আদি পরিকল্পনা এবং বাহ্যিক অবয়ব নিয়ে টিকে আছে। তবে ফাসাদের অলংকরণ অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

বাঘা মসজিদের তোরণটি পরিকল্পনার দিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাধারণ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তোরণটির চার কোণে রয়েছে চারটি কোণা বুরুজ এবং আচ্ছাদনে ব্যবহৃত হয়েছে একটি অর্ধ-গম্বুজ (ভূমি পরিকল্পনা-৮)। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ৬.৬০ মিটার দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ২.৩৪ মিটার প্রশস্ত। কোণা বুরুজসহ এর সামগ্রিক পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ৭ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২.৭৫ মিটার। কোণা বুরুজগুলোর পরিমাপ ১.৪২ মিটার ডায়ামিটার। এর মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদে দুটি খিলান নির্মিত হয়েছে যা তোরণটিকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করেছে। খিলানগুলো কৌণিক দ্বিকেন্দ্রিক। বাইরে থেকে পৌছানোর জন্য এখানে তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি রয়েছে। তবে এগুলো পরবর্তীকালে নির্মিত।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের বিস্তৃতি পূর্ব-পশ্চিমে ১.৭৫ মিটার এবং পার্শ্ববর্তী অংশ দুটোর প্রত্যেকটির বিস্তৃতি ২.৪৩ মিটার। এর উভয় পাশের ফাসাদে দুটি আয়তাকার

Dhaka University Institutional Repository

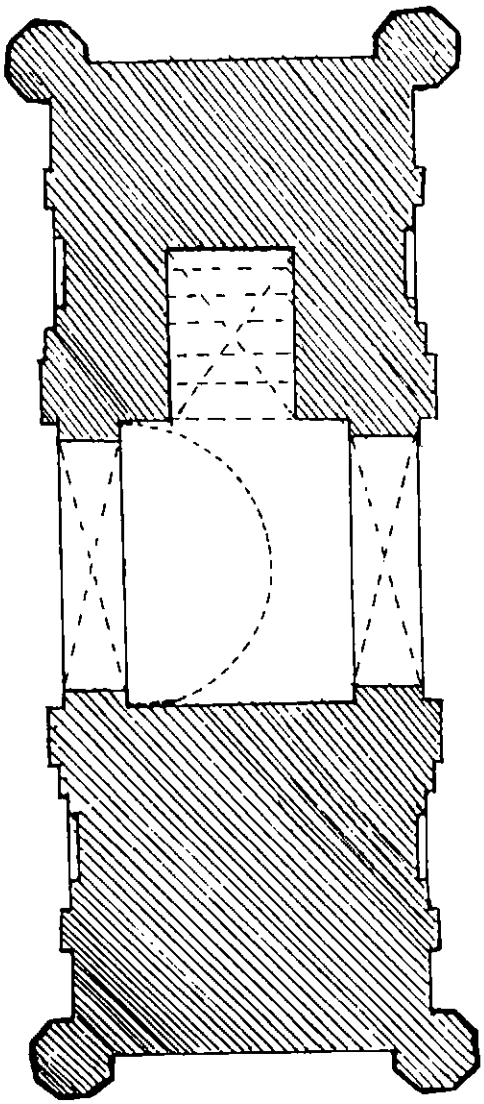

ভূমি পরিকল্পনা-৮ঃ বাঘা মসজিদের উত্তর তোরণ

উঃ

0 ৫০ ১০০ সে.মি.

Dhaka University Institutional Repository

প্যানেল একটির উপরে অপরটি সংস্থাপিত হয়ে তোরণের কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। এগুলো এক সময় টেরাকোটা অলংকরণে পূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে বেশীরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। এর বুরুজগুলো মোট চারটি মোল্ডিং নক্শা দ্বারা পাঁচটি স্তরে বিভক্ত এবং সর্বোচ্চে মসজিদের বুরুজের আচ্ছাদনের ন্যায় অনেকটা কলসাকৃতির ক্ষুদ্র গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। এগুলো কার্নিশ হতে ৬০ সে.মি. উপরে উঠে গেছে। সুলতানী বাংলার স্থাপত্যে এ ধরণের ক্ষুদ্র গম্বুজ আচ্ছাদিত বুরুজ সর্ব প্রথম বাগেরহাটে অবস্থিত খান জাহানের সমাধির কোণা বুরুজে দেখা যায়। হুসেন শাহী শাসনামলে এই বৈশিষ্ট্যটি বহু ইমারতে গৃহীত এয়ছে। উদাহরণস্বরূপ দিনাজপুরের হেমতাবাদ মসজিদ (নির্মাণ-১৫০১ খ্রিঃ) গৌড়ের কদমরসুল ইমারতের (নির্মাণ-১৫৩০ খ্রিঃ) কোণা বুরুজের ক্ষুদ্র গম্বুজের উল্লেখ করা যায়। তবে কদমরসুল ইমারতের গম্বুজটি কার্নিশ থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক উপরে উঠে গেছে। পরবর্তীকালে মুঘল শাসনের প্রথম দিকে নির্মিত কুতুবশাহী মসজিদ (১৫৮২) পুরাতন মালদহের জামী মসজিদের তোরণে (নিঃ ১৫৯৬ খ্রিঃ) এরূপ ক্ষুদ্র গম্বুজ বিশিষ্ট কোণা বুরুজের ব্যবহার দেখা যায়। তোরণের কার্নিশ মসজিদের কার্নিশের ন্যায় বাঁকানো নয়। এতে সংস্কারের ছাপ বিদ্যমান। কেননা, এখানে ইট সামনের দিকে বের করে কার্নিশের রূপ দেয়া হয়েছে। এ ধরণের বৈশিষ্ট্য সুলতানী আমলের বাংলা স্থাপত্যে কোথাও দেখা যায় না। অনুমান করা যায়, কার্নিশটি মসজিদের কার্নিশের ন্যায় সামান্য বাঁকানো ছিল এবং এতে উদ্গত মোল্ডিং নক্শা ছিল, যা সমসাময়িক বাংলা স্থাপত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে সম্ভবত এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে পুনর্নির্মাণের সময় ভুলবশতঃ বর্তমান অবয়ব দেয়া হয়েছে। তোরণটির আচ্ছাদনে একটি ক্ষুদ্রাকার অর্ধ-গম্বুজ কেন্দ্রীয় খিলান পথের উপরে নির্মিত হয়েছে এবং অন্যান্য স্থানে রয়েছে সমতল ছাদ। বাইরে থেকে গম্বুজটিকে একটি গম্বুজের অর্ধাংশ মনে হলেও অঙ্গন থেকে একটি পূর্ণ গম্বুজের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। তোরণের কেন্দ্রীয় খিলানের অভ্যন্তর ভাগে উপরের দিকে অর্ধ-গম্বুজটি ধরে রাখার জন্য অবস্থান্তর প্রক্রিয়ায় সুলতানী আমলে বাংলা স্থাপত্যের অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য কর্বেল প্যান্দানটিফের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। গম্বুজটি অর্ধ অবয়বে নির্মিত হওয়ায় এখানে চারটির পরিবর্তে দুটি প্যাণ্ডানটিফ রয়েছে। এগুলো শুধু উত্তর দেয়ালে নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ দেয়ালের এ অংশটি সমতল। গম্বুজের এরূপ নির্মাণ ইতিপুর্বে লক্ষ্য করা যায় না। তবে এটিকে সংস্কারের ফল বলা যাবে না। কেননা, এর আয়তাকার নিম্নভাগ একে আদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তীকালে সুলতানী যুগে নির্মিত কোন স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় না। ফলে এটিকে সুলতানী যুগে নির্মিত অর্ধ-গম্বুজের একক নিদর্শন বলা যায়। মুঘল যুগে নির্মিত পুরাতন মালদহের মসজিদের তোরণে যে পার্শ্ব কুলঙ্গীর আচ্ছাদন রয়েছে তাতে এই বৈশিষ্ট্যটি গৃহীত হয়েছে।

তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশ খিলানের উৎক্ষেপণ স্থলের কিঞ্চিত উপরের দিকে ছিদ্র বিশিষ্ট পাথরের লুব রয়েছে। এগুলো অনেকটা তিনকোণা আকৃতির। তাছাড়া দক্ষিণ খিলানের নিকটবর্তী স্থানে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দুটি বর্গাকার ছিদ্র বিশিষ্ট পাথর দেয়ালে প্রবিষ্ঠ। এগুলোকে তোরণের খিলানপথ আটকানোর পাল্লার সঙ্গে সম্পৃক্ত উপাদান হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

তোরণের অভ্যন্তর ভাগের পূর্ব দেয়ালটি সাদামাটা। এতে খিলানের পাল্লা লাগানোর ছিদ্র ব্যতীত আর তেমন কোন উপাদান নেই। পশ্চিম দেয়ালে একটি বৃহৎ কুলঙ্গী রয়েছে। এটি উত্তর-দক্ষিণে ৭৫ সে.মি. প্রশস্ত, ১.১৫ মিটার গভীর এবং ১.৩০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। ভূমি হতে কুলঙ্গীটি প্রায় ৬০ সে.মি. উঁচুতে অবস্থিত। এরূপ পরিমাপের কুলঙ্গী কি কাজে ব্যবহৃত হতো তা জানা যায় না। আটকানোর ব্যবস্থা থাকায় যদি অনুমান করা হয় যে তোরণটি খুলে দেয়ার জন্য কোন ব্যক্তি এখানে অবস্থান করতেন, সেক্ষেত্রে এর উচ্চতা একজন সাধারণ মানুষের উচ্চতা থেকে অনেক কম বিধায় এখানে অবস্থানও সম্ভব নয়। ফলে এর কাজ সম্পর্কে ধারণা করা অত্যন্ত দূরূহ। তোরণটির অভ্যন্তরভাগে বাতি রাখার জন্য কোন কুলঙ্গী নেই। এই বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সকল তোরণেই বিদ্যমান। এরূপ হতে পারে, বৃহৎ কুলঙ্গীটি আলো দানের জন্য ব্যবহৃত হতো।

তোরণের উত্তর দিকের ফাসাদ দক্ষিণ ফাসাদের অনুরূপ। এখানেও প্রবেশ খিলানের উভয় পাশে দুটি করে টেরাকোটা প্যানেল রয়েছে। তবে এ অংশের প্যানেলগুলো অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং আদি বৈশিষ্ট্যের অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে। তোরণের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে কোনরূপ স্থাপনা নেই। এগুলো সরলভাবে নির্মিত এবং বহির্প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত।

অলংকরণঃ

বাঘা মসজিদটি হুসেন শাহী শাসনামলের জমকালো গাত্রালংকার সমৃদ্ধ মসজিদের শেষ পর্যায়ের উদাহরণ এবং সুলতানী আমলের সবচেয়ে অলংকরণ সমৃদ্ধ মসজিদ হিসেবে পরিগণিত।[১৪৮] এই মসজিদের তোরণ হওয়ার সুবাদে বাঘার তোরণটিও যে জাঁকালো অলংকরণে সজ্জিত ছিল তা সহজেই ধরে নেয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে তোরণটিতে এর খুব অল্পই টিকে আছে। এগুলো মসজিদের ফাসাদের অলংকরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তোরণের ফাসাদের প্যানেলগুলো মসজিদের ফাসাদের ন্যায় দ্বি-স্তরে সাজানো। তবে এগুলোর অভ্যন্তরের বেশীর ভাগ অলংকরণ নষ্ট হয়ে গেছে। দক্ষিণ ফাসাদের চারটি প্যানেলে কিছু অলংকরণ টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় বিদ্যমান পশ্চিমাংশের নীচের প্যানেলটি (চিত্র-২৫)। এখানে মসজিদের প্যানেলের ন্যায় অভ্যন্তর ভাগে একটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নির্মিত হয়েছে। এর শীর্ষবিন্দু হতে একটি লতাপাতার তৈরি চেইন নক্‌শা অনেকটা ডানাকৃতির দুই জোড়া নক্‌শাসমেত নীচের দিকে নেমে এসেছে। সবশেষে স্থাপিত হয়েছে ফুল, লতা-পাতা সম্বলিত একটি আয়তাকৃতির মটিফ। খাঁজ খিলানের স্প্যান্ড্রিলে গোলাপ

---

১৪৮. *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* সম্পাদনা পরিষদ বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

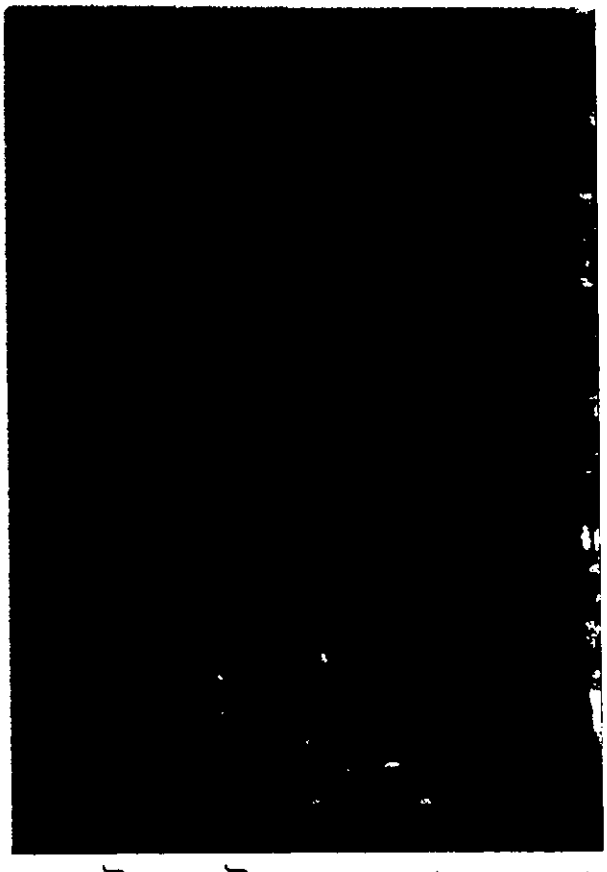

চিত্র-২৫ঃ টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ প্যানেল

Dhaka University Institutional Repository

নক্‌শা ও তার চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ফুলের নক্‌শা রয়েছে। অন্যান্য প্যানেলেও একই নক্‌শা বিদ্যমান ছিল। তবে নীচের প্যানেলগুলোর তুলনায় উপরের প্যানেলে ঝুলন্ত চেইন নক্‌শাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হয়েছে। টেরাকোটা প্যানেলগুলোর চার পাশের ফ্রেমগুলো বর্তমানে খালি। পূর্বে এগুলোও মসজিদের প্যানেলের ন্যায় সম্ভবত লতা পাতায় জড়ানো নক্‌শা কিংবা জালি নক্‌শায় পূর্ণ ছিল। কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী আয়তাকার প্যানেলে তিনটি করে উদ্‌গত গোলাপের নক্‌শা রয়েছে। এই অংশটিও সম্ভবত জাঁকালো অলংকরণে পূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ফলে তোরণটিও যে সুলতানী আমলের অন্যতম জাঁকালো অলংকরণ সমৃদ্ধ ইমারত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নির্মাণ উপাদানঃ

তোরণটি সামগ্রিকভাবে ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছে। শুধুমাত্র দক্ষিণ খিলানের নিম্নভাগে, খিল আটকানোর স্থানে এবং দরজার কড়ি আটকানোর স্থানে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনাঃ

বাঘা মসজিদের তোরণটি বাংলায় টিকে থাকা অর্ধ-গম্বুজে আবৃত তোরণের একমাত্র উদাহরণ। তাছাড়া এর চারকোণে যে ক্ষুদ্র গম্বুজাবৃত বুরুজ রয়েছে তা সুলতানী আমলে নির্মিত কোন তোরণে লক্ষ্য করা যায় না। এরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নির্মাণ নসরত শাহের শাসনামলে বাংলা স্থাপত্যের আবিষ্কারধর্মী চরিত্রের পরিচয় দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বড় সোনা মসজিদের তোরণসমূহ

অবস্থানঃ

মৌজা-রামকেলী, গ্রাম-ঘোষপাড়া, থানা-ইংলিশবাজার, জেলা-মালদহ।

গৌড় দুর্গের প্রধান তোরণ দাখিল দরওয়াজা হতে প্রায় অর্ধ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্ব দিকে বড় সোনা মসজিদ অবস্থিত। গৌড়ে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় নিদর্শনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ এই ইমারতটি দুর্গ এলাকার বাইরের জামি মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।[১৪৯] একটি বিরাট উঁচু ভূমির পশ্চিম বাহুতে মসজিদ এবং পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে তিনটি তোরণ রয়েছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগে রয়েছে ২০০ বর্গফুটের একটি উম্মুক্ত অঙ্গন। এই সম্পূর্ণ এলাকাটি পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে কমপক্ষে ১০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

নির্মাণ কালঃ

তোরণগুলোতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে মসজিদের শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় নির্মাণকাল সর্ম্পকে ধারণা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ৯৩২ হিঃ/১৫২৫ খ্রিঃ এ হুসেন শাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহ্ মসজিদটি নির্মাণ করেন।[১৫০] ফ্রেঙ্কলিন যখন শিলালিপিটি পাঠ করেন তখন তা এর কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিলালিপিটি হারিয়ে গেছে। তোরণগুলোও সম্ভবত এ সময়ে কিংবা এর নিকটবর্তী কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছে।

---

১৪৯ . A. Karim, *Corpus*, p. 339.
১৫০. A. Karim, *Corpus*, p. 339.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থাঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস লেখক রবার্ট ওরমে (Robert Orme) ১৭৬৬ খ্রিঃ এ গৌড় ভ্রমণকালে সর্বপ্রথম বড় সোনা মসজিদটি আবিষ্কার করেন।[১৫১] অতঃপর ফ্রাংলিন,[১৫২] হেনরী ক্রেইটন, কানিংহাম প্রমুখ বড় সোনা মসজিদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। তাদের বর্ণনায় এর পূর্ণাঙ্গ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কানিংহামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মসজিদের তোরণসমূহ এক সময় নীল, সাদা, সবুজ, হলুদ, কমলা প্রভৃতি রঙে সাজানো ছিল, যার ভগ্নাংশ এখনও তোরণের পদতলে দেখা যায়।[১৫৩] কিন্তু এগুলোর কোন চিহ্ন বর্তমানে দেখা যায় না। মোট তিনটি তোরণের মধ্যে দক্ষিণ দিকের তোরণটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উত্তর দিকের তোরণ গাত্রের পাথর আচ্ছাদন অনেকটা পড়ে গেছে। শুধুমাত্র পূর্ব দিকের তোরণটি এর আদি অবয়ব নিয়ে টিকে আছে। তবে এটিও অত্যন্ত সতর্কভাবে সংস্কারকৃত।[১৫৪]

বড় সোনা মসজিদের সম্মুখ প্রাঙ্গনের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাহুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তোরণগুলো সম্ভবত একই পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল। আবেদ আলী এগুলোর প্রত্যেকটি ৩৮´.৫০´´ x ১৩´.৫০´´ ফুট বলে বর্ণনা করেন।[১৫৫] কিন্তু দক্ষিণ তোরণের ধ্বংসাবশেষ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হয়েছিল (চিত্র-২৬)। তবে এর উভয় দিকে টিকে থাকা কোণা বুরুজের ভিত প্রমাণ দেয় এটি অন্যান্য তোরণের ন্যায় একই পরিকল্পনা ও স্থাপত্যিক

---

১৫১ . Robert Orme, *Gaur: Descriptions of It's Ruins with four Inscriptions taken in the Arabic copy*. India office Library Ms ov, 65-25; Published in F.G. Glazeir, A Report of the District of Rungpoore, Calcatta, 1873, (Source-Mahmudul Hasan, *Ibid* p. 164.)

১৫২ W. Franklin, *Journal of a Route from Rajmahal to Gour*, India office Library Mss.19, (Source- Henry Revenshaw, *Ibid*, p. 14.)

১৫৩. A. Canninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994 (reprint), vol. xv, p. 69.

১৫৪ . A. A. Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 45.

১৫৫. A. A. Khan, *Ibid*, p. 45.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৬ঃ দক্ষিণ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৭ঃ বড় সোনা মসজিদের উত্তর তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। তাছাড়া উত্তর (চিত্র-২৭) ও পূর্ব দিকের তোরণ (চিত্র-২৮) দুটি প্রায় একই পরিমাপ, পরিকল্পনা, স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ নিয়ে টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে আদি অবয়ব নিয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় টিকে থাকা পূর্ব তোরণের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

পূর্ব তোরণ

পরিকল্পনা ও স্থাপত্যশৈলীঃ

তোরণটি আয়তাকার এক খিলান বিশিষ্ট সরল পরিকল্পনায় নির্মিত (ভূমি পরিকল্পনা-৯)। এটি উত্তর-দক্ষিণে ১২.২০ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৯০ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট। এর মধ্যবর্তী স্থানে কৌণিক দ্বিকেন্দ্রিক প্রবেশ খিলান একটি আয়তাকার উদ্‌গত ফ্রেমের অভ্যন্তরে অবস্থিত। পাথরের তৈরী এই ফ্রেমটি তোরণের কার্নিশে গিয়ে মিশেছে। কার্নিশটি বাংলা রীতিতে বাঁকানো। ফাসাদের উভয় পাশে সংযুক্ত বুরুজ নির্মিত হয়েছে, যা ঠিক কোণগুলোতে না হয়ে ফাসাদের সম্মুখভাগে অবস্থিত। অষ্ট-কোণাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এই বুরুজগুলোর অর্ধাংশ বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। সম্পূর্ণ ফাসাদটি মোল্ডিং নক্‌শায় সমান্তরাল ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে।

তোরণের প্রবেশ খিলানটি ২.৭৩ মিটার উন্মুক্ত এবং কেন্দ্র বিন্দুতে ৩.৩০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। এটি তোরণের অভ্যন্তর ভাগের দেয়াল হতে ১৫ সে.মি. অগ্রসর। তোরণের অভ্যন্তর ভাগ টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি খিলানকৃত কুলঙ্গী রয়েছে। অনুরূপ কুলঙ্গী গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) তোরণে লক্ষ্য করা যায়। কুলঙ্গীগুলো ১.২১ মিটার উন্মুক্ত এবং ২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। তোরণের ভিত হতে ৭৩ সে.মি. উঁচুতে অবস্থিত এই কুলঙ্গীগুলোর গভীরতা ১.৮৫ মিটার। অন্যান্য মসজিদের তোরণে নির্মিত কুলঙ্গী অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ হলেও এগুলো সম্ভবত আলংকারিক চরিত্রই প্রকাশ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি পরিকল্পনা-৯ঃ বড় সোনা মসজিদের পূর্ব তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৮ঃ বড় সোনা মসজিদের পূর্ব তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের পূর্ব ফাসাদের ন্যায় পশ্চিম ফাসাদটি একই অবয়ব নিয়ে নির্মিত। তবে উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদ একেবারে সমতল। এক্ষেত্রে ছোট সোনা মসজিদের তোরণের ন্যায় কার্নিশটি অন্যান্য অংশের সাথে বেঁকে না গিয়ে সমান্তরাল রূপ নিয়ে বর্তমান।[১৫৬] এ অংশগুলোতে প্রাচীর দেয়ালের সংযুক্তির কোন চিহ্ন নেই। সম্ভবত সংস্কারের ফলে ফাসাদগুলো বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তোরণের আচ্ছাদনে ইটের তৈরী সমতল ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে।

নির্মাণ উপাদানঃ

তোরণটি নির্মাণে হুসেন শাহী যুগে বহুল প্রচলিত 'ইট ও পাথরের' নির্মাণ রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর নির্মাণে ইটের উপরে পাথরের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়েছে।

অলংকরণঃ

হুসেন শাহী শাসনামলে নির্মিত ইমারত সমূহের আলংকারিক জাঁকালোতা হয়ত তোরণটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছিল। কানিংহামের বর্ণনা এ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ দেয়। তিনি তোরণগুলোর পাদদেশে বহুরঙা টালির ভগ্নাবশেষ দেখেন। কিন্তু এগুলোর কিছুই বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে পাথরে আচ্ছাদিত হওয়ায় তোরণটি বিভিন্ন ধরনের পাথর খোদাই অলংকরণে সজ্জিত হয়েছে। এগুলো হালকা রিলিফ পদ্ধতিতে করা। সম্পূর্ণ তোরণটিকে প্রথমেই মোল্ডিং নক্শা দ্বারা কতগুলো আলংকারিক স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এর ভিতে বৃক্ষ পত্রের নক্শার সারি রয়েছে। এর উপরিভাগে পর পর তিনটি মোল্ডিং হালকা রিলিফসমেত সারিবদ্ধ। পশ্চিম ফাসাদের উত্তর বাহুটি লম্বভাবেও তিনটি আলংকারিক স্তরে বিভক্ত। এরূপ আলংকারিক বিভাজন দিনাজপুরের সুরা মসজিদের তোরণে (নি:আ: ১৫শ শতকের

---

১৫৬. ছোট সোনা মসজিদের বিবরণ দ্রষ্টব্য। পৃ.৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ ১৬শতক) লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের স্প্যান্ড্রিলে দুটি উদ্‌গত পদ্ম নক্‌শা রয়েছে। এগুলোর উভয় পাশে এবং খিলানের কেন্দ্রবিন্দুর উপরিভাগে অনেকটা পাতার ন্যায় নক্‌শা রয়েছে। তোরণের কার্নিশেও পাথর খোদাই অলংকরণ এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

সাধারণ আলোচনাঃ

বড় সোনা মসজিদের তোরণের স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ও শৈলী অনেকটা ছোট সোনা মসজিদের তোরণের অনুরূপ। এমনকি এর অভ্যন্তর ভাগে নির্মিত কুলঙ্গী নির্মাণের সাথেও এর মিল রয়েছে। কেননা এই তোরণগুলো ব্যতীত বাংলায় মসজিদের তোরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে উভয় বাহুতে এরূপ বৃহৎ কুলঙ্গী দেখা যায় না। তাছাড়া উভয় তোরণ পাথরে আচ্ছাদিত হওয়ায় অলংকরণের ক্ষেত্রেও মিল রয়েছে। তবে ছোট সোনা মসজিদের তোরণের অলংকরণের বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে গেলেও যেটুকু টিকে আছে তা থেকে অনুমান করা যায়, এটি বড় সোনা মসজিদের তোরণ অপেক্ষা অধিক অলংকরণে সজ্জিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সুরা মসজিদের তোরণ

অবস্থান ঃ

জেলা: দিনাজপুর, থানা: ঘোড়াঘাট, ইউনিয়ন: উসমানপুর, মৌজা: চোরগাছা।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট নামক স্থানটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলে সুলতানী ও মুঘল যুগের বহু ইমারতাদি নির্মিত হয়, যার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। তবে যে কয়েকটি নিদর্শন অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রয়েছে তোরণসমেত সুরা মসজিদটি এদের অন্যতম (চিত্র-২৯)। এটি দিনাজপুর জেলা সদর হতে প্রায় ৬৫ কিলো মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী ভূমি হতে প্রায় ১.২০ মিটার উঁচু একটি বর্গাকার প্লাটফর্মের পশ্চিম বাহুতে মসজিদ এবং পূর্ব বাহুতে রয়েছে একটি সুদৃশ্য প্রবেশ তোরণ। প্লাটফর্মের উচ্চতা পর্যন্ত টিকে থাকা প্রাচীরের অংশ দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, পূর্বে এটি প্রাচীরে ঘেরা ছিল। ইট এবং পাথর এখনও এর উপরিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে একটি বিশালাকার দিঘি।

নির্মাণ কাল ঃ

সুরা মসজিদ কিংবা এর তোরণে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে এই মসজিদ হতে কয়েক কিলোমিটার দুরে অবস্থিত চম্পাতলীতে হুসেন শাহের শাসনামলে (৯১০ হিজরী/ ১৫০৪ খ্রি:) একটি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপি পাওয়া গেছে। শিলালিপিটি বর্তমানে বগুড়ার মহাস্থানগড় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ইয়াকুব আলী উক্ত শিলালিপিকে সুরা মসজিদের বলে অনুমান করেন।[১৫৭] তবে এর এক গম্বুজ বিশিষ্ট ও

---

১৫৭. K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra, 1200-1576 A.D.* (M.Sajjadur Rahim), Rajshahi -1998. p.319 (Foot note) .

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৯ঃ তোরণ সমেত সুরা মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে বারান্দাযুক্ত গঠনাকৃতি গৌড়ের রাজবিবি মসজিদ (নির্মাণঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ষষ্ঠদশ শতকের প্রথমভাগ), চামকাটি মসজিদ (পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক), লোটন মসজিদ (নির্মাণঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ষষ্ঠদশ শতকের প্রথমভাগ) এবং দিনাজপুরে অবস্থিত গোপালগঞ্জ মসজিদের (নির্মাণঃ ১৪৬০ খ্রিঃ) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১৫৮] ক্যাথরিন বি, আশারের মতে, এ ধরনের মসজিদ পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতকে উত্তর বঙ্গের সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছিল।[১৫৯] এ.বি.এম. হুসেন এর নকশা, গঠন এবং অলংকরণ গৌড়ের রাজবিবি মসজিদের সাথে তুলনা করে একে পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকের নির্মাণ বলে মনে করেন।[১৬০] পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলী বিবেচনায় মসজিদটিকে পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম ভাগের নির্মাণ বলা যায়। তাছাড়া গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের (১৫২৬ খ্রিঃ) তোরণগুলোর ফাসাদের ধাপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে আলোচ্য মসজিদের তোরণটির মিলও এই অনুমানের পক্ষে প্রমান দেয়।

বর্তমান অবস্থা ঃ

সুরা মসজিদের তোরণটির সাথে মসজিদের তুলনা করলে এতে যথেষ্ট সংস্কারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমগ্র মসজিদের গাত্রে যে টেরাকোটার অলংকরণ ও কোণা বুরুজে পাথরের আচ্ছাদন রয়েছে তা তোরণে বিদ্যমান নেই। তাছাড়া সুলতানী যুগে নির্মিত বড় সোনা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) তোরণের সাথে পরিকল্পনাগত মিল এর আদি অবস্থার পক্ষে প্রমাণ দিলেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় এতে কোন কুলঙ্গী লক্ষ্য করা যায় না। যাহোক মসজিদ কম্পাউন্ডটি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন বগুড়ার আঞ্চলিক অফিসের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

---

১৫৮. C.B. Ashar, Inventory Key Monument, *Ibid*, p. 81,67, 77.

১৫৯. C.B. Ashar, *Ibid*, p.134.

১৬০. এ.বি.এম. হোসেন , *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* , রাজশাহী বিভাগ:ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সম্পাদনা পরিষদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী, এপ্রিল-১৯৯৮, পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

সুলতানী আমলে নির্মিত অন্যান্য মসজিদের তোরণের ন্যায় এটি সাধারণ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে। মসজিদের প্রাচীর ঘেরা অঙ্গনের পূর্ব বাহুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে তোরণটি অবস্থিত (চিত্র-৩০)। পার্শ্ববর্তী ভূমি হতে এর উচ্চতা ১.২০ মিটার। ফলে তোরণে উত্তরণের জন্য মোট ৯টি ধাপযুক্ত সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে এবং এর উভয় পার্শ্বে রয়েছে ঢালু সিঁড়ি (Ramp), যা তোরণের মেঝে পর্যন্ত উঠে গেছে। এটি সাধারণ আয়তাকার পরিকল্পনা নিয়ে গঠিত (ভূমি নকশা-১০)। এর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বাহুর পরিমাপ ৬.১০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১.৮৩ মিটার। পূর্ব দিকে অবস্থিত এর সম্মুখ ফাসাদের মধ্যবর্তী অংশে নির্মিত হয়েছে কৌণিক দ্বি-কেন্দ্রিক প্রবেশ খিলান। এটি তোরণের মূল দেয়াল হতে প্রায় ১০ সে.মি. উদ্‌গত একটি আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত। এর উভয় পার্শ্বে, উত্তর-দক্ষিণে ২.৫৫ মিটার বিস্তৃত দুটি অংশ পর পর তিনটি উল্লম্ভ ধাপে বিভক্ত। ধাপগুলো আবার একটি অপরটি হতে ৫ সে.মি. প্রবিষ্ট হয়ে তোরণের কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। কার্নিশটি মসজিদের কার্নিশের ন্যায় বাঁকানো। এ ধরনের বাঁকানো কার্নিশ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ সুলতানী আমলে সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলার চালা ঘরের নির্মাণ রীতি থেকে ইটের ইমারতে গ্রহন করা হয়েছে। কার্নিশটি মূল দেয়াল হতে কমপক্ষে ১৫ সে.মি. উদ্‌গত এবং তিনটি স্তরে বিভক্ত। এগুলো বর্তমানে ইট দিয়ে নির্মিত। পূর্বে এ অংশে মোল্ডিং নক্‌শা ছিল কিনা তা জানা যায় না। তাছাড়া বর্তমানে মসজিদের কার্নিশও আদি অবস্থায় টিকে নেই। তবে পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতকে নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, লোটন মসজিদ, রাজবিবি বা খনিয়া দিঘি মসজিদ কিংবা টিকে থাকা এ সময়ের অন্যান্য মসজিদের কার্নিশের সাথে তুলনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তোরণের কার্নিশও পূর্বে মোল্ডিং নক্‌শায় শোভিত ছিল। এর অভ্যন্তর ভাগ পূর্ব-পশ্চিমে ১.৬০ মিটার বিস্তৃত। এখানে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে কোন কুলঙ্গীও দেখা যায় না। শুধুমাত্র পূর্ব খিলানের উপরিভাগে ভেতরের

Dhaka University Institutional Repository

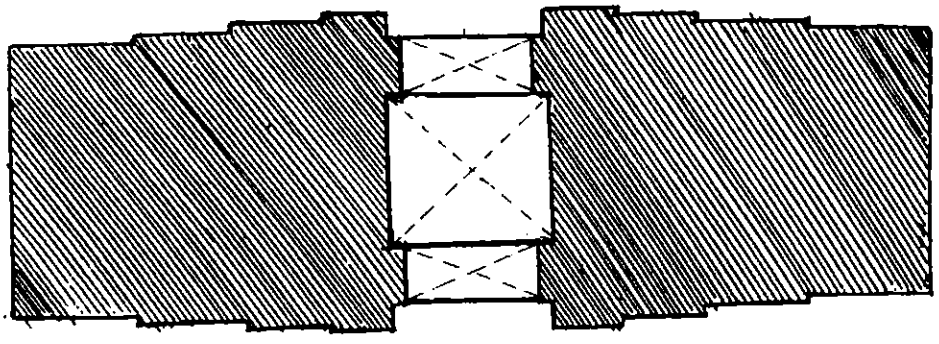

ভূমি পরিকল্পনা-১০ঃ সুরা মসজিদের তোরণ

উঃ

০ ৫০ ১০০ মে.মি.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৩০ঃ সুরা মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

দিকে দুটি ছিদ্র বিশিষ্ট পাথরের লুব দেয়ালে প্রবিষ্ট রয়েছে। এগুলো দরজার পাল্লা লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু দরজার খিল লাগানোর কোন ব্যবস্থা উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে নেই। সম্ভবত সংস্কারের সময় এগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পাল্লার বদলে এখানে লোহার দরজা লাগানো রয়েছে। তোরণের প্রবেশ পথটি একটি ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত।

তোরণের পশ্চিম ফাসাদটি পূর্ব ফাসাদের ন্যায় একই পরিকল্পনায় নির্মিত। এর কেন্দ্রে প্রবেশ খিলান রয়েছে। তবে এর পার্শ্ববর্তী অংশ পূর্ববর্তীটির ন্যায় ধাপবিশিষ্ট না হয়ে সমতল হয়েছে এবং খিলানের ফ্রেমটি সরাসরি কার্নিশে মিশে গেছে। পূর্বে এর উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদ মসজিদের প্রাচীর দেয়ালের সাথে সংযুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে দেয়ালটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কার্নিশের বাঁকানো রীতি এই অংশেও অনুসরণ করা হয়েছে। তোরণটি আচ্ছাদনে সমতল ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ছোট সোনা মসজিদের তোরণের ন্যায় এটি কার্নিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বাঁকা হয়ে গেছে।

অলংকরণ ঃ

বাংলায় সুলতানী আমলে নির্মিত জমকালো অলংকরণ সমৃদ্ধ মসজিদসমূহের মধ্যে সুরা মসজিদটি অন্যতম স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর তোরণটি একেবারেই নিরাভরণ। এতে তেমন কোন অলংকরণ নেই। শুধু মাত্র খিলানের স্প্যান্ড্রিলে, ফ্রেমের উপরিভাগে গোলাপ নক্শা এবং পশ্চিম খিলানের স্প্যান্ড্রিলের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকারে পাতাকৃতির টেরাকোটা নক্শা রয়েছে। কিন্তু মসজিদের অলংকরণের সাথে তুলনা করলে তোরণটি যে আদি অবস্থায় এরূপ অলংকরণবিহীন ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। কেননা, এর পূর্ব ফাসাদে যে সজ্জাহীন খিলানের উদ্গত ফ্রেম এবং স্তরবিশিষ্ট দেয়াল রয়েছে, অনুরূপ ফ্রেম এবং স্তরবিশিষ্ট দেয়াল মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদে থাকলেও এগুলো সম্পূর্ণভাবে টেরাকোটা

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণে সমৃদ্ধ। এতে অনুমান করা যায়, অনুরূপ অলংকরণ তোরণের গাত্রেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

নির্মাণ উপাদান ঃ

মসজিদটি ইট ও পাথরের সমন্বয়ে নির্মিত হলেও তোরণটি নির্মাণে সম্পূর্ণ ইটের ব্যবহার করা হয়েছে। শুধুমাত্র এর ভিতে এবং খিলানের উৎক্ষেপণ স্থানে এবং সিঁড়ি নির্মাণে স্বল্প পরিসরে পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ আলোচনা ঃ

পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতকে নির্মিত তোরণগুলোর সাথে তুলনা করলে সুরা মসজিদের তোরণে সমসাময়িক কালে বাংলায় বিকাশিত স্থাপত্যের সাধারণ রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু এ সময়ে স্থাপত্যের নির্মাণ শৈলী ও অলংকরণে যে উচ্চাঙ্গ রীতির চর্চা চলছিল তার সাথে তোরণটির তেমন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। তবে পরিকল্পনার দিক থেকে তোরণটি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদের তোরণসমূহের সাথে মিল এবং সংযুক্ত মসজিদের সাথে তুলনা করে বলা যায় এখানেও সমসাময়িক রীতি বিকাশ লাভ করেছিল , কিন্তু প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা ও সঠিক সংস্কারের অভাবে এটি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল আমল

Dhaka University Institutional Repository

কুতুবশাহী মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

মৌজা-কুতুব শহর, গ্রাম-গোলঘর, পোঃ-পুরাতন পান্ডুয়া, থানা-গাজল, জেলা-মালদহ।

গৌড় নগর থেকে ৩০ কি.মি. উত্তর-পূর্বদিকে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের প্রথম রাজধানী 'পান্ডুয়া' শহরটির অবস্থান। প্রথম ইলিয়াছ শাহী শাসনামলের বিখ্যাত সুফী নুর কুতুবুল আলমের স্মৃতি বিজরিত এই শহরে যে কয়েকটি ইমারত এখনও টিকে আছে কুতুবশাহী মসজিদটি এগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি বাংলায় প্রাথমিক মুঘল যুগে নির্মিত তোরণসমেত মসজিদের আদি নিদর্শন (চিত্র-৩১)। সুফী নুর কুতুবুল আলমের সমাধি ও খানকাহ্ এবং একলাখী সমাধির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই মসজিদটি বিখ্যাত সাধক নুর কুতুবুল আলমের স্মরণে নির্মিত হয়েছে।

প্রাপ্ত শিলালিপিতে এটি 'কুতুবশাহী মসজিদ' নামে উল্লেখিত।[১৬১] তবে 'সোনা মসজিদ' নামেও এর পরিচিতি রয়েছে।[১৬২] আবীদ আলীর মতে, এরূপ নামকরণ সম্ভবত দেয়ালের বাইরে এবং টারেটের শীর্ষে খোদাই করা গিল্টি কাজ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।[১৬৩] কিন্তু কানিংহাম মসজিদটিতে কোন গিল্টি কাজের সন্ধান পাননি।[১৬৪] হান্টার মনে করেন, ইমারতটির পবিত্রতার বিশেষণ স্বরূপ এ নামকরণ হতে পারে।[১৬৫]

400823

১৬১. A. Karim, *Corpus*, p. 419.

১৬২. Henry Revanshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D., p. 56.

১৬৩. A. A. Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 123

১৬৪. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv p. 87.

১৬৫. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, vol-vii, London, 1876, (Reprint Delhi-1974), p.61.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

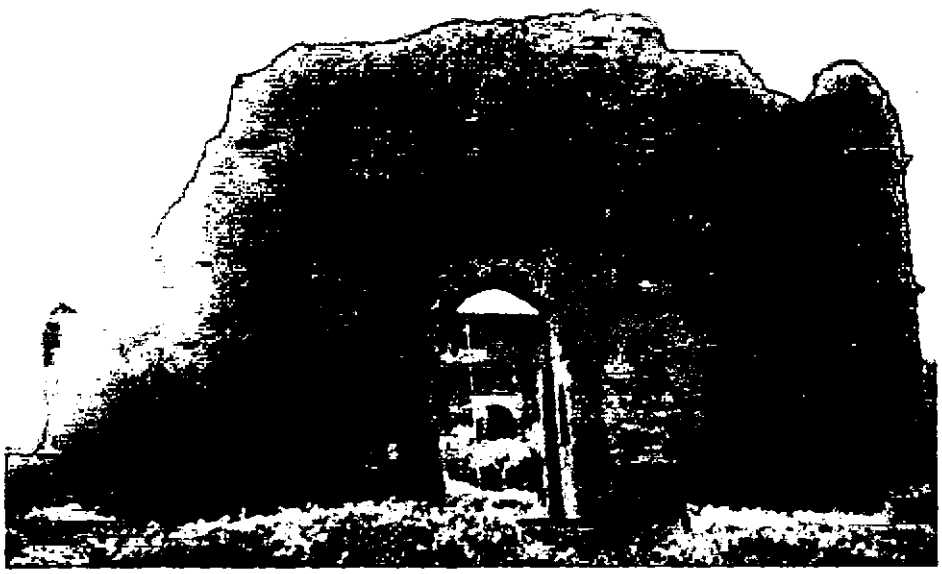

চিত্র ৩১ঃ কুতুব শাহী মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কালঃ

এই মসজিদে মোট তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, যার একটি মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার উপরে, একটি মিম্বরে এবং অপরটি মসজিদের তোরণে ছিল। এগুলোর মধ্যে তোরণের শিলালিপিটি হারিয়ে গেছে। তবে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বে ফ্রাঙ্কলিন এটির পাঠোদ্ধার করেন। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী তোরণটি মুহাম্মদ-আল-খালিদির পুত্র ফকির মসদুম শেইখ কর্তৃক ৯৯৩ হিঃ/১৫৮৫ খ্রিঃ এ নির্মিত হয়েছে।[১৬৬] মসজিদটি একই ব্যক্তি কর্তৃক ৯৯০হিঃ/১৫৮২ খ্রিঃ এ নির্মিত।[১৬৭] ফলে দেখা যায় তোরণটি মসজিদ নির্মাণের ৩ বছর পর নির্মিত হয়েছে।

বর্তমান অবস্থাঃ

মেজর ফ্রাঙ্কলিন আলেক্সান্ডার কানিংহাম সর্বপ্রথম গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে মসজিদটি সনাক্ত করেন। তখন এটি অত্যন্ত ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছিল। এর বহির্প্রাচীরে বিদ্যমান তোরণটি পরবর্তীতে সংস্কার করা হলেও[১৬৮] বর্তমানে ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছে। এর গাত্রে ব্যবহৃত পাথরগুলোর বেশীরভাগ ধ্বসে পড়েছে। কোণা বুরুজগুলোও ভগ্নদশায় পতিত হয়েছে। সর্বোপরি এর কার্নিশ ভেঙ্গে পড়েছে। যেটুকু এখনও টিকে আছে তা থেকে এর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিকল্পনা ও নির্মাণ শৈলীঃ

সার্বিক পরিকল্পনায় একটি ১৭২ দীর্ঘ এবং ১২৭ প্রশস্ত অঙ্গনের পশ্চিম বাহুতে মসজিদ এবং পূর্ব বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে এর একমাত্র তোরণের অবস্থান। তোরণটি বর্তমান ভূমি হতে ৬০ সে.মি. উঁচু একটি ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে এবং সম্মুখে

---

১৬৬. A. Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions in Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka -1992 A.D., p. 419.
১৬৭. A. Karim, *Corpus*, p. 421.
১৬৮. A. A. Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p.123.

Dhaka University Institutional Repository

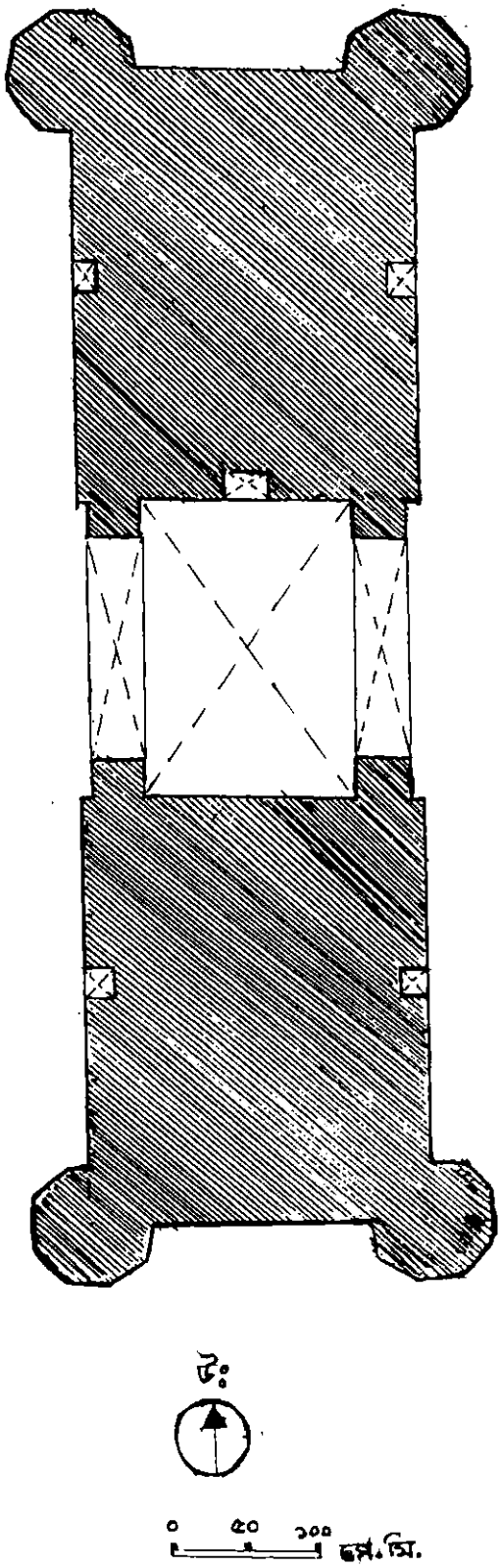

ভূমি পরিকল্পনা- ১১০ কুতুবশাহী মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে পাথরের শ্লেব দ্বারা তৈরী মোট চারটি সিঁড়ি। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই তোরণটির দৈর্ঘ ৭.৮৫ মিটার এবং প্রস্থ ২.২২ মিটার (ভূমি পরিকল্পনা-১১)। এর কেন্দ্রে ১.৪২ মিটার দীর্ঘ এবং ২.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট প্রবেশ খিলান রয়েছে। এটি অলংকৃত পাথরের স্তম্ভের উপর খাঁজকাটা নক্শাসমেত নির্মিত হয়েছে।

পূর্ব খিলানের উপরিভাগে উদ্গত মোল্ডিং নক্শার অস্তিত্ব রয়েছে। এটি সম্ভবত খিলান ফ্রেমের অংশ ছিল যা ধ্বংস হয়ে গেছে। এর পার্শ্ববর্তী ফাসাদে দুটি ক্ষুদ্র খিলানকৃত কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো ভিত হতে ৯ মিটার উপরে স্থাপিত। বহির্ফাসাদে খিলান ব্যতীত ফাসাদের উভয় কোণে অষ্টকোণী বুরুজ ছিল। বর্তমানে পূর্ব দিকের বুরুজগুলোর শুধুমাত্র ভিত টিকে আছে। এগুলো মোল্ডিং দ্বারা বিভাজিত। প্রতিটি কোণা বুরুজ ভিতে ২.০৩ মিটার ডায়ামিটার। মসজিদের কোণা বুরুজের সাথে আকৃতিগত মিল থাকায় অনুমান করা যায়, এগুলোও এক সময় ক্ষুদ্র গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, যা পরবর্তীকালে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোরণের কার্নিশ এবং বহির্আচ্ছাদন অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে মসজিদের কার্নিশে বাঁকানো রীতির ব্যবহার প্রমাণ দেয়, তোরণেও একই রীতির কার্নিশ ছিল। এক্ষেত্রে মসজিদের ন্যায় কোণা বুরুজের গম্বুজগুলোও সম্ভবত কার্নিশের উপরে উঠে গিয়েছিল।

তোরণের অভ্যন্তর ভাগ টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এ অংশটির আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ১.৭০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১.৩০ মিটার। এর উভয় পাশের দেয়ালে দুটি করে কুলঙ্গী রয়েছে। এর মধ্য দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে ৭৩ সে.মি. উঁচু এবং ৬৫ সে.মি. গভীর কুলঙ্গীটি খিলানকৃত। এটি ৫৫সে.মি. উন্মুক্ত। সম্ভবত বাতি রাখার উদ্দেশ্যে নির্মিত এই ধরনের কুলঙ্গী সুলতানী মসজিদের তোরণসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এর পার্শ্ববর্তী স্থানে পূর্ব খিলানের কাছাকাছি অপর একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অপেক্ষাকৃত গভীর আয়তাকার কুলঙ্গী রয়েছে। এটি সম্ভবত দরজার খিল লাগানোর

Dhaka University Institutional Repository

কাজে ব্যবহৃত হতো। এর বরাবর ঠিক উপরিভাগে গোলাকার ছিদ্র বিশিষ্ট পাথরের অবস্থান এ অনুমানের পক্ষে সমর্থন দেয়।

তোরণের পশ্চিম ফাসাদটি অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত (চিত্র-৩২)। এর পাথরগুলো প্রায় ধ্বসে পড়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানটি ভেঙ্গে গিয়ে অভ্যন্তর ভাগের ভল্টটি বের হয়ে গেছে এবং পশ্চিমের কোণা বুরুজটি ব্যতীত ক্ষুদ্র গম্বুজসহ অন্যান্য অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে টিকে থাকা কুলঙ্গী এবং কোণা বুরুজ দৃষ্টে অনুমান করা যায়, এটি পূর্ব ফাসাদের অনুরূপ ছিল।

অলংকরণঃ

তোরণটিতে স্বল্প অলংকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এর কোণা বুরুজগুলোতে সরল মোল্ডিং নক্শা এবং খিলান স্তম্ভ ও স্প্যান্ড্রিলে পাতার মটিফ বিশিষ্ট কিছু কিছু পাথর খোদাই অলংকরণ রয়েছে।

নির্মাণ উপাদানঃ

ইট ও চুন শুরকির দেয়ালের উপরে অমসৃণ পাথরের স্লেব বসিয়ে তোরণটি নির্মিত হয়েছে। কানিংহাম মসজিদের বিভিন্ন অংশ নীল কাচের ভগ্নাংশ দেখে অনুমান করেন যে, পুরাতন ইমারতের মাল-মশলা দিয়ে মসজিদটি তৈরি।[১৬৯] তোরণ নির্মাণেও সম্ভবত একই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল।

সাধারণ আলোচনাঃ

বাংলায় মুঘল যুগের প্রথমভাগে নির্মিত হওয়ায় তোরণটিতে সুলতানী যুগের বৈশিষ্ট্যই গৃহীত হয়েছে। এর উপরিভাগের গম্বুজ ব্যতীত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে রাজশাহীর বাঘা মসজিদের মিল রয়েছে। এর ক্ষুদ্র গম্বুজে আবৃত কোণা বুরুজ,

---

১৬৯. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994(reprint), vol. xv., p.87.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩২ঃ পশ্চিম কাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

বাঁকানো কার্নিশ প্রভৃতি বাঘা মসজিদের তোরণের অনুরূপ। তবে নির্মাণ উপাদানের ক্ষেত্রে এখানে ইটের পরিবর্তে পাথরের ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এ সময়ে বাংলার মুঘল প্রশাসন অত্যন্ত দুর্বল ছিল বিধায় তাঁদের আনিত বৈশিষ্ট্য তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। তাছাড়া মসজিদটির অলংকরণ স্বল্পতা এবং অমসৃণ পাথরের ব্যবহারে রাজকীয় পৃষ্টপোষকতার অভাব এবং স্থানীয় পৃষ্টপোষকতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জামী মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

মৌজা-শর্বরী, গ্রাম-মাল গুদাম, পো: ও থানা-পুরাতন মালদহ, জেলা-মালদহ, পশ্চিম বঙ্গ।

পুরাতন মালদহ অঞ্চল গৌড় দুর্গ হতে ১৩ মাইল উত্তরে এবং ইংলিশ বাজারের ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই শহরটি বানিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছিল।[১৭০] মুসলিম শাসনামলে এটি রাজধানী পান্ডুয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৭১] এ সময়ে বহু ইমারতাদি নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে শুধুমাত্র কাটরার কিছু অংশ (আ: ১৬শ শতকের শেষভাগ), একটি মিনার (নিমসরাই-নি: আ: ১৬শ শতকের শেষভাগ) ও দুটি মসজিদ ব্যতীত প্রায় সকল ইমারতই ধ্বংস হয়ে গেছে। টিকে থাকা ইমারতগুলোর মধ্যে জামী মসজিদটি আদি অবয়ব নিয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় বিদ্যমান। কাটরার ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছুটা দক্ষিণে একটি দেয়াল ঘেরা অঙ্গনের পশ্চিম বাহুতে মসজিদ এবং পূর্ব বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি তোরণ নির্মিত হয়েছে (চিত্র-৩৩)।

স্থানীয়ভাবে মসজিদটি জুম্মা (জামী) মসজিদ নামে পরিচিত। হেনরী রেভেনশো একে 'সোনা মসজিদ' (Golden Mosque) নামেও উল্লেখ করেছেন।[১৭২]

---

১৭০. A.A. Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D. (foot note) p. 146. 1888 খ্রিঃ এখানে 200 A. D. এর একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিস্কৃত হয়।

১৭১. A. A. Khan, , *Ibid*, p. 146.

১৭২. Revenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D., p. 44.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৩৩ঃজামী মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকালঃ

তোরণটিতে শিলালিপি নেই। তবে মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারের উপরে এর নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপি রয়েছে। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী, মসজিদটি ১০০০ হিঃ/১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আবীদ আলীর মতে, এটি সম্রাট আকবর নির্মাণ করেননি, বরং সংস্কার করেছেন। তিনি এর নিকটবর্তী শাহ্জাদা খানকাহে প্রাপ্ত শিলালিপিকে উক্ত মসজিদের বলে বর্ণনা করে এটিকে হুসেন শাহ্ কর্তৃক ৯১১হিঃ/১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[১৭৩] যদিও এর স্থাপত্য রীতি, যেমন– বাঁকানো কার্নিশ, ভল্ট আচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় 'বে' (Bay), মোল্ডিং এ বিভাজিত এবং ক্ষুদ্র গম্বুজে আচ্ছাদিত অষ্ট-কোণাকার কোণাবুরুজ, ফাসাদের আলংকারিক স্তর বিন্যাস, গম্বুজ নির্মাণে কর্বেল প্যান্দান্তিফের ব্যবহার প্রভৃতি হুসেন শাহী শাসনামলে নির্মিত স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু এর সম্পূর্ণ প্লাষ্টারকৃত অবয়ব, পদ্ম পাপড়ির ফিনিয়াল যুক্ত বেটে গম্বুজ ও সংযুক্ত বুরুজসহ উদ্গত সম্মুখ ফাসাদের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা আকবরের শাসনামলে বাংলা স্থাপত্যে প্রথম সংযোজিত হয়েছিল।[১৭৪] তাছাড়া বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর নির্মিত বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত খেরুয়া মসজিদ (নিঃ ১৫৮২ খ্রিঃ), টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ (নিঃ ১৬০৯) এবং এগারসিন্ধুর সাদ এর মসজিদের (নিঃ ১৬৫২ খ্রিঃ) স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে দেখা যায় এগুলোতে মুঘল রীতির সাথে আঞ্চলিক রীতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ফলে আবীদ আলীর অনুমান সঠিক নয়। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আকবরের শাসনামলে মালদহ অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতো।[১৭৫] এ সকল দিক বিবেচনা করে মসজিদটিকে আকবরের শাসনামলের নির্মাণ বলা সঙ্গত। সর্বোপরি শিলালিপির সাক্ষ্য এর পক্ষেই প্রমাণ দেয়।

---

১৭৩. A. A. Karim, *Corpus*, p. 422.

১৭৪. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D, p. 174.

১৭৫. Abul Fazal, *A`in-i-Akbari,* সূত্র -A. A. Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 146.

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের সাথে তোরণের বৈশিষ্ট্যগত মিল থাকায় অনুমান করা যায়, এটি একই সময়ে নির্মিত হয়েছে।

বর্তমান অবস্থাঃ

তোরণটি আদি পরিকল্পনা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে। এর বহির্প্রাচীরটিও আদি অবস্থায় এখনও বর্তমান। তবে এর উত্তর বাহুর কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়েছে।

পরিকল্পনা ও নির্মাণ শৈলীঃ

সম্পূর্ণ মসজিদটি একটি উঁচু মাটির ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে। তোরণটি মসজিদের অঙ্গনের সমউচ্চতায় নির্মিত হওয়ায় এতে উত্তরণের জন্য আট ধাপ যুক্ত সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়িটি বর্তমান ভূমি হতে ৩.১৫ মিটার উত্থিত হয়ে তোরণের ভিতে গিয়ে মিলেছে। তোরণটি একটি আয়তাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-১২)। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৫.৯২ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪.৩৬ মিটার। এর পূর্ব ফাসাদের কেন্দ্রে রয়েছে প্রবেশ খিলানটি । নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এটি অনেকটা চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের রূপ ধারণ করেছে। একটি আয়তাকার এবং দ্বি-স্তর বিশিষ্ট ফ্রেমের অভ্যন্তরে খিলানটি প্রথিত। ফাসাদের উভয় কোণে অষ্ট-কোণাকার সংযুক্ত বুরুজ কার্নিশ পর্যন্ত সীমায়িত; কিন্তু এগুলোর উপরিভাগ পদ্ম পাপড়ির নক্শা যুক্ত ফিনিয়াল সমেত ক্ষুদ্র গম্বুজ দ্বারা শোভিত। গম্বুজগুলো কার্নিশের উপরে উঠে গেছে। এরূপ গম্বুজাবৃত কোণা বুরুজের বহুল ব্যবহার নসরত শাহের নির্মিত ইমারতগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহীর বাঘা মসজিদের তোরণে (১৫২৩-২৪ খ্রিঃ) এই বৈশিষ্ট্য এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য তোরণে যে বাঁকানো কার্নিশ ব্যবহৃত হয়েছে তা সুলতানী স্থাপত্যের প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তোরণের উপরিভাগে আচ্ছাদনের জন্য নির্মিত গম্বুজটি এর কেন্দ্রীয় বর্গের উপরে

Dhaka University Institutional Repository

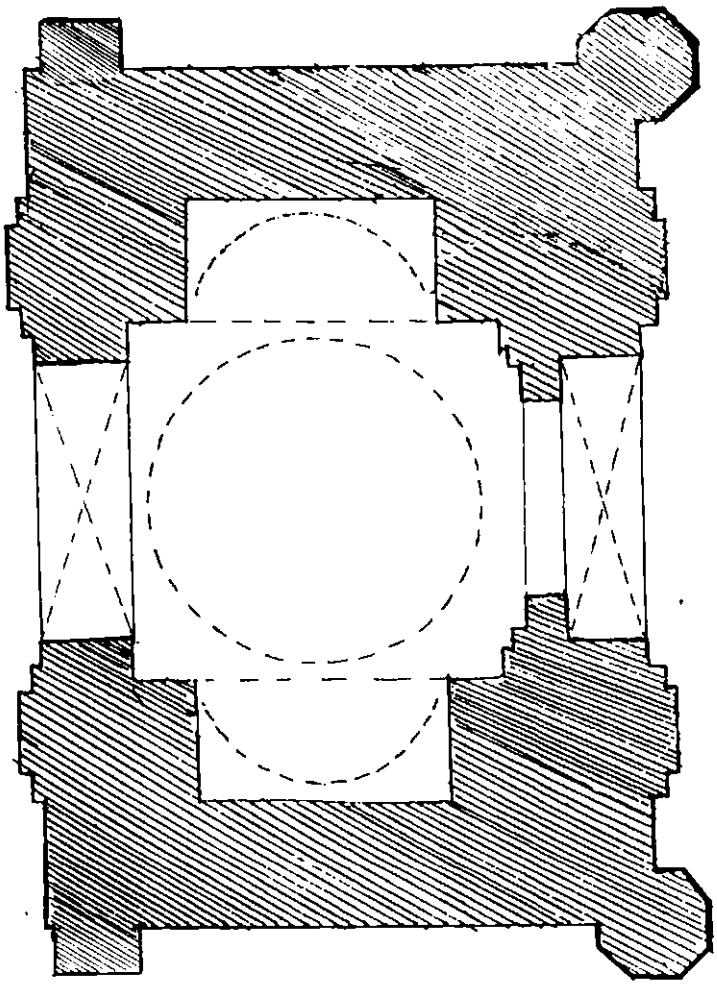

ভূমি পরিকল্পনা-১২ঃ জামী মসজিদের তোরণ

উঃ

0 ৫০ ১০০ সে. মি.

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হয়েছে। অপরাপর অংশে রয়েছে সমতল ছাদ। অভ্যন্তর ভাগে কেন্দ্রীয় বর্গের উভয় পাশে দুটি কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো অর্ধ-গম্বুজে আবৃত। গম্বুজের ভিত অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক। এক্ষেত্রে মুঘল যুগের অর্ধ-গম্বুজের ন্যায় এর ভিত সরাসরি দেয়াল থেকে উত্থিত না হয়ে কোণাগুলোতে অবস্থান্তর প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র প্যান্দান্তিফ নির্মিত হয়েছে। কুলঙ্গীগুলোর প্রত্যেক দেয়ালে আবার দুটি করে খিলানকৃত ক্ষুদ্র কুলঙ্গী রয়েছে, যার একটি অপরটির উপরে বিদ্যমান। মধ্যবর্তী বর্গের উপর মূল গম্বুজটিতেও মুঘল যুগের স্কুইঞ্চ এর পরিবর্তে অবস্থান্তর প্রক্রিয়ায় বাংলা প্যান্দান্তিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদের অঙ্গনে পৌছানোর জন্য তোরণের পশ্চিম বাহুতে যে পথটি রয়েছে তা খিলানকৃত না হয়ে পাথরের তৈরী স্তম্ভ ও সর্দল (Post and Lintel) পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে। আবীদ আলীর মতে, এগুলো গৌড় কিংবা পান্ডুয়া অঞ্চলের কোন হিন্দু ইমারত থেকে সংগৃহীত।[১৭৬] এগুলোর গাত্রে খোদাইয়ের সুক্ষতা তার মতের পক্ষে প্রমাণ দেয়। তবে এগুলোতে কোন প্রাণীর খোদাই চিত্র দেখা যায় না। তোরণের পশ্চিম ফাসাদ পূর্ব ফাসাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। এক্ষেত্রে ফাসাদটি কোণা বুরুজ বিহীন। মসজিদের বহির্প্রাচীর উভয় দিকে বর্তমান ভূমি হতে ৪.৫৮ মিটার উচ্চতা নিয়ে বিদ্যমান। তোরণের ভিত হতে এর উচ্চতা ৪.৫৮ মিটার। এটি আলাদা স্তম্ভের দ্বারা তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই ফাসাদগুলোর কার্নিশ পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদের ন্যায় বাঁকানো না হয়ে অনেকটা সমান্তরালে নির্মিত হয়েছে।

---

১৭৬. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 151.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৪ঃ পাথর খোদাই অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

তোরণটি হালকা অলংকরণে সজ্জিত। এর কার্নিশ, খিলানের ফ্রেমে এবং কোণা বুরুজে কিছু কিছু খোদাই ও উদ্‌গত টেরাকোটা নক্‌শা লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণ ফাসাদটি অবশ্য মোল্ডিং নক্‌শা দ্বারা তিনটি সমান্তরাল স্তরে বিভক্ত। এর উভয় দিকে অলংকৃত বেন্ড রয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানের ফ্রেমের ভিত হতে উপরিভাগ পর্যন্ত ৭ টি উদ্‌গত গোলাপ নক্‌শা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে স্থাপিত হয়েছে। খিলানের স্প্যান্ড্রিলে কোন অলংকরণ নেই, তবে এর উপরিভাগে পত্রের সারি যুক্ত তিন স্তর বিশিষ্ট মোল্ডিং রয়েছে। এগুলোর মধ্যবর্তী স্থানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রের সারি দেখা যায়। এর নিম্নভাগে কলসের ন্যায় একটি মটিফ রয়েছে। তোরণের কার্নিশে দুটি মোল্ডিং ছাড়াও উদ্‌গত ও প্রবিষ্ট প্রক্রিয়ায় নক্‌শা করা হয়েছে। এর নিম্নভাগে আবার লম্বভাবে তিনটি আলংকারিক স্তরে বিন্যস্ত। ফাসাদে এ ধরনের আলংকারিক স্তর বিন্যাস নসরত শাহ্‌ কর্তৃক নির্মিত ইমারতে বহুল প্রচলিত ছিল। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের তোরণ (নি:১৫২৬) এবং কদম রসুল ইমারতের ফাসাদে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নির্মাণ উপাদানঃ

ইট ও পাথরের সমন্বয়ে নির্মিত তোরণটি সম্পূর্ণভাবে প্লাষ্টারকৃত। বর্তমানে এর উপর চুনকাম করা হয়েছে।

সাধারণ আলোচনাঃ

পুরাতন মালদহের জামি মসজিদের তোরণটি বাংলার তোরণ স্থাপত্যের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এতে সুলতানী ও মুঘল রীতির একত্র সন্নিবেশ ঘটেছে। উভয় রীতির এরূপ সন্নিবেশন থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া তোরণ সমেত এই জামী মসজিদটি প্রমাণ করে, এ স্থানটি সমসাময়িক কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বড় কাটরার তোরণ

অবস্থান ঃ

স্থান- চক বাজার, থানা- লালবাগ, ঢাকা।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘলদের সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে এ অঞ্চলে রাজকীয় মুঘল স্থাপত্য রীতি বিকাশ লাভ করে। বড় কাটরা ইমারতটি বাংলায় এই রীতির প্রাচীন নিদর্শণ হিসেবে টিকে আছে। এটি পুরাতন ঢাকার লালবাগ থানার অর্ন্তভূক্ত চক বাজারের দক্ষিণে অবস্থিত। এর অনতিদুরে ছোট কাটরা নামে অপর একটি ইমারত টিকে রয়েছে। সম্ভবত উক্ত কাটরা থেকে পার্থক্য করার জন্য এর নাম 'বড় কাটরা' করা হয়েছে। ইমারতটি এক সময় বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল এবং এর দক্ষিণ তোরণটি (চিত্র-৩৫) বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে নদীটি আরও দক্ষিণে সরে গেছে।

নির্মাণ কালঃ

বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণের কেন্দ্রীয় গম্বুজের অভ্যন্তরে এর নির্মাণকাল সংক্রান্ত একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর বিবরণ অনুযায়ী ইমারতটি ১০৫৩ হিজরী/১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-৫৮ খ্রিঃ) পুত্র তৎকালীন বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজার শাসনামলে ঢাকার তৎকালীন সেনাপতি ও প্রধান নির্মাতা (আমীর-ই-ইমারত) আবুল কাসেমের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে।[১৭৭] প্রচলিত আছে, ইমারতটি শাহ্ সুজার আবাসস্থল হিসেবে নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু সুবাদারের পছন্দ না

---

১৭৭. A.Karim, *Corpus*, p. 442.

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ায় তিনি তা আবুল কাসেমকে দান করেন।[১৭৮] শিলালিপির সাক্ষ্য থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তীতে তিনি এটিকে সরাইখানা (কাটরা) হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেন।[১৭৯]

বর্তমান অবস্থাঃ

আদি অবস্থায় কাটরাটি একটি চতুর্ভূজ উঠানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। পূর্বে এর উত্তর ও দক্ষিণে দুটি অত্যন্ত বিলাসবহুল তোরণ ছিল যার উত্তর দিকেরটি অন্যান্য স্থাপনাসমেত বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। পূর্ব ও দক্ষিণ বাহু বর্তমানে আধুনিক স্থাপনা দ্বারা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে যে নতুন স্থাপনা হতে পুরাতন স্থাপত্যসমূহ পার্থক্য করা অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি ইমারতটির দক্ষিণ বাহুতে যেটুকু এখনও টিকে রয়েছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এ অংশটি ছিল কাটরার সম্মুখভাগ। এই বাহুর সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন এবং জমকালো অংশ হলো এর কেন্দ্রে অবস্থিত বিশালাকার প্রবেশ তোরণটি। এটি মুঘলদের রাজকীয় তোরণ স্থাপত্যের সকল বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে এর অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগ বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট ও কারখানা নির্মাণ করে আদি অবস্থার বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ের প্রচেষ্টা[১৮০] সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর উপর সম্পূর্ণ স্বত্তাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।

---

১৭৮. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 219.

১৭৯. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা,* (আ.ম.ম.শরফুদ্দীন অনুদিত) ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১৯৭.

১৮০. C.B. Asher, Inventory Key Monument, *Ibid,* p.54.

Dhaka University Institutional Repository

বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণ

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

বড় কাটরার সবচেয়ে বৃহৎ এবং দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা হলো এর দক্ষিণ তোরণটি। এটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত একটি ত্রিত্বল বিশিষ্ট ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-১৩)। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ১২.৯০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২০.৫০ মিটার। এটি একটি দ্বিতল উচ্চতা বিশিষ্ট চতুর্কেন্দ্রিক খিলানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে যা অর্ধ-গম্বুজে আচ্ছাদিত একটি ইউয়ানে পরিণত হয়েছে। এরূপ পরিকল্পনা উত্তর ভারতে নির্মিত মুঘল তোরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। দিল্লীতে অবস্থিত সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি (১৫৬৫ খ্রিঃ) থেকে শুরু করে প্রায় সকল তোরণেই ত্রিত্বল ব্যবস্থাপনায় অর্ধ-গম্বুজের আচ্ছাদন বিশিষ্ট ইউয়ান রয়েছে। ফতেহ্পুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজা (১৫৬৮-৭৮ খ্রিঃ) এরূপ ব্যবস্থাপনার সবচাইতে জমকালো নিদর্শন। ইউয়ানের অভ্যন্তর ভাগে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত অপর একটি প্রবেশ খিলান পার হয়ে একটি চৌচালা ভল্ট আচ্ছাদিত অংশে প্রবেশ করতে হয়। এর পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে দুটি ক্ষুদ্র আয়তাকার কুলঙ্গী রয়েছে। পর পর দুটি খিলানকৃত পথ দ্বারা এগুলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এই সম্পূর্ণ অংশটি আবার ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এর উত্তরে একটি প্রশস্ত খিলান পেরিয়ে তোরণের মধ্যবর্তী গম্বুজাবৃত হল কক্ষে প্রবেশ করা যায়। কক্ষটি অষ্টভূজ পরিকল্পনায় নির্মিত এবং উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর খিলানপথ ব্যতিরেকে প্রত্যেক বাহুতে একটি করে কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো দুই ভাগে বিভক্ত এবং মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে সংযুক্ত খিলান পথ। তবে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম বাহুর অভ্যন্তর ভাগের কুলঙ্গী দুটি অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির এবং ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। হল কক্ষটি হতে উত্তরের খিলানকৃত পথ পেরিয়ে অপর একটি ইউয়ানে প্রবেশ করতে হয়। এটি দক্ষিণ ইউয়ানের ন্যায় অর্ধ-গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে খিলানপথ সম্বলিত আয়তকার কুলঙ্গী রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

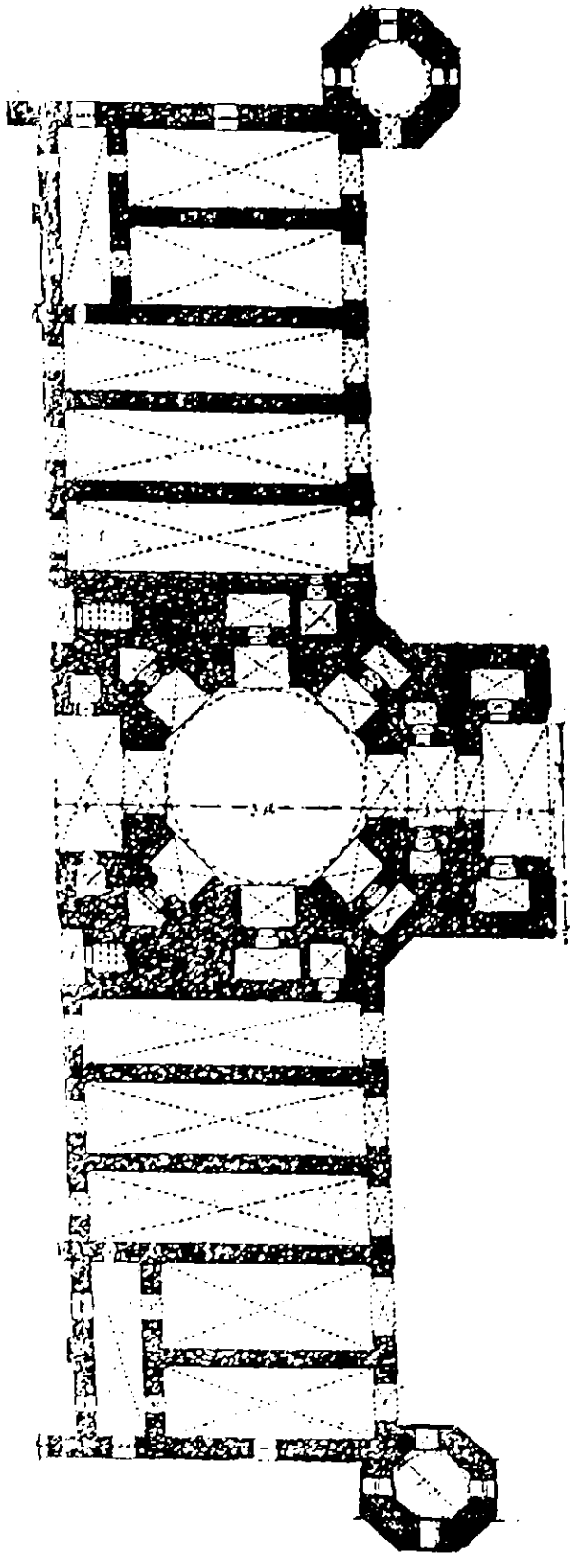

ভূমি পরিকল্পনা-১৩ঃ বড় কাটরার তোরণ

উঃ

0 100 200 সে.মি.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬৫: বড় কাটরার তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের উত্তর ফাসাদে ইউয়ানের উভয় পাশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে দুটি খিলান নির্মিত হয়েছে। এগুলোর অভ্যন্তরে উপরের তলায় উঠার জন্য রয়েছে সিঁড়ি পথ। পথটি তিনতলা পর্যন্ত উঠে গেছে এবং প্রত্যেকটি বাঁকের দেয়ালে দুটি করে বদ্ধ কুলঙ্গী রয়েছে। সম্পূর্ণ সিঁড়ি পথটি টানেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। দ্বিতীয় তলার কক্ষগুলো আবার ব্যারেল ভল্ট আচ্ছাদিত। এই অংশের কাঠামো কাটরার অন্যান্য অংশের সাথে মিশে গেছে। একই ভাবে এর উপরের তলায় বসবাসের জন্য কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

তোরণের পূর্ব ও পশ্চিমের ফাসাদ কাটরার অন্যান্য স্থাপনার সাথে সংযুক্ত। পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলো হতে এর দেয়ালে অবস্থিত দুটি কুলঙ্গীতে প্রবেশ করা গেলেও তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না।

অলংকরণঃ

কালের ধবংসাত্মক ছোবলে তোরণটির জৌলুস অনেকাংশেই লয় প্রাপ্ত। তবুও যেটুকু টিকে রয়েছে তা থেকে এর আলংকারিক প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তোরণটির অর্ধ-গম্বুজসমুহ ও কেন্দ্রীয় অষ্টকোণাকার হল ঘরের গম্বুজে প্লাষ্টারকৃত অগভীর মুকারনাস্ অলংকরণ (চিত্র-৩৬) এখনও বিদ্যমান। এ ধরনের অলংকরণ বাংলায় প্রথম ব্যবহার দেখা যায় পাটনায় নির্মিত সাইফ খানের মসজিদের (নির্মাণঃ ১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ) কেন্দ্রীয় মিহরাবে।[১৮১] সমসাময়িক কালে নির্মিত লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণ (নির্মাণঃ ১৭শ খ্রিষ্টাব্দ) ও কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে স্থাপিত মসজিদের প্রবেশদ্বার ও মিহরাব, ছাড়াও মুঘল যুগে পাটনায় নির্মিত মীর্জা মাসুমের মসজিদের মিহরাবও[১৮২] (নির্মাণঃ ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ) এরূপ অলংকরণে সজ্জিত। তোরণটির সর্বত্র প্যানেল নক্শার প্রাচুর্য রয়েছে। বর্গাকার ও আয়তকারে নির্মিত এই প্যানেলগুলো

---

১৮১. C.B. Asher, *Ibid*, p. 202.

১৮২. C.B. Asher, The Mughal and the Post Mughal Period, *Ibid*, p. 202.

Dhaka University Institutional Repository

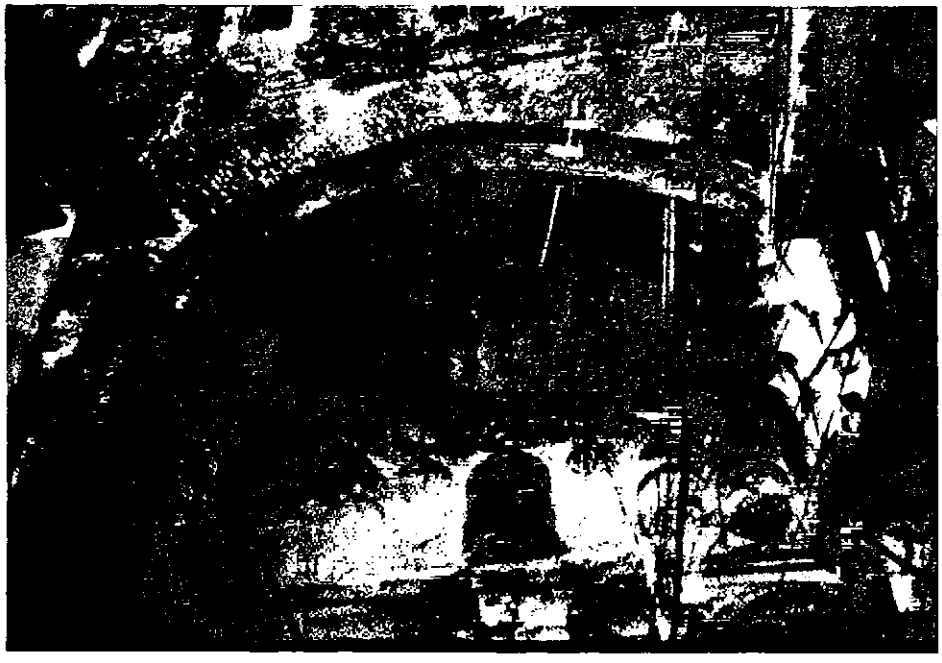

চিত্র-৩৬ঃ বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণের অর্ধ-গম্বুজ

Dhaka University Institutional Repository

আবার চর্তুকেন্দ্রিক, খাঁজকাটা, অশ্ব-খুরাকৃতি প্রভৃতি ধরনের অগভীর খিলান অলংকরণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। তোরণের প্রত্যেক তলার বিভাজন রেখায় অন্ধ মারলন নক্শা রয়েছে। অলংকরণে সকল ক্ষেত্রেই প্লাষ্টার কেটে নক্শা করা হয়েছে। তবে বর্তমানে এগুলো চিহ্নিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

নির্মাণ উপকরণঃ

বিশালাকার এই রাজকীয় তোরণটি নির্মাণে সর্বত্র ইটের ব্যবহার করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ইমারতটি এককালে প্লাষ্টারে আবৃত ছিল, যার বেশির ভাগই বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত।

সাধারণ আলোচনাঃ

বড় কাটরার তোরণটি বাংলায় মুঘল যুগে নির্মিত তোরণ স্থাপত্যের এক অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত। এর কাঠামোগত বিশালতা ও জটিল অবয়বের জন্য এটিকে উত্তর ভারতের মুঘল রীতির রাজকীয় তোরণ স্থাপত্যের উত্তরসূরী বললে অত্যুক্তি হবে না। এটি নির্মাণের ক্ষেত্রে, যে কেন্দ্রীয় অর্ধ-গম্বুজে আবৃত ইউয়ান, তিন তলা বিশিষ্ট অবয়ব, অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় হলঘর ও প্রহরী কক্ষ, অলংকরণে প্যানেল ও মুকারনাস্ নক্শার ব্যবহার মুঘলদের রাজকীয় তোরণ স্থাপত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় না হলেও তোরণটি বর্তমান বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে টিকে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

লুকোচুরি দরওয়াজা

অবস্থান:

গ্রাম: কনকপুর, পো: পিয়েস বাড়ি, থানা: ইংলিশ বাজার, জেলা: মালদহ।

লুকোচুরি দরজা নামে পরিচিত গৌড় দুর্গের অপর একটি তোরণ গোমতি দরজার ঠিক উত্তরে এবং কদম রসুল ইমারতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত (চিত্র-৩৭)। এটি গৌড় দুর্গের পূর্ব বাহুতে নির্মিত হয়েছে যেখানে দুর্গের দেয়ালটি অসমভাবে আরও অর্ধমাইল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।[১৮৩]

তোরণটির নামকরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আবিদ আলির মতে, 'লুকোচুরি' নামটি স্থানীয় এক ধরনের খেলা 'চিপ্পা-চুরি' (Chhippa Churi) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত নাম ছিল শাহ-ই-দরওয়াজা (King gate)।[১৮৪] কারণ শাহ সুজা দুর্গে প্রবেশের জন্য সাধারণত এই প্রবেশদ্বার ব্যবহার করতেন। কানিংহাম এই তোরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভুল করে গোমতি তোরণের সাথে মিলিয়ে ফেললেও একে 'লক্ষছিপ্পি দরওয়াজা' নামে অভিহিত করেন।[১৮৫]

---

১৮৩. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961A.D., p. 96, র‍্যাভেনশোর মানচিত্রে এর ঠিক উত্তরের দেয়ালটিকে কিছুটা বাঁকা করে দেখানো হয়েছে– Revenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878A.D., Plate-8.

১৮৪. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 68.

১৮৫. Canninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994 (reprint), vol. xv, p. 52.

Dhaka University Institutional Repository

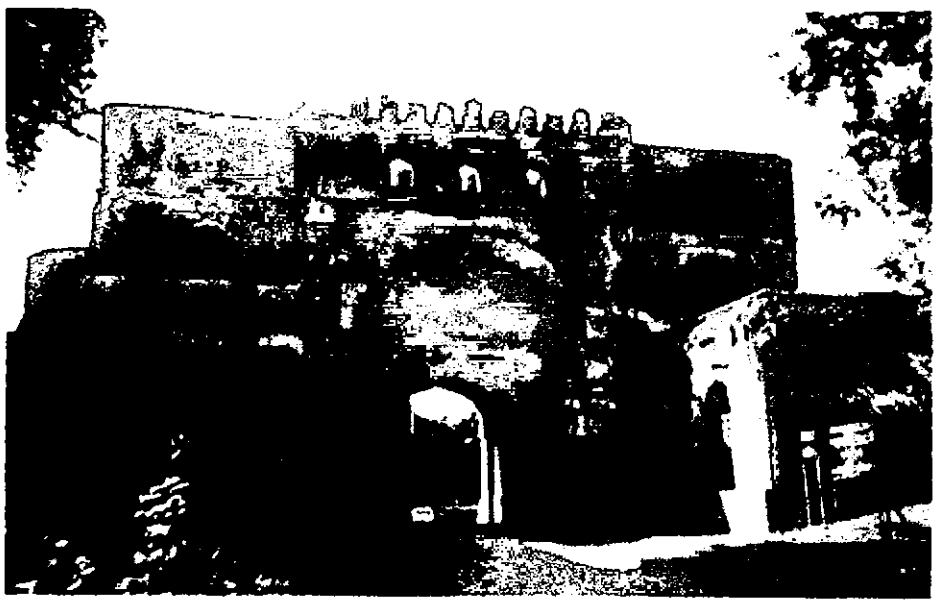

চিত্র ৩৭ঃ লুকোচুরি দরওয়াজা (সম্মুখ ফাসাদ)

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কাল:

গৌড়ের বেশিরভাগ ইমারতের ন্যায় এই তোরণেও শিলালিপি নেই। এর নির্মাণকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এলাহী বক্স একে হুসেন শাহ্ অথবা তাঁর পুত্র নসরত শাহের নির্মাণ বলে উল্লেখ করেন।[১৮৬] কিন্তু এর পরিকল্পনা, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণের সাথে উত্তর ভারত ও বাংলায় মুঘলগণ কর্তৃক নির্মিত তোরণসমূহের মিল থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইমারতটি মুঘল যুগে নির্মিত হয়েছে। হেনরী র‍্যাভেনশো এবং আবীদ আলী খানের মতে, আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ্ সুজা যখন গৌড়ে অবস্থান করছিলেন, তখন এ অঞ্চলের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি এই রাজকীয় তোরণটি নির্মাণ করেন।[১৮৭] অনিরুদ্ধ রায় মনে করেন, এটি শাহ্ সুজার নির্মাণ নয়।[১৮৮] তাঁর মতে, গৌড় নগর ততদিনে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল। এটি বরং ইতিপূর্বে মুনিম খান গৌড়ে বসবাসকালে নির্মাণ করেন। কিন্তু আহমদ হাসান দানী, ক্যাথারিন বি. আশারসহ বেশিরভাগ স্থাপত্য ঐতিহাসিক এর পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্যাদি এবং শাহ সুজার সময়কালের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তোরণটি শাহ্ সুজা কর্তৃক নির্মাণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১৮৯] যদিও আবীদ আলীর মতে, এটি ১৬৫৫ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছে, শিলালিপির অভাবে এর সঠিক নির্মাণ কাল জানা যায় না ।

---

১৮৬. Elahi Bakhsh, *Ibid,* (সূত্র- আ. করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী -১৯৯৪, পৃ. ১২৩।)

১৮৭. Revenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D., p. 69. Abid Ali Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p.68.

১৮৮. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-১৯৯৯ পৃ. ১৪৪।

১৮৯. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p. 259. C. B. Asher, Inventory key Monuments, *Ibid,* p.78.

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও স্থাপত্যশৈলীঃ

মুঘল যুগে বিকশিত তোরণ স্থাপত্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ইমারতটিও ত্রিতল পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে। এর সম্মুখভাগে কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের উভয় পাশে আয়তাকারে নির্মিত দুটি কক্ষ রয়েছে। এগুলোর সম্মুখভাগে কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার বরাবর তিনটি এবং পূর্ব বাহুতে একটি করে প্রবেশদ্বার রয়েছে । কক্ষগুলো সম্ভবত প্রহরীদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। কানিংহামের মতে, গৌড় নগরীকে সজীব রাখার জন্য এর উপরিভাগে 'নক্কর খানা' (Naqqar Khana) বা ড্রাম বাজানোর স্থান ছিল।[১৯০] প্রহরী কক্ষ ব্যতীত মূল তোরণটি আয়তাকারে নির্মিত। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ২২ মিটার এবং প্রস্থ ৫.৯৮ মিটার এবং কেন্দ্রে দ্বিতল উচ্চতা পর্যন্ত উত্থিত চতুর্কেন্দ্রিক বহুখাঁজ খিলান অর্ধ-গম্বুজ সমেত নির্মিত হয়েছে। এর নিম্নভাগে ৪.৫১ মিটার চওড়া এবং উভয় পার্শ্বে ৮৩ সে.মি. উঁচু ভিত নির্মিত হয়েছে। এগুলো পাথরের শ্লেব দ্বারা আবৃত। ভিতগুলো কেন নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে প্রহরী কক্ষের সাথে এর সংযুক্তির ফলে অনুমান করা যায়, এখানে দাঁড়িয়ে প্রহরীগণ শাসককে অভ্যর্থনা জানাতেন। ভিতের উপরিভাগে কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত গভীর দুটি কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কেও জানা যায় না। তোরণের কেন্দ্রিয় খিলানটি একটি বিরাটাকার আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে দ্বিতলসম উচ্চতা নিয়ে গঠিত। এর উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত তিনটি খিলানের একটি সারি রয়েছে। মধ্যবর্তী স্থানে মোল্ডিং দ্বারা এর বিভাজনকে স্পষ্ট করা হয়েছে। সর্বোচ্চে কাঙ্গুড়া নক্শা দ্বারা মুকুট দেয়া হয়েছে। এই সম্পূর্ণ অংশটি আবার উভয় পার্শ্বে নির্মিত সরু স্তম্ভ দ্বারা সীমায়িত। ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পাশের অংশ একই রীতিতে নির্মিত হয়েছে। এগুলোর নিম্নভাগে প্রহরী কক্ষ, দ্বিতীয় তলায় দুটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হয়েছে। প্রহরী কক্ষ কিংবা প্রহরী কক্ষের ছাদ থেকে এ অংশে প্রবেশ

---

১৯০. Canninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing house-1994(reprint), vol. xv, p. 51-52.

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। তবে এর অভ্যন্তর ভাগে কোন সিঁড়ির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। উপরিভাগের এই খিলানগুলো সম্ভবত তোরণের জানালা ছিল। এ অংশের উপরিভাগের স্তরে মধ্যবর্তী অংশের ন্যায় খিলান সারি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এগুলো অন্ধ ও অগভীর। প্যারাপেটটি সম্ভবত মধ্যবর্তী অংশের ন্যায় কাঙ্গুরা নক্শা দ্বারা সজ্জিত ছিল। বর্তমানে এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় বৃহৎ খিলানের নিম্নভাগে মূল প্রবেশ খিলানটি অবস্থিত। এটি ১০ ফুট চওড়া এবং কমপক্ষে ৩০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। আর, কে, চক্রবর্তীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, শাহ্ সুজা 'হাওদার' উপর বসে এর অভ্যন্তর দিয়ে প্রবেশ করতেন।[১৯১] খিলানটি দুটি পাথরের স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং একটি উদ্গত ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। তোরণের অভ্যন্তরভাগ আয়তাকার। পূর্ব-পশ্চিমে এর আয়তন ২.১৫ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২.৮৫ মিটার। এ অংশে কোন বাতি রাখার কুলঙ্গী কিংবা অন্য কোনরূপ স্থাপনা নেই। এর অভ্যন্তরভাগ একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান নয়।

তোরণের পশ্চিম ফাসাদ পূর্ব ফাসাদের রীতিতেই নির্মিত। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বৃহদাকার খিলানটি পূর্ব-পশ্চিমে ১.৩০ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব খিলান অপেক্ষা ৩৫ সে.মি. কম। ফলে এর অর্ধ-গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত কম গভীরতা নিয়ে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া তোরণের এই ফাসাদে প্রহরী কক্ষ না থাকায় এর ত্রিখিলান বিশিষ্ট অবয়ব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে (চিত্র-৩৮)। এখানে কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী খিলান দুটো (নিম্ন ভাগের) উপরিভাগের খিলান অপেক্ষা বৃহদাকারে নির্মিত হয়েছে এবং এগুলো দ্বারা তোরণের পার্শ্ববর্তী অংশের অভ্যন্তরে প্রবেশের দরজা রয়েছে। এরূপ খিলানের অভ্যন্তরে আয়তাকার প্রবেশ দ্বার লক্ষ্য করা যায় ঢাকার লালবাগ কমপ্লেক্সের উত্তর-পূর্ব তোরণের অভ্যন্তরীণ ফাসাদে। কেন্দ্রীয় খিলানের ন্যায় এ অংশগুলোও ফ্রেমের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছে। এর উভয় পাশে ফাসাদের কোণে সরু অষ্ট-

---

১৯১. R.K. Chakravarti, Notes on Gaur and Other Places in Bengal, in *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 1909 July, vol.N.7 N.S.

Dhaka University Institutional Repository

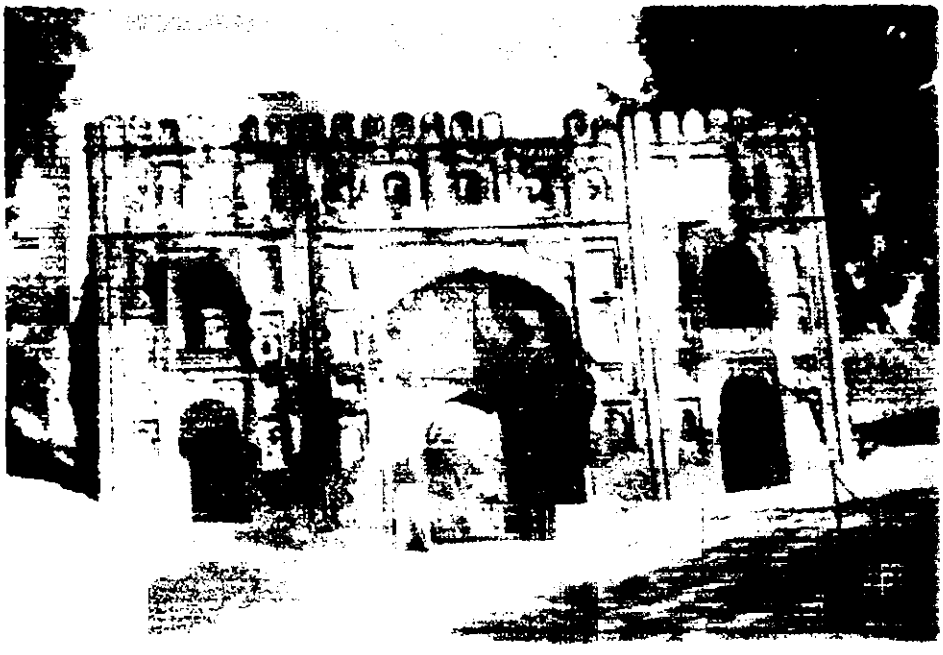

চিত্র-৩৮ঃ পশ্চিম ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

কোণাকার বুরুজ কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। এই ফাসাদের কার্নিশে সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে কাঙ্গুরা (Kangura) নক্শা এখনও টিকে রয়েছে।

তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ বাহু সমতল। তবে এ অংশগুলোতে এখনও দুর্গ দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ টিকে রয়েছে।

অলংকরণঃ

সম্পূর্ণ তোরণটি প্যানেল দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। এগুলো বর্গাকার এবং আয়তাকারে তোরণ ফাসাদের সর্বোত্র ছড়িয়ে আছে। খিলানের ফ্রেমগুলোর অভ্যন্তর ভাগ খাঁজকাটা, চতুর্কেন্দ্রিক, কৌণিক চতুর্কেন্দ্রিক প্রভৃতি নক্শা খিলানে সজ্জিত। তবে অলংকরণের বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাছাড়া তোরণের স্তরগুলোকে স্পষ্টকরণের জন্য মোল্ডিং নক্শা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ব্যবহৃত অল্প সংখ্যক পাথরে কিছু কিছু খোদাই নক্শা লক্ষ্য করা যায়। এগুলোতে ফুল ও পাতার অলংকরণ রয়েছে। তোরণের অন্যান্য অলংকরণের সাথে এর মিল পাওয়া যায় না। এই পাথরগুলো সম্ভবত পুরাতন ইমারত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

নির্মাণ উপাদানঃ

তোরণটি সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরী। তবে ভিত এবং খিলানের স্তম্ভ নির্মাণে কিছু কিছু পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ আলোচনাঃ

লুকোচুরি তোরণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি শাহ্ সুজার গৌড় দুর্গে বসবাসের অন্যতম সাক্ষ্য বহনকারী।

Dhaka University Institutional Repository

কদম রসুল ইমারতের তোরণ

অবস্থানঃ

গ্রাম-কনকপুর, পো-পিয়েস বাড়ি, থানা-ইংলিশ বাজার, জেলা-মালদহ।

গৌড় দুর্গের লোকচুরি দরওয়াজার ঠিক উত্তর দিকে মহানবীর (স:) পদচিহ্ন স্মরণে নির্মিত ইমারতটি 'কদম রসুল ইমারত' নামে পরিচিত। একটি দেয়াল ঘেরা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণে ইমারতটি অবস্থিত। এর পূর্ব দিকে দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য নির্মিত[১৯২] একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও কিছুটা দক্ষিণে ফতেহ্ শাহের সমাধি নামে পরিচিত দোচালা রীতিতে নির্মিত একটি ইমারত রয়েছে। এই কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশ তোরণ (চিত্র-৩৯) রয়েছে। এটি ফতেহ্ শাহের সমাধি বরাবর প্রাচীরের পশ্চিম বাহুতে অবস্থিত।

নির্মাণ কালঃ

তোরণ গাত্রে ৯০৯ হিঃ/ ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ কর্তৃক তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপি রয়েছে।[১৯৩] কিন্তু শিলালিপিটি এই তোরণের হতে পারে না। কেননা, কদম রসুর ইমারতের প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী ইমারতটি ৯৩৭ হিঃ/১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে নাসির উদ্দিন নসরত শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[১৯৪] ফলে কোন ইমারত নির্মাণের পূর্বে এর তোরণ নির্মাণ সম্ভব নয়। তাছাড়া তোরণটির স্থাপত্যিক রীতি একে মুঘল যুগের ইমারত হিসেবে প্রকাশ করছে। এর খিলান নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রবেশ খিলানের পার্শ্ববর্তী দেয়ালের প্যানেল নক্শার সাথে নিকটবর্তী লুকোচুরি দরওয়াজার সাথে মিল রয়েছে। এরূপ হতে পারে এই কমপ্লেক্সের

---

১৯২. A. A. Khan, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p. 64.
১৯৩. A. Karim, *Corpus,* p. 259.
১৯৪. A. Karim, *Corpus,* p. 356.

Dhaka University Institutional Repository

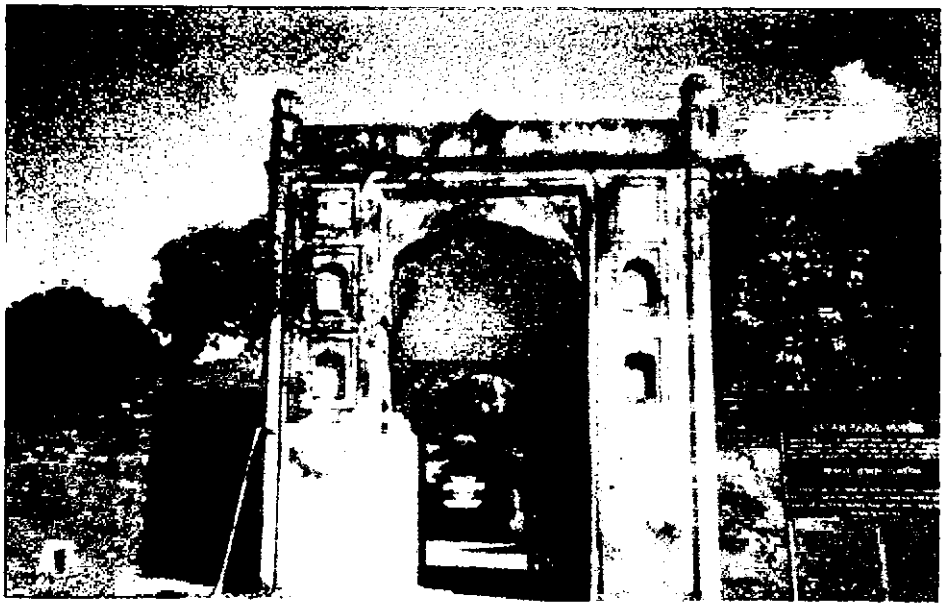

চিত্র-৩৯ঃ কদম রসুল কমপ্লেক্সের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তর ভাগে দর্শনার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার এবং ফতেহ শাহের সমাধি নির্মাণের সমসাময়িক কালে তোরণটি নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া সমাধির মুঘল রীতির অবয়ব এবং এর ফাসাদে ব্যবহৃত কুলঙ্গীর সাথে তোরণ ফাসাদের গভীর কুলঙ্গী নির্মাণের মিল এ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ দেয়।

বর্তমান অবস্থাঃ

তোরণটি আদি পরিকল্পনা নিয়ে টিকে আছে। এর প্রবেশ খিলান ও অভ্যন্তর ভাগের কুলঙ্গীগুলোতে সম্প্রতিকালে সংস্কার করা হলেও খিলানের আকৃতিগত কিছুটা পরিবর্তন ব্যতীত তেমন কোন বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন আনা হয়নি। বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে প্লাষ্টার উঠে গেছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

সার্বিক পরিকল্পনায় তোরণটি আয়তাকার (ভূমি পরিকল্পনা- ১৪)। এর দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৫.১০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৯৩ মিটার এবং কেন্দ্রে বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান অর্ধ-গম্বুজ সমেত নির্মিত হয়েছে। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ১.৩৬ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১.৪০ মিটার প্রশস্ত। খিলানটি তিনটি প্যানেল নক্শায় অলংকৃত ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত। এগুলোর মধ্যে নিম্নভাগের খিলান দুটি নক্শাকৃত গভীর কুলঙ্গী এবং উপরিভাগেরটি আয়তাকার ও নক্শাবিহীন। তোরণের উপরিভাগের কার্নিশে মোল্ডিংযুক্ত প্যারাপ্যাট সরলভাবে নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলান ফ্রেমের উভয় পাশে উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুটি সরু অষ্ট-কোণাকার বুরুজ রয়েছে। এগুলো পদ্ম পাপড়ির ড্রামের উপর নির্মিত ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ দ্বারা সজ্জিত।

তোরণের গম্বুজাবৃত অংশের নিম্ন ভাগের উভয় পাশে দুটি খিলানকৃত কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো ৬৯ সে.মি. প্রশস্ত ও ২.৩০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং বর্হিফাসাদ হতে ৪৭ সে.মি. অভ্যন্তরে অবস্থিত। উভয় কুলঙ্গীরই অভ্যন্তরভাগের দেয়ালে একটি

Dhaka University Institutional Repository

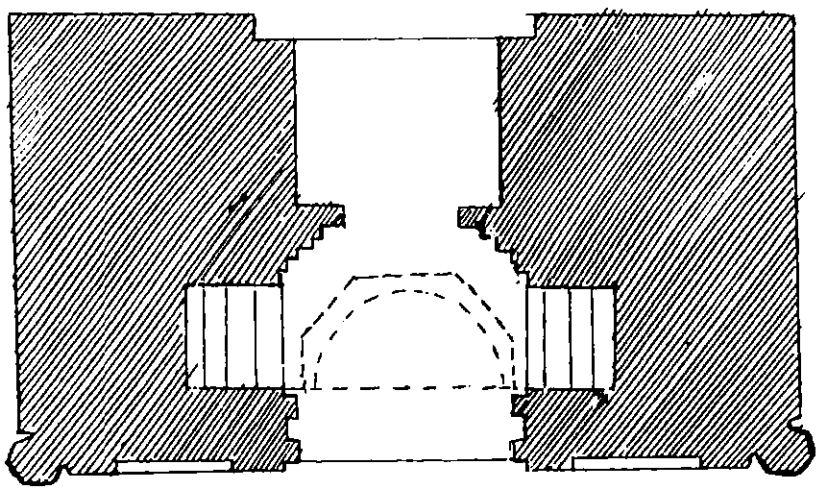

ভূমি পরিকল্পনা-১৪ ঃ কদম রসুল কমপ্লেক্সের তোরণ

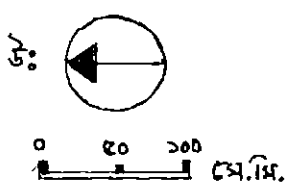

Dhaka University Institutional Repository

করে ক্ষুদ্রাকার কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলোতে সম্ভবত বাতি রাখা হতো। তবে এই বৃহাদাকার কুলঙ্গীগুলো কি কাজে ব্যবহৃত হতো জানা যায় না।

তোরণের কৌণিক প্রবেশ খিলানটি একটি ফ্রেমের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছে। খিলানের উভয় দিকের বাহু পাথরের এবং উপরিভাগ ইটের সমন্বয়ে গঠিত। এরূপ ইট ও পাথরের সমন্বয়ে খিলান নির্মাণ প্রক্রিয়া পার্শ্ববর্তী লুকোচুরি দরওয়াজায় লক্ষ্য করা যায়। এই খিলানটি পেড়িয়ে উত্তর-দক্ষিণে ১.৮৭ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১.০৩ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি প্রশস্ত খিলানে প্রবেশ করা যায়। বর্তমানে খিলানটির প্রকৃত অবয়ব কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে।

তোরণের পূর্ব ফাসাদ পশ্চিম ফাসাদের ন্যায় অর্ধ-গম্বুজ বিশিষ্ট খিলান এবং প্যানেলকৃত ফ্রেম সম্বলিত না হয়ে কেন্দ্রীয় খিলান সম্বলিত একটি অলংকরণ বিহীন অবয়ব নিয়ে গঠিত হয়েছে (চিত্র-৪০)। এর উপরিভাগে অষ্ট-কোণাকার ড্রামের উপর নির্মিত একটি অর্ধ-গম্বুজ রয়েছে। তোরণের সম্মুখ ফাসাদের দিক থেকে এটি দৃশ্যমান নয়। তবে অভ্যন্তর ভাগ থেকে নীচু এবং ক্ষুদ্রাকার গম্বুজটি দৃশ্যমান। এটিকে একটি আলংকারিক গম্বুজ বলা যায়। কারণ তোরণের অভ্যন্তর ভাগে থেকে এটি দেখা যায় না। এই ফাসাদের কার্নিশে কোন প্যারাপ্যাটও লক্ষ্য করা যায় না।

তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে কমপ্লেক্সের বহির্দেয়াল ৮ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে। বহির্দেয়ালটি সমসাময়িক বলেই মনে হয়।

অলংকরণঃ

মুঘল যুগের সাধারণ প্যানেল অলংকরণ দ্বারা এর সম্মুখ ফাসাদ সজ্জিত করা হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগে প্রহরী কক্ষের উপরি ভাগে দুটি আয়তাকার প্যানেল ব্যতীত তোরণটিতে আর কোন সজ্জা ব্যবহার করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪০ঃ তোরণের আভ্যন্তরীণ ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ উপকরণঃ

ইমারতটি নির্মাণে ইটের ব্যবহার সর্বাধিক। তবে খিলানে অল্প পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। সম্পূর্ণ ইমারতটি প্লাষ্টারকৃত।

সাধারণ আলোচনাঃ

কদম রসুল ইমারতের তোরণটি এই কমপ্লেক্সের পরবর্তী সংযোজন এবং মুঘল নির্মাণের অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

সুজানগর, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা।

কুমিল্লা অঞ্চলটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নাগরিক সভ্যতার সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলোর অন্যতম। প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হিসেবে বিকশিত এ অঞ্চলে গুপ্ত, রাত, চন্দ্র, খরগ প্রভৃতি শাসকগোষ্ঠির অধীনে প্রাক-মুসলিম যুগে যে ইট ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়, লালমাই-ময়নামতির শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া চারপত্র মুড়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদ থেকে। তবে ঠিক কবে এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জানা যায় না। 'রাজমালা'র বর্ণনামতে, সুলতান মগিসুদ্দিন আবুল মোজাফ্ফর ইলিয়াছ শাহ্ সর্বপ্রথম (১৩৪৭ খ্রিঃ) ত্রিপুরা আক্রমন করেন এবং সে সময় হতে এখানে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।[১৯৫] রাজা টোডরমলের ওয়াসিল তুমারজমায় ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তি থেকে ধারণা করা যায়, বাংলায় মুঘল শাসনের প্রাথমিক পযার্য়ে সম্ভবত এ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সুলতানী আমলের কোন ইমারত এখন আর টিকে নেই। যে কয়েকটি ইমারত মুসলিম শাসনের ইতিহাস বহন করে টিকে আছে তার সবগুলোই মুঘল যুগে নির্মিত। কুমিল্লা সদরে অবস্থিত তোরণ সম্বলিত শাহ্ সুজা মসজিদটি টিকে থাকা নিদর্শনসমুহের অন্যতম। অপরিকল্পিত সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের স্বীকার হয়ে মসজিদটির স্বকীয়তা অনেকটাই হারিয়ে গেছে (চিত্র-৪১)। তবুও আদি পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্যাদির কিছু এর মধ্যেই খুজে পাওয়া যায়।

---

১৯৫. শ্রী কৈলাশচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষরঃ আগরতলা, ত্রিপুরা- ১৪০৫ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪১৪ শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণ(সম্মুখভাগ)

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকালঃ

তোরণগাত্রে এর নির্মাণকাল ১৬৫৮ খ্রিঃ উল্লেখ থাকলেও এর পক্ষে শিলালিপি কিংবা তথ্যগত কোন ভিত্তি নেই। 'রাজমালা'য় মসজিদের নির্মাণ সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়, প্রথমটি হলো, মুঘল সুবেদার শাহ্ সুজা তাঁর ত্রিপুরা বিজয় স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয় মতানুযায়ী, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য সুজার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য নিমচা তরবারি ও হীরকাঙ্গরীয়ের বিনিময়ে বহু অর্থ ব্যয় করে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[১৯৬] তবে এ দুটোর মধ্যে প্রথমটি অধিক সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। এর আশেপাশের অঞ্চল সম্ভবত তাঁর নামানুসারেই সুজাগঞ্জ নামকরণ করা হয়।

বর্তমান অবস্থাঃ

বাহ্যিক অবয়বে মসজিদটিকে আধুনিক নির্মাণ বলে মনে হয়। অন্যান্য মসজিদের ন্যায় তোরণটি এর কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলান বরাবর বহির্প্রাচীরের পূর্ব বাহুতে নির্মিত হয়েছিল, বর্তমানে সম্মুখের অঙ্গন মূল অংশের সাথে মিশে গেছে এবং তোরণটি এর একমাত্র প্রবেশদ্বারে পরিনত হয়েছে। এতে পরবর্তী সংস্কার ও সম্প্রসারণের ছাপও রয়েছে। এর আচ্ছাদনের উপরিভাগের ক্ষুদ্র গম্বুজাবৃত প্যাভিলিয়ন, কার্নিশে জালি নক্শার রেলিং এবং ইউয়ানের খিলানপত্রে (key stone) পদ্ম ফুলের আসনে করা ক্ষুদ্র বারান্দা, কার্নিশ হতে বহু উপরে উঠে যাওয়া কোণা বুরুজ, সাদা ও বিভিন্ন রঙ এর সজ্জা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে পরবর্তী সম্প্রসারণ হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কেননা এরূপ বৈশিষ্ট্য মুঘল যুগে নির্মিত অন্য কোন তোরণে লক্ষ্য করা যায় না। তবে এর সম্মুখ ফাসাদের কেন্দ্রীয় ইউয়ান, অভ্যন্তরের তিন খিলান বিশিষ্ট অবয়ব এবং পার্শ্ববর্তী খিলানের অভ্যন্তরে সিঁড়ি দ্বারা ছাদে উঠার ব্যবস্থা-এর পরিকল্পনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আদি অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে।

১৯৬.শ্রী কৈলাশচন্দ্র সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীঃ

পরিকল্পনায় আয়তাকার এই তোরণের বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে ৬.৭৪ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৭০ মিটার (ভুমি পরিকল্পনা-১৫)। এর পূর্ব ফাসাদের কেন্দ্রে রয়েছে ৩ মিটার প্রশস্ত ও ১.৫০ মিটার গভীর ইউয়ান। প্যানেল নক্শায় পূর্ণ একটি আয়তাকার ফ্রেম একে সীমায়িত করেছে এবং তোরণের উভয় কোণে রয়েছে সংযুক্ত বুরুজ। ইউয়ানের কেন্দ্রে ১.১০ মিটার বিস্তৃত মূল প্রবেশ খিলানটি স্থাপিত। এটি একটি পশ্চিম ফাসাদের টানেল ভল্টে আচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় খিলানে গিয়ে মিশেছে। এই ফাসাদটি পূর্ব ফাসাদের ন্যায় একক ইউয়ান বিশিষ্ট না হয়ে তিন খিলানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে যে আয়তাকার পিয়ার রয়েছে তা ফ্রেমের ভূমিকা পালন করছে (চিত্র-৪২)। অভ্যন্তরের ফাসাদের এরূপ তিন খিলানের অবয়ব ঢাকার লালবাগ কমপ্লেক্সের উত্তর ও দক্ষিণ তোরণে, হাজী খাজা শাহবাজ কমপ্লেক্সের তোরণে লক্ষ্য করা যায়। হাজী খাজা শাহবাজের তোরণের ন্যায় এর পার্শ্ববর্তী খিলানে সিঁড়ি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সিঁড়িটি শুধুমাত্র উত্তর খিলানে উপস্থিত। এ বৈশিষ্ট্যটি মুঘল যুগের টিকে থাকা মসজিদের প্রায় সব তোরণে লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত ধারণানুযায়ী, তোরণের ছাদ থেকে আজানের ব্যবস্থা থাকায় এর উপরে উঠার জন্য সিঁড়ি নির্মিত হতো। ঢাকার মুহাম্মদপুরে স্থাপিত সাত গম্বুজ মসজিদের তোরণের অভ্যন্তরে সিঁড়ি না থাকলেও বাইরের দিকে উভয় পাশে যে সিঁড়ি রয়েছে তা এই ধারণাকে আরও যুক্তিযুক্ত করে। তবে সুলতানী যুগে নির্মিত বাগেরহাটের খান জাহানের কমপ্লেক্সের তোরণসমূহ এবং ষাট গম্বুজ মসজিদের তোরণে পাখার ন্যায় উভয় পাশে অবস্থিত সিঁড়ি ব্যতীত অন্য কোন তোরণে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় না। সুলতানী মসজিদের তোরণের ছাদ সাধারণত কিছুটা বক্রাকারে নির্মিত হতো বিধায় সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যটি তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। অন্যদিকে মুঘল তোরণগুলোর ছাদ সমতল হওয়ায় এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া সহজ ছিল। যাহোক বর্তমানে ছাদের উপরিভাগে যে গম্বুজাবৃত প্যাভিলিয়ন ও রেলিং রয়েছে তা সাম্প্রতিককালের সংযোজন।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি পরিকল্পনা-১৫ঃ শাহ সুজা মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

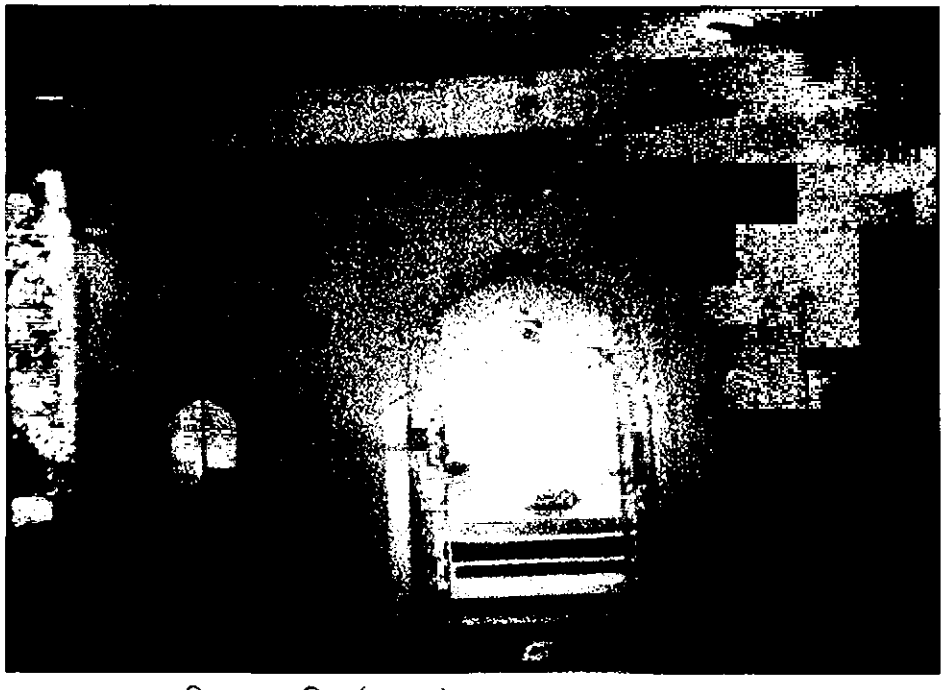

চিত্র-৪২ঃ পশ্চিম (অভ্যন্তর)ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

আদি অলংকরণের তেমন কিছুই তোরণে বিদ্যমান নেই। এর গায়ে যে প্লাষ্টার এবং বিভিন্ন রঙ এর সজ্জা রয়েছে তা সাম্প্রতিক। খিলান ফ্রেমের প্যানেলগুলো আদি মনে হলেও এগুলোর অভ্যন্তরের বিভিন্ন নক্শা পরবর্তীকালের বলেই মনে হয়।

সাধারণ আলোচনাঃ

শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণটি কুমিল্লায় মুঘল শাসনের সাক্ষ্য বহন করছে। মুঘল সুবাদার শাহ সুজার নামের সাথে এ অঞ্চলের ও মসজিদের নামকরণের মিল একে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী একটি নিদর্শনে পরিণত করেছে, যাকে ঘিরে একটি নাগরিক সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হাজীগঞ্জ দুর্গের তোরণ

অবস্থান ঃ

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, থানা: নারায়ণগঞ্জ সদর, মৌজা: হাজীগঞ্জ।

হাজীগঞ্জ দুর্গটি রাজধানী ঢাকা থেকে ১৫.৭৫ কিলো মিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং নারায়ণগঞ্জ সদরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে এ স্থানটি শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গার সঙ্গমস্থল ছিল এবং এর নাম ছিল খিজিরপুর। এ স্থানের নামানুসারে দুর্গটি 'খিজিরপুর দুর্গ' নামে পরিচিতি লাভ করে (চিত্র-৪৩)।[১৯৭]

নির্মাণ কালঃ

দুর্গটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি বিধায় এর সঠিক নির্মাণ কাল সম্পর্কে জানা যায় না। রহমান আলী তায়েশের মতে, আরাকানী মগদের আক্রমন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মীর জুমলা ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেছিলেন।[১৯৮] সৈয়দ আওলাদ হাসান, আব্দুল করিম, সৈয়দ মাহমুদূল হাসান সহ প্রায় সকল স্থাপত্য ঐতিহাসিক পূর্ববর্তীর মত সমর্থন করেন।[১৯৯] কিন্তু এস.এম. তাইফুর এবং এ.এইচ. দানী ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাইফুরের মতে, মীর জুমলার বাংলায় আগমনের পূর্ব হতেই দুর্গটি মুঘল সৈন্যদের আবাস স্থল ছিল।[২০০] এ.এইচ. দানীর মতে, ইসলাম খাঁন

---

১৯৭. Dr. Ayesha Begum, *Forts in Medieval Bengal, An Architectural Study*, Vol-Text,(Unpublished Ph.D. Thesis) Rajshahi-1992 A.D., p. 341.

১৯৮. রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৬২.

১৯৯. Sayid Aulad Hasad, *Notes on the Antiquites of Dacca*, Dacca, M.M.Bysak,1904. p.58. Abdul Karim,*Dhaka Past Present Future*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987 A.D. p.101. Sayeed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987 A.D. p.101-102.

২০০. Taifur, *Glimpses of Old Dacca*, Dacca, Lulu Bilkis Banu, 1956 A.D. p. 137.

Dhaka University Institutional Repository

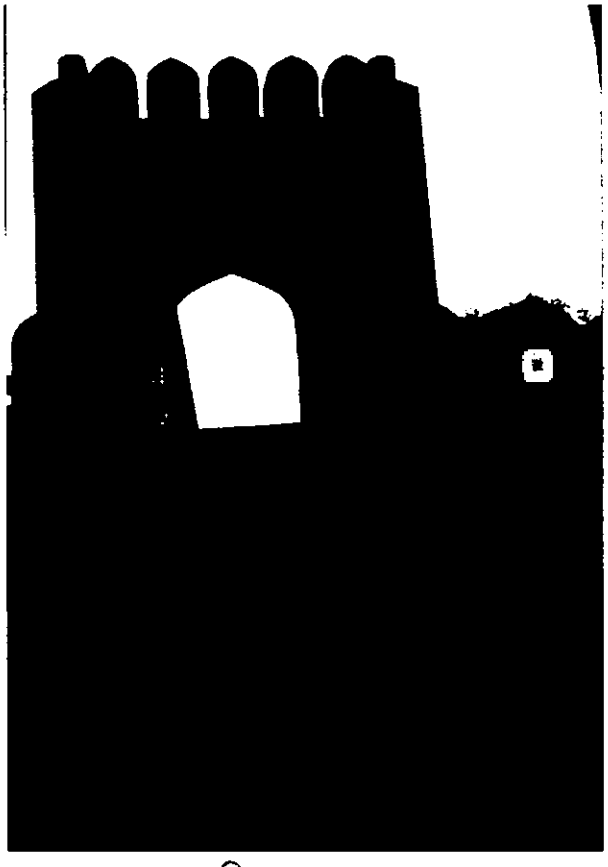

চিত্র-৪৩ঃ
হাজিগঞ্জ দুর্গের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের পর খিজিরপুর দুর্গটি নির্মাণ করেন।[২০১] তবে তাদের মতের সমর্থনে কোন আকর উৎসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক উৎস 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী ' ও 'আকবর নামা' গ্রন্থের বিবরণে মুঘল বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের পূর্ব হতে এ স্থানে দুর্গের অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০২] তাছাড়া খিজিরপুর অঞ্চলটি ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র মুসা খাঁনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ছিল।[২০৩] তবে বর্তমান দুর্গ যে ১৭শ শতকে নির্মিত হয়েছিল এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

বর্তমান অবস্থা ঃ

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত "List of Ancient Monuments in Bengal" গ্রন্থে এ দুর্গের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বেষ্টনী প্রাচীর ও মাত্র একটি দুর্গ বুরুজের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৪] মূনশী রহমান আলী তায়েশ, এর অভ্যন্তরের প্রাচীর ও মিনার (সম্ভবত দুর্গ বুরুজ) রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[২০৫] ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে এটি তৎকালীন 'প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ' কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে গৃহীত হয়।[২০৬] এরপর হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত দুর্গটি বহুবার

---

২০১. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 225. List of the Ancient Monuments in Bengal, Revised and Corrected upto the thirty first August,1895 A.D.Calcatta, PublicWorks Department, Govt. of Bengal: 1890 A.D. p. 107.

২০২. মীর্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী,* ১ম খন্ড, (খালেকদাদ চৌধুরী কতৃক অনুদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৬৮-৬৯. Abul Fazal, *Akbar Nama*, (Translated by Bevaridge) vol-lll. p.648-49.

২০৩. Habiba khatun, *In Quist of Katrabo,* Jurnal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1986 A.D. p. 37-40.

২০৪. *List of the Ancient Monuments in Bengal*, Revised and Corrected upto the thirty first August,1895 A.D.Calcatta, PublicWorks Department, Govt. of Bengal: 1890 A.D. p. 107.

২০৫. রহমান আলী তায়েশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩.

২০৬. *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh*, Department of Archaeology and Museum, Dhaka, 1975 A.D. p. 11.

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার করা হয়েছে। তবে সমগ্র ইমারতটি তার নিজস্ব আদি ভূমি নক্শায় দন্ডায়মান রয়েছে (প্লেট-ঘ)।

পরিকল্পনা ও বিবরণ ঃ

ষষ্ঠভূজ পরিকল্পনার দুর্গটির সর্ববৃহৎ নির্মাণ হলো এর উত্তর বাহুর প্রবেশ তোরণ। এটি সরল আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত (ভূমি পরিকল্পনা-১৬)। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৬.১০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩ মিটার। ভূমি হতে সিঁড়ির সাহায্যে এর কেন্দ্রীয় খিলানে পৌছানো হয়। তোরণের ভিতরে ও বাইরে একই রকম সিঁড়ি রয়েছে। অভ্যন্তর ভাগে এর সংখ্যা ৮ টি হলেও বাইরের দিকে অনেক বেশী। বাইরের সিঁড়ির এর দৈর্ঘ্য ৭.৭৫ মিটার এবং এ অংশটি উভয় পাশে প্রশস্ত প্রতিরক্ষা দেয়াল রয়েছে।

প্রবেশ পথটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট। এর পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ২.০৯ মিটার এবং ঘনত্ব ৭১ সে.মি.। খিলানটি আয়তকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত। তোরণের কার্নিশে মোল্ডিং নক্শার উপরে পদ্ম পাপড়ির ন্যায় মারলন রয়েছে। এগুলো সংখ্যায় ৫টি এবং প্রত্যেকটির গায়ে রয়েছে শর ছিদ্র। প্রবেশ খিলানের উপরিভাগে একটি সরু ও অপেক্ষাকৃত গভীর প্যানেল রয়েছে। এ স্থানে সম্ভবত দুর্গের শিলালিপি ছিল যা বর্তমানে নেই। তোরণটি উভয় দিকে সরু সংযুক্ত বুরুজ দ্বারা সীমায়িত। এগুলো তোরণের উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে এবং এর পার্শ্ববর্তী স্থানে নির্মিত আয়তকার পিলাষ্টারও তোরণের সমউচ্চতায় দন্ডায়মান। এগুলোর গাত্রে কার্নিশ পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি করে সরু প্যানেল রয়েছে। পিলাষ্টারের পাশে দুর্গবাহুর মারলনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে অর্ধ-মারলন নির্মাণ করা হয়েছে এবং পিলাষ্টারসহ এ অংশটি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।

তোরণের অভ্যন্তর ভাগ খিলান ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ২.৫০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১.৪৫ মিটার। তোরণের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে

Dhaka University Institutional Repository

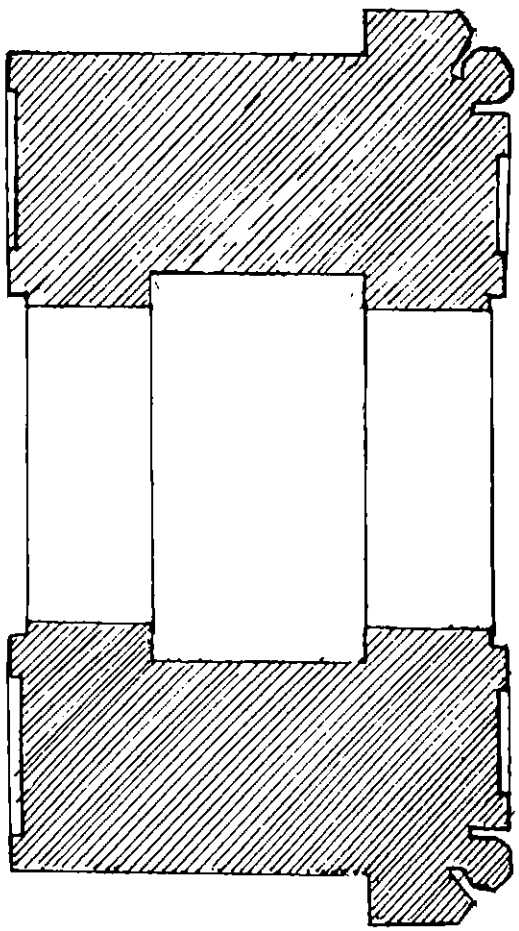

ভূমি পরিকল্পনা-১৬ঃ হাজীগঞ্জ দুর্গের তোরণ

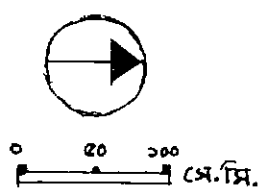

Dhaka University Institutional Repository

একটি করে ক্ষুদ্রাকার কুলঙ্গী ব্যতীত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এই কুলঙ্গীগুলো সম্ভবত বাতি রাখার কাজে ব্যবহৃত হতো।

সম্মুখভাগের সিড়ির রেলিং ব্যতীত তোরণের দক্ষিণ ফাসাদের অবয়ব অনেকটা উত্তর ফাসাদের অনুরূপ (চিত্র-৪৪)। এর কেন্দ্রে রয়েছে একই পরিমাপের চতুর্কেন্দ্রিক প্রবেশ খিলান যা প্যানেল বিশিষ্ট ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। তবে উত্তর ফাসাদের ন্যায় এই ফাসাদটিতে কোন সংযুক্ত বুরুজ কিংবা পিলাষ্টার নেই। তাছাড়া কার্নিশের উপরিভাগে মারলন নক্শার অবস্থানও লক্ষ্য করা যায় না। তোরণের পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদ দুর্গের বাহুর সাথে মিশে গেছে।

নির্মাণ উপকরণঃ

হাজীগঞ্জ দুর্গের তোরণটি সামগ্রিক ভাবে ইটের তৈরী এবং প্লাষ্টারকৃত।

অলংকরণঃ

তোরণটির অলংকরণে মুঘল রীতির প্যানেল নক্শার ব্যবহার দেখা যায়। এগুলো খিলান ফ্রেমে ও ফাসাদে বিভিন্ন ধরনের আলংকারিক খাঁজখিলান দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। অনুরূপ খাঁজ খিলানের নক্শাসমেত প্যানেল অলংকরণ নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানাধীন সোনাকান্দা দুর্গের (১৭শ শতক) ফাসাদ, ঢাকার লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণের (১৭শ শতক) ফাসাদ এবং লালবাগ দুর্গ মসজিদের (১৬৪৯ খিষ্টাব্দ) ফাসাদে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তোরণের কার্নিশে শরছিদ্র বিশিষ্ট মারলন নকশা রয়েছে।

সাধারণ আলোচনাঃ

হাজীগঞ্জ দুর্গের তোরণটির পরিকল্পনা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এটি দুর্গের প্রতিরক্ষা অপেক্ষা আলংকারিক উদ্দেশ্যে নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

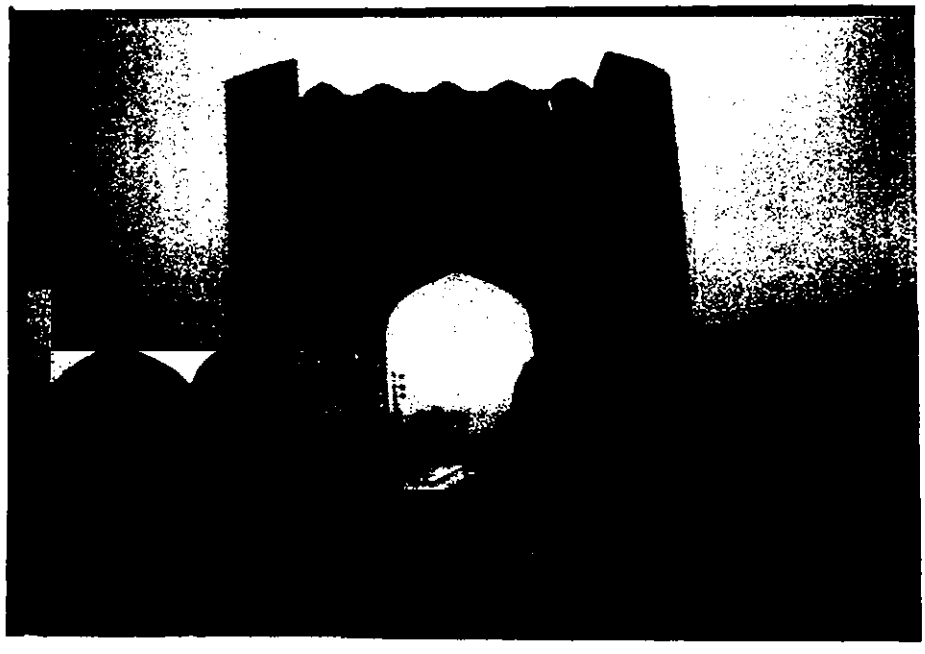

চিত্র-৪৪ঃ অভ্যন্তরের ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কেননা, এখানে কোন প্রহরী কক্ষ নেই এবং এর পরিকল্পনা লালবাগ কমপ্লেক্সের তোরণের ন্যায় জটিল নয়। সমসাময়িককালে বাংলায় প্রতিরক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জলদুর্গ ব্যবহৃত হলেও তোরণ অপেক্ষা প্রাচীর বরুজের ভূমিকা ছিল মূখ্য। কেননা, বুরুজে বসানো কামানের মাধ্যমে নদীরপথে আগত শত্রুদের মোকাবেলা করা হতো। তবে নদী তীরে এ ধরনের আলংকারিক তোরণ নৌপথে যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সোনাকান্দা দুর্গের তোরণ

অবস্থানঃ

গ্রামঃ এনায়েত নগর, ইউনিয়নঃ কোলগাছিয়া, থানাঃ বন্দর, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।

সোনাকান্দা দুর্গটি শীতলক্ষ্যার পূর্ব দিকে ও ধলেশ্বরী নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। দুর্গটি এক সময় শীতলক্ষ্যা ও পুরাতন বুড়িগঙ্গার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল[২০৭] এবং এর প্রধান বুরুজটি শীতলক্ষ্যার তীর ঘেঁষে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে নদীর গতি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং দুর্গটির চারপাশে প্রচুর বসতি গড়ে উঠেছে। দুর্গ হতে মাত্র ১.৫০ কি.মি. দক্ষিণে বাবা সালেহের মসজিদ ও মাজার রয়েছে।

নির্মাণ কালঃ

অন্যান্য জল দুর্গের ন্যায় সোনাকান্দা দুর্গে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি । ফলে এর নির্মাণকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত মতানুযায়ী, এটি বাংলার সুবেদার মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩ খ্রি:) কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[২০৮] কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত হাজীগঞ্জ দুর্গ ও মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত ইদ্রাকপুর দুর্গের সাথে স্থাপত্যিক এবং পরিকল্পনাগত মিল থাকার কারণে এটি ১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

---

২০৭. A.H.Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961A.D. p,226. A.B.M.Hussain (edt.), *Sonargaon-Panam*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997 A.D. p. 82.

২০৮. S.M.Taifoor, *Glimpses of Old Dacca,* Dacca: Lulu Bilkis Banu, 1956 A.D. p. 137.

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ হাসান দানীর মতে, এটি সম্ভবত হাজীগঞ্জ দুর্গের সমসাময়িক কালেই নির্মাণ করা হয়েছে।[২০৯]

বর্তমান অবস্থাঃ

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে বহুবার দুর্গটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে।[২১০] ফলে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও আদি অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

সোনাকান্দা দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি আয়তাকার পরিকল্পনার নির্মাণ। এর চার কোণে প্রাচীর বুরুজ ছাড়াও পশ্চিম বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে বিরাটাকার প্রধান বুরুজ। দুর্গের একমাত্র প্রবেশ তোরণটি এর উত্তর বাহুর কেন্দ্রে অবস্থিত। এটি অনেকটা ষড়ভূজ পরিকল্পনায় নির্মিত (ভূমি পরিকল্পনা-১৭)। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ১০.৩৭ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩.৪১মিটার। সর্বোচ্চে অবস্থিত মারলনসহ তোরণটির সামগ্রিক উচ্চতা ৫.৮০ মিটার। এর বহির্ফাসাদ তিন খিলানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে (চিত্র-৪৫)। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানটির দ্বারা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ২.৪৪ মিটার বিস্তৃত এবং ৩.৩৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। খিলানের ঘনত্ব ১.২২ মিটার। চতুর্কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় নির্মিত এই খিলানটি একটি প্যানেল বিশিষ্ট আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত। খিলানসহ কাঠামোর বিস্তৃতি পূর্ব-পশ্চিমে ৪.৮৮মিটার। এর প্যানেলগুলো সাধারণত ১০ সে.মি. গভীর হলেও খিলানের শীর্ষ বিন্দু বরাবর উপরিভাগে অবস্থিত প্যানেলের গভীরতা কমপক্ষে

---

২০৯. A.H.Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 226.

২১০. *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh*, Department of Archaeology and Museum, Dacca-1975 A.D. p. 12.

Dhaka University Institutional Repository

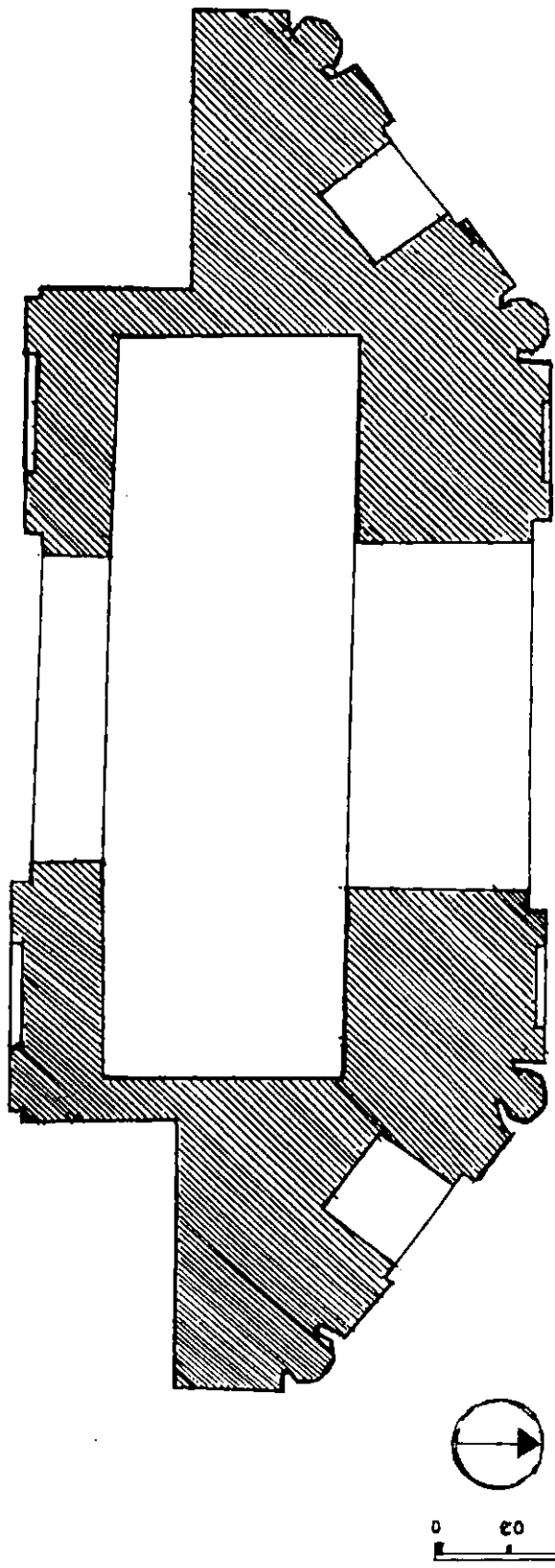

ভূমি পরিকল্পনা-১৭ঃ সোনাকান্দা দুর্গের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪৫ঃ সোনাকান্দা দুর্গের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

২০ সে.মি.। এখানে সম্ভবত দুর্গের শিলালিপি ছিল। সম্পূর্ণ খিলান কাঠামোর পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি সরু অষ্টকোণাকার সংযুক্ত বুরুজ রয়েছে। এ ধরনের বুরুজ লালবাগ কমপ্লেক্সের উত্তর ও দক্ষিণ তোরণে লক্ষ্য করা যায়। তবে দক্ষিণ তোরণের ক্ষেত্রে এগুলো বেন্ডযুক্ত। বুরুজ দুটি তোরণের ফাসাদকে তিনটি আলাদা অংশে ভাগ করেছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় অংশটি সরাসরি উত্তর দিকে দৃশ্যমান থাকলেও এর পূর্ব ও পশ্চিম অংশ যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফাসাদের এই অংশ দুটি একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। এর সর্বনিম্নে রয়েছে ৬৬ সে.মি.এবং ১.৪৩ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট খিলানকৃত গভীর বদ্ধ কুলঙ্গী যার উপরিভাগে তিনটি অগভীর প্যানেল পর পর সাজানো। খিলানগুলো ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হওয়ায় লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণের ফাসাদের ন্যায় কেন্দ্রীয় খিলানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেনি। পরিশেষে, ফাসাদের উভয়পাশে আরও দুটি অষ্টকোণাকার, সরু কোণা বুরুজ এবং দুর্গ প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে আয়তাকার পিলাস্টার নির্মিত হয়েছে। তোরণের কার্নিশ সমান্তরাল মোল্ডিং নক্শা দ্বারা চিহ্নিত এবং এর উপরিভাগে শরছিদ্র বিশিষ্ট এক সারি মারলন রয়েছে।

তোরণটির অভ্যন্তর ভাগ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। এর পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ৫.৪২ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১.৬৮ মিটার। একটি খিলানছাদ এর দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ আচ্ছাদিত। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে দুটি আয়তাকার কুলঙ্গী এবং উত্তর খিলানের উপরিভাগে দরজা আটকানোর লুব রয়েছে। ইমাতটির দক্ষিণ ফাসাদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন (চিত্র-৪৬)। এর কেন্দ্রে নির্মিত প্রবেশ খিলানটি প্যানেল বিশিষ্ট আয়তকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত হলেও এর পাশে অলংকার বিহীন পিলাস্টার একই রেখায় নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া ফাসাদের উপরিভাগে কোন অন্ধ মারলন লক্ষ্য করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪৬ঃ অভ্যন্তরের ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

সম্পূর্ণ তোরণটি প্লাষ্টারকৃত। এতে বিভিন্ন ধরনের ষ্টাকো নক্শা বিশিষ্ট আলংকারিক প্যানেল রয়েছে। উত্তর ফাসাদের বেশিরভাগ প্যানেলে খাঁজ খিলানের মটিফ ছাড়াও দানাযুক্ত অনেকটা গোলাকৃতির নক্শা রয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় খিলানের স্প্যান্ড্রিলে বহু পাপড়ি যুক্ত ফুল এবং তার চারপাশে আরও আটটি ফুল সমেত দুটি গোলাকার চাক্তি লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর পার্শ্ববর্তী অংশ লতাপাতার নক্শায় সজ্জিত। তবে দক্ষিণ ফাসাদের প্যানেলগুলো অলংকরণবিহীন।

নির্মাণ উপকরণঃ

তোরণটি নির্মাণে সামগ্রিক ভাবে ইটের ব্যবহার করা হয়েছে।

বৃহৎ বুরুজের তোরণ

সোনাকান্দা দুর্গের পশ্চিম বাহুর কেন্দ্রে নির্মিত প্রধান বুরুজের পূর্ব বাহুতে একটি ক্ষুদ্রাকার তোরণ রয়েছে (চিত্র-৪৭)। দুর্গের অঙ্গন হতে সিঁড়ির মাধ্যমে এতে প্রবেশ করা যায়। এটি একটি খাঁজ বিশিষ্ট একক খিলান। এর দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৩.৮৯ মিটার এবং উচ্চতা ৩ মিটার। খিলানের ঘনত্ব ১ মিটার। এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে অনুমান করা যায়, তোরণটি সম্পুর্ণ আলংকারিক।

সাধারণ আলোচনাঃ

এ অঞ্চলে টিকে থাকা জল দুর্গের তোরণগুলোর মধ্যে সোনাকান্দা দুর্গের তোরণটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হলেও পরিকল্পনার দিক থেকে সরল। তোরণটিতে কোন

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪৭ঃ বৃহৎ বুরুজের প্রবেশ খিলান

Dhaka University Institutional Repository

প্রহরীকক্ষ নেই। সাধারণত জল দুর্গগুলোতে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নদীর সম্মুখভাগে নির্মিত প্রাচীর বুরুজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সম্ভবত এ কারণে তোরণের প্রতিরক্ষা অপেক্ষা আলংকারিক ভূমিকাই ছিল মূখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইদ্রাকপুর দুর্গের তোরণ

অবস্থানঃ

ইদ্রাকপুর সদর, থানা: ইদ্রাকপুর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ।

ঢাকা হতে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ধলেশ্বরী নদীর উত্তর-পশ্চিমে "ইদ্রাকপুর দুর্গ" নামে পরিচিত অপর একটি জল দুর্গ রয়েছে (চিত্র-৪৮)। পূর্বে দুর্গটি ইছামতি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা আরও পূর্বদিকে সরে গেছে । এর চারপাশে এবং অভ্যন্তরে প্রচুর বসতি গড়ে উঠেছে।

নির্মাণকালঃ

দুর্গটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে এর নির্মাণকাল সংক্রান্ত বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। সৈয়দ আওলাদ হাসান এর মতে, এটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (১৬৭৬-১৭০৭ খ্রি:) নির্মিত হয়েছিল।[২১১] আব্দুল করিম, নাজিমুদ্দিন আহমেদ, মাহমুদূল হাসান প্রমুখ ১৭শ শতকের মাঝামাঝি মীর জুমলা বাংলার সুবাদার থাকাকালীন সময়ে দুর্গটি নির্মাণ করেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২১২] এ,এইচ, দানী আরও স্পষ্ট করে এটিকে মীর জুমলা কর্তৃক ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[২১৩] তবে এর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত হাজীগঞ্জ দুর্গ (নি:১৭শতক) ও সোনাকান্দা দুর্গের (নি:১৭শতক) সাথে তুলনা করলে সহজেই

---

২১১. S.A. Hasan, *Notes of the Antiquities of Dacca*, Dacca: M.M.Bysak,1904 A.D. p. 206.

২১২. Nazimuddin Ahmed,*Monuments of Bengal*, Dhaka: The University PressLimited, p. 198.

২১৩. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1957 A.D. p. 226.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪৮ঃ ইদ্রাকপুর দুর্গ(সম্মুখ ভাগ)

Dhaka University Institutional Repository

অনুমান করা যায়, এটি সমসাময়িককালে নির্মিত অন্যতম জল দুর্গ। সম্ভবত নদী পথে পর্তুগীজ ও মগদের আক্রমণ থেকে ঢাকাকে রক্ষা করার জন্য এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল।[২১৪]

বর্তমান অবস্থাঃ

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে দুর্গটি সর্বপ্রথম তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে ঘোষিত হয়। তথাপি এর অভ্যন্তরে বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্রীয় জেলখানাসহ বহু আবাসস্থল রয়েছে। দুর্গের একমাত্র তোরণটি এর উত্তর বাহুর কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এটি বর্তমানে জেলখানার প্রবেশ দ্বার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

ইদ্রাকপুর দুর্গের তোরণটি এর উত্তর বাহুর সমান্তরালে আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে (ভূমি পরিকল্পনা-১৮)। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৫.৮৭ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২.৩০ মিটার। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নির্মিত প্রবেশপথ। খিলানটি পূর্ব-পশ্চিমে ২ মিটার বিস্তৃত এবং এর উচ্চতা শীর্ষ বিন্দুতে ৩.৬৬ মিটার। খিলান বাহুর ঘনত্ব ৭১ সে.মি.। একটি প্যানেল নক্শা বিশিষ্ট আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে এটি প্রথিত। এর পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে মোট চারটি করে প্যানেল থাকলেও শীর্ষে এর সংখ্যা তিনটি এবং এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্যানেলটি আয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত অধিক গভীর। এ স্থানটিতে সম্ভবত দুর্গের শিলালিপি ছিল। তোরণের দুই কোণে দুটি অষ্টকোণাকার বুরুজ এর শীর্ষ পর্যন্ত উঠে গেছে। সর্বোচ্চে ছয়টি শরছিদ্রযুক্ত মারলন এবং এগুলোর ভিতে নির্মিত মোল্ডিং নক্শা তোরণটির মুকুট রচনা করেছে (চিত্র-৪৯)।

---

২১৪. Ayesha Begum, *Forts in Medieval Bengal, An Architectural Study*, Vol-Text, (Unpublished Ph.D.Thesis) Rajshahi-1992 A.D. p, 331.

Dhaka University Institutional Repository

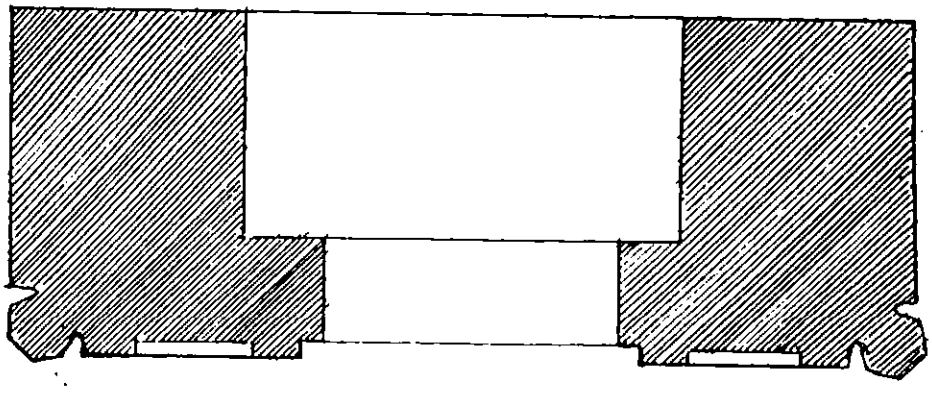

ভূমি পরিকল্পনা-১৮ঃ ইদ্রাকপুর দুর্গের তোরণ

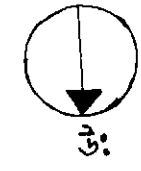

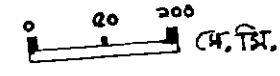

Dhaka University Institutional Repository

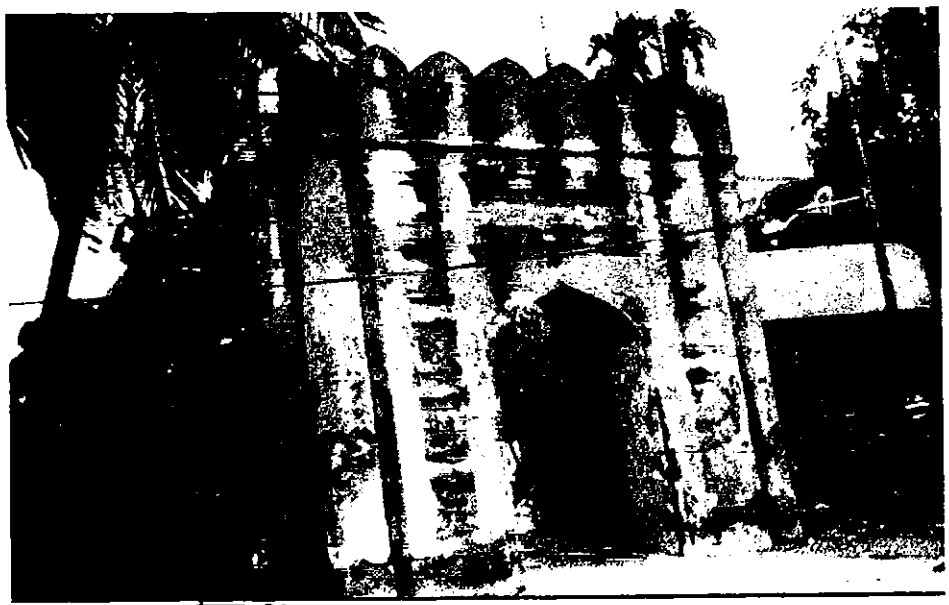

চিত্র-৪৯ঃ
ইন্দ্রাকপুর দুর্গের তোরণ (সম্মুখ ফাসাদ)

Dhaka University Institutional Repository

এর অভ্যন্তর ভাগ সাদামাটা এবং একটি একক খিলানের আকৃতিতে নির্মিত হয়েছে। এর পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ২.৮০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১.৪৩ মিটার। এর উত্তর খিলানের উপরিভাগে উভয় পাশে দরজার পাল্লা আটকানোর জন্য লুব ও আংটা রয়েছে।

তোরণের দক্ষিণ ফাসাদের কেন্দ্রে যে চতুর্কেন্দ্রিক প্রবেশ খিলান রয়েছে তা অভ্যন্তর ভাগের খিলান রেখার সাথে মিশে গেছে। একে ঘিরে কোন ফ্রেম নেই এবং এর পার্শ্ববর্তী অংশসমুহ প্লাষ্টারকৃত (চিত্র-৫০)। তোরণের সমান্তরাল কার্নিশটিতে কোন স্থাপনা নেই এবং পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদ দুর্গ প্রাচীরের সাথে মিশে গেছে।

অলংকরণঃ

ইদ্রাকপুর দুর্গ তোরণের সম্মুখ ফাসাদে প্যানেল নক্শা ব্যতীত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় না। আদিতে সম্ভবত সোনাকান্দা ও হাজীগঞ্জ দুর্গ তোরণের ফাসাদের ন্যায় এখানেও প্লাষ্টার কাটা অলংকরণ ছিল এবং কালের বিবর্তনে তা বিলীন হয়ে গেছে।

নির্মাণ উপকরণঃ

তোরণটি সামগ্রিক ভাবে ইটের তৈরী এবং প্লাষ্টারকৃত।

সাধারন আলোচনাঃ

অন্যান্য জল দুর্গের তোরণের ন্যায় ইদ্রাকপুর দুর্গের তোরণটিও সরল পরিকল্পনায় অনেকটা আনুষ্ঠানিক অবয়ব নিয়ে গঠিত হয়েছে। তবে এটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং আলংকারিক জাঁকালোতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

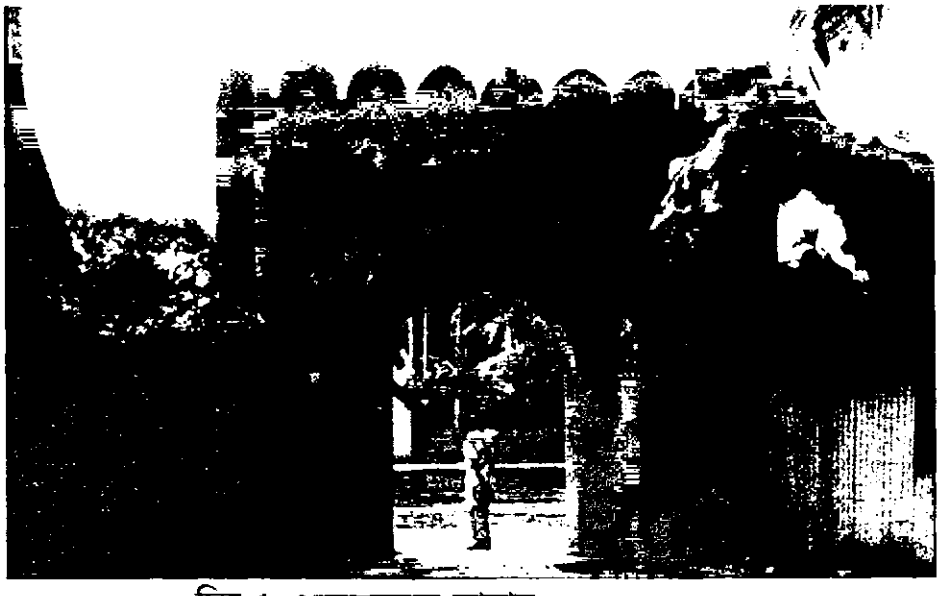

চিত্র ৫০ঃ অভ্যন্তরের ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

লালবাগ কমপ্লেক্সের তোরণসমূহ

অবস্থানঃ

লালবাগ , ঢাকা।

লালবাগ কমপ্লেক্সটি মুঘল বাংলার স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে সবচাইতে বৃহৎ ও দৃষ্টিনন্দন। লালবাগ নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, নির্মাণের পূর্বে এখানে হয়ত বাগান ছিল। এর সমর্থন পাওয়া যায়, এর আশে পাশের কাসার হাটা (র,ব.কাসর হাট–প্রাসাদ মার্কেট) নামকরণ হতে।[২১৫] এটি কিল্লা আওরঙ্গবাদ নামেও পরিচিত। নির্মাণকালে এর দক্ষিণ বাহু বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদীটি অনেক দক্ষিণে সরে গেছে। যদিও এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি, তথাপি লালবাগ কমপ্লেক্সটি বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমানে বিরাটকায় প্রাচীর ঘেরা এলাকার অভ্যন্তর ভাগে সর্ব পশ্চিমে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, মধ্যবর্তী স্থানে পরিবিবির সমাধিসৌধ এবং পূর্বে একটি দ্বি-তল ইমারত রয়েছে যার নীচের অংশ হাম্মাম এবং উপরিভাগ দরবার কক্ষ ছিল। তবে এই কমপ্লেক্সের অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপনা হলো এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রবেশ তোরণটি। এর উত্তর-পূর্ব দিকেও অনেকটা একই পরিকল্পনার অপর একটি তোরণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হয়েছে। তবে তোরণগুলোর কোনটাই পরিপূর্ণ ভাবে নির্মিত হয়নি।

---

২১৫. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., P-220.

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কালঃ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র যুবরাজ আজম শাহ্ (১৬৭৭-১৬৭৯ খ্রিঃ) বাংলার সুবেদার থাকাকালীন ১৬৭৮ খ্রিঃ এ লালবাগ কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলেও[২১৬] সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো হয়। অত:পর শায়েস্তা খানের (১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রিঃ) তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় পর্যায়ে এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু চার বছর পর তা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে দিলে কমপ্লেক্সটি অসমাপ্ত থেকে যায়। ধারণা করা হয়, বিবি পরির মৃত্যু[২১৭] কিংবা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য[২১৮] এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। কমপ্লেক্সেটির অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদের শিলালিপি ব্যতীত আর কোন শিলালিপি পাওয়া যায় না। মসজিদে দুটি তারিখ পাওয়া যায়। এর একটি ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটির নির্মাণ এবং অপরটি ১৭৮০ খ্রিঃ এ এর সংস্কার সংক্রান্ত।[২১৯] শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, আজম শাহের আগমনের পূর্বেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা সংস্কার করা হয়েছে। ক্যাথরিন বি. আশার ধারণা করেন, সম্ভবত পুরাতন দুর্গের ভিতে নতুন নির্মাণ হয়েছিল।[২২০] কিন্তু এ সংক্রান্ত আর কোন তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় এর সঠিক নির্মাণকাল সম্পর্কে জানা যায় না।

---

২১৬. Sayid Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dhaka*, Dhaka–1904, p.4, Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Socicty of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p-220.

২১৭. Sayid Aulad Hasan, *Ibid,* p. 4, মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা,* ডক্টর আ. ন. ম. শরফুদ্দীন অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ৬২।

২১৮. Ayesha Begum, *Forts in Medieval Bengal, An Architecture Study*, Vol.-Text, (Ph. D. Thesis), Rajshahi–1992 A.D. p. 341.

২১৯ Catherin B.Asher, Inventory Key Monuments, *Ibid,* p. 59.

২২০. Catherin B.Asher, *Ibid,* p. 58 .

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থাঃ

১৮২৪ খ্রিঃ এ বিশপ হেবার (Heber) এটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখতে পান। উইলিয়াম হেজেজের (William Hedges) ডায়েরি হতে জানা যায়, ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ঢাকা ভ্রমণকালে কমপ্লেক্সটি কোম্পানীর সৈন্যদের ব্যারাক এবং জেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।[২২১] ১৮৫৭ খ্রিঃ এ সিপাহী বিদ্রোহ কালে এটির ধ্বংস সাধিত হয়। ১৯৫২-৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির রক্ষণাবেক্ষণ আরম্ভ করে এবং ধ্বংসস্তূপ হতে বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করে পূনর্নির্মাণ শুরু করে।[২২২] তৎপরবর্তীকাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সংস্কার ও সংযোজন অব্যহত থাকলেও এখনও পর্যন্ত এর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ তোরণের পশ্চিম দিকে মাটির ঢিবি দেখা যায়। এগুলো খনন করলে হয়ত আরও স্থাপত্যিক উপাদানের আবিষ্কার হতে পারে।

দক্ষিণ তোরণ

লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণটি বর্তমানে এর দক্ষিণ বাহুর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু এর অবস্থান দেখে মনে হয়, এটি প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কেন্দ্র বিন্দু ছিল এবং এর পূর্ব দিকেও অনুরূপ প্রাচীরের পরিকল্পনা ছিল যা পরবর্তীতে নির্মিত হয়নি।[২২৩] তাছাড়া তোরণটির পরিকল্পনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এটি কমপ্লেক্সটির প্রধান প্রবেশ তোরণ ছিল (চিত্র-৫১)।

---

২২১. Henry Yule, *The Dairy of William Hedges*, Vol -1, London–1887-89 . p. 43-44, সূত্র- Ayesha Begum, Ph. D. Thesis, p.342.
২২২. *Annual Report of Eastern Pakistan Circle Archaeology for the Year 1952-53 A.D.*
২২৩. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p. 221.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫১ঃ
লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

তোরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে উত্তর ভারতে যে মুঘল রীতির বিকাশ ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি এই তোরণটিতে লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক পরিকল্পনায় এটি একটি আয়তাকার ত্রিতল ইমারত (ভূমি পরিকল্পনা-১৯)। এর বিস্তৃতি পূর্ব-পশ্চিমে ১৫.৬০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০.৪৫ মিটার। এর সম্মুখ ফাসাদটি দ্বিতীয় তলার শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত উত্থিত একটি বিশাল কেন্দ্রীয় খিলান নিয়ে পরিকল্পিত। এর দুই দিকে রয়েছে দুটি অষ্টকোণাকার সংলগ্ন টারেট। এই অংশটি কিছুটা অগ্রসর হয়ে পিস্তাকের রূপ ধারণ করেছে। এর উভয় পাশে দুটি অর্ধ-গম্বুজে আচ্ছাদিত অর্ধ-অষ্টকোণী কুলঙ্গী উপরিভাগে দুই স্তর বিশিষ্ট বহির্গত বাতায়নের সমন্বয়ে গঠিত। কুলঙ্গীর উপরিভাগে উদ্‌গত বারান্দা নির্মানের জন্য এর খিলানটিকে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে দেয়া হয়েছে। বারান্দাগুলো ষষ্টকোণী পরিকল্পনায় নির্মিত। এগুলোর নির্মাণ রীতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বারান্দার বহির্ভাগের চারকোণে চারটি করে বেলে পাথরের সরু স্তম্ভ রয়েছে এবং এগুলোর ভিত ও শীর্ষে পাথরের ঠেকনা রয়েছে (চিত্র-৫২)। এ ধরনের ঠেকনার ব্যবহার মুঘল সম্রাট আকবরের অন্যতম রাজধানী ফতেহ্‌পুর সিক্রির (আ:১৫৬৯-১৫৮৫ খ্রিঃ) ইমারতসমূহে লক্ষ্য করা যায়। বারান্দারগুলো পলকাটা অর্ধ-গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজটি নির্মাণে ড্রামের ব্যবহার করা হয়েছে। ফাসাদের সর্বশেষ অংশটি প্যানেলে অলংকৃত। এভাবে সম্পূর্ণ দক্ষিণ ফাসাদটি তিন তলার আকৃতি ধারণ করেছে। পূর্বে দুটি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ দ্বারা এর উপরিভাগ পরিশোভিত ছিল।[২২৪] তবে বর্তমানে এগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানটি চতুর্কেন্দ্রিক এবং এর অভ্যন্তর ভাগ ইউয়ান[২২৫] সাদৃশ্য। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৫.৩১ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ২.২১ মিটার এবং

---

২২৪. যদিও বর্তমানে সম্মুখের ক্ষুদ্র গম্বুজের ভগ্নাবশেষ রয়েছে এবং এগুলোতে কোন স্তম্ভ নেই , কিন্তু দানীর বিবরণে এগুলোকে স্তম্ভ যুক্ত কিয়স্ক বলা হয়েছে, Dani , *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 225.

২২৫. সাধারণত তিন দিকে বন্ধ ও এক দিকে খোলা স্থাপনাকে ইউয়ান বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি পরিকল্পনা-১৯ঃ লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫২ঃ ঝুলন্ত বারান্দা

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতা ৪.৫৮ মিটার। খিলানটি অর্ধ-গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং তোরণের মধ্যবর্তী অংশের সামগ্রিক উচ্চতা পর্যন্ত উত্থিত একটি প্যানেলের অভ্যন্তরে প্রথিত। ইউয়ান পার হয়ে একটি চৌচালা ভল্ট আচ্ছাদিত কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এর দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৮৪ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ২.৪২ মিটার। কক্ষটি উত্তর ও দক্ষিণে অনুরূপ দুটি খিলানের সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে খিলানের দুটি ফ্রেমই পাথরের তৈরি। তাছাড়া দক্ষিণ খিলানের স্প্যান্ড্রিলটিও পাথরে নির্মিত। তোরণের অভ্যন্তরের মধ্যবর্তী স্থান বর্গাকার এবং গম্বুজাবৃত। চারকোণা কক্ষটি পাড় হয়ে এ অংশে যেতে হয়। এর একবাহুর দৈর্ঘ্য ৪.৫৮ মিটার। এর পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে একটি করে অর্ধ-গম্বুজে আবৃত কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৬২ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪.৩৭ মিটার পরিমাপ বিশিষ্ট। কেন্দ্রীয় গম্বুজাবৃত কক্ষটির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এই অংশগুলো নির্মিত হয়েছে। কুলঙ্গীর মেঝে হতে গম্বুজের ভিত পর্যন্ত উচ্চতা ২মিটার। এই অংশের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে তিনটি করে বর্গাকার কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো সম্ভবত বাতি রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো। গম্বুজের ভিতেও ৭টি করে খিলানাকৃত প্যানেল রয়েছে, তবে এগুলো অগভীর।

অর্ধ-গম্বুজাবৃত এই কুলঙ্গীগুলোর দক্ষিণ বাহুতে একটি করে অনেকটা অর্ধ-অষ্টকোণাকার কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো চৌচালা আচ্ছাদিত অংশের বরাবরে পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত। তবে শুধুমাত্র অভ্যন্তর ভাগের কুলঙ্গী হতেই এই কক্ষগুলোতে প্রবেশ করা যায়। কক্ষগুলোর অভ্যন্তরভাগ অনেকটা সমতল ধরনের গম্বুজে আবৃত। তবে বাহির থেকে গম্বুজগুলো দৃশ্যমান নয়। এগুলো সম্ভবত প্রহরী কক্ষ ছিল।[২২৬] বর্গাকার হলঘর হতে উত্তরে অপর একটি খিলান পার হয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় । এই অংশে কোন অর্ধ-গম্বুজ দেখা যায় না।

---

২২৬. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p. 225.

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের উত্তর ফাসাদও দক্ষিণ ফাসাদের ন্যায় তিন খিলানের সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র-৫৩)। এক্ষেত্রে এটি তিন তলা না হয়ে দ্বিতল অবয়ব নিয়ে গঠিত হয়েছে। এর কেন্দ্রীয় খিলানটি বৃহাদাকার যার দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৪ মিটার এবং খিলানের দেয়ালের ঘনত্ব ১.১৭ মিটার। পার্শ্ববর্তী খিলান দুটো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত এবং অর্ধ-গম্বুজে আচ্ছাদিত। পার্শ্ব কুলঙ্গীগুলোর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে বর্গাকার কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো কি কাজে ব্যবহৃত হতো তা জানা যায় না।

তোরণের উপরের তলায় পৌঁছানোর জন্য ফাসাদের পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি বর্গাকার সিঁড়িকক্ষ নির্মিত হয়েছে। নির্মাণকালে এগুলোতে কোন সিঁড়ি পথ ছিল না। তবে বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উপরে উঠার সুবিধার্থে উভয় পার্শ্বেই সিঁড়ি নির্মাণ করেছে। পূর্ব দিকের সিঁড়িকক্ষের পশ্চিম বাহুতে এবং পশ্চিম দিকেরটির পূর্ব বাহুতে একটি করে আয়তাকার কুলঙ্গী রয়েছে।

তোরণটির উপরিভাগের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি। এর পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে দুই সারি উন্মুক্ত খিলানসমেত পর্দা রয়েছে। এগুলো দ্বি-স্তরবিশিষ্ট যার নিম্নভাগ আয়তাকার এবং উপরিভাগ খিলান পরিকল্পনায় নির্মিত। এগুলোর উত্তর দিকের উভয় বাহুতে রয়েছে একটি করে চার খিলানযুক্ত ও ক্ষুদ্র গম্বুজে আচ্ছাদিত কিয়স্ক (চিত্র-৫৪)। এগুলো মুঘল গম্বুজের ক্ষুদ্র ছবি মাত্র। গম্বুজের ড্রাম অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট এবং মধ্যভাগের মোল্ডিং নক্শা এটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। তাছাড়া সম্মুখ ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলানের উপরিভাগে একটি ফাঁকা চতুর্কেন্দ্রিক খিলান ছাড়াও কিছু পাথরের টুকরা রয়েছে যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তোরণটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি। তবুও সার্বিক পরিকল্পনায় তোরণটি অত্যন্ত মোহনীয় রূপ ধারণ করেছে এবং এর প্রতিরক্ষামূলক দীপ্ততার চেয়ে কোমল সৌন্দর্য অধিক প্রকাশিত হয়েছে।[২২৭]

---

২২৭. Dani , *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p. 225

Dhaka University Institutional Repository

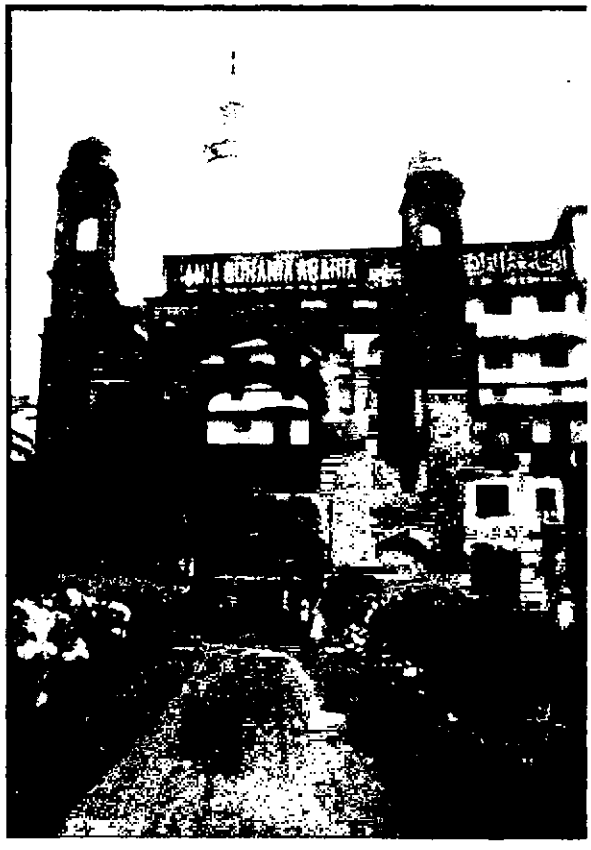

চিত্র-৫৩ঃ দক্ষিণ তোরণ(অভ্যন্তরের ফাসাদ)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৪ঃ ক্ষুদ্র মিনার

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণটির অলংকরণে মুঘল রীতির প্যানেল নক্‌শার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফাসাদের সম্মুখ ভাগে, কেন্দ্রীয় ও পার্শ্ববর্তী খিলানের উভয় পাশে, খিলানের দেয়ালে ও গম্বুজের ড্রামে প্যানেল নক্‌শার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে তোরণটি এর অগভীর মুকারনাস নক্‌শার জন্য অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গম্বুজ ও খিলানের নিম্নভাগের সর্বত্রই জালের ন্যায় ছড়িয়ে রয়েছে এই প্লাষ্টারকৃত অগভীর মুকারনাস নক্‌শা। এ ধরনের অলংকরণ ঢাকার চক বাজারে অবস্থিত বড় কাটরার (১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) প্রবেশ তোরণগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকেই অগভীর মুকারনাস নক্‌শা মুঘল স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিনত হয়েছিল।[২২৮] তাছাড়া ঝুলন্ত বারান্দার স্তম্ভের ঠেকনা অলংকরণেও মুঘল রীতির প্রভাব রয়েছে। মূলত: তোরণটির নির্মাণ ও অলংকরণে মুঘলদের উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

নির্মাণ উপাদানঃ

তোরণটির নির্মাণে বাংলা স্থাপত্যের সাধারণ উপাদান ইটের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে স্বল্প পরিসরে পাথরের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় ইউয়ানের নিম্নভাগের খিলানদুটো সম্পূর্ণভাবে পাথরের তৈরী। তাছাড়া দক্ষিণ ফাসাদের উদ্‌গত জানালাগুলোও বেলে পাথরে নির্মিত।

সাধারণ আলোচনা ঃ

তোরণটি (যদিও সমাপ্ত হয়নি) বাংলায় নির্মিত মুঘল স্থাপত্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর দ্বিতল অবয়ব, সরু অষ্টকোণি সংযুক্ত বুরুজ, ঝুলন্ত বারান্দা, কেন্দ্রীয় দ্বিতল উচ্চতাবিশিষ্ট এবং অর্ধ-গম্বুজে আবৃত চতুর্কেন্দ্রিক খিলানাকৃতির ইউয়ান প্রভৃতি

---

২২৮. C.B. Asher, *Ibid,* p.59.

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য তোরণটিকে রাজকীয় অবয়ব দান করেছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দিল্লী দুর্গে অবস্থিত লাহোর গেট (১৫৭৫ খ্রিঃ), দিল্লি গেট (১৫৬৬ খ্রিঃ), ফতেহপুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজা (ষোড়শ শতক) প্রভৃতিতে লক্ষ্য করা যায়। মূলত: মুঘলগণ তোরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে রীতির প্রচলন করেছেন, উত্তর ভারতের মুঘল তোরণের ন্যায় বিশাল ও জমকালো না হলেও লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণ নির্মাণে প্রায় একই রীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তর তোরণ

অবস্থানঃ

কমপ্লেক্সের উত্তর বাহুর পূর্ব প্রান্তে লালবাগ সড়কের দক্ষিণ দিকে অপর একটি তোরণ রয়েছে। তোরণটি দক্ষিণ তোরণ বরাবরে নির্মিত হয়েছে। পরিকল্পনার দিক থেকে এটি অনেকটা দক্ষিণ তোরণের ন্যায় হলেও আকৃতির দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এর বর্তমান স্থাপত্যিক কাঠামো অসমাপ্ত নির্মাণের ইঙ্গিত বহন করছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

তোরণটির সম্মুখ ফাসাদ উত্তর দিকে নির্মিত হয়েছে (চিত্র-৫৫)। এর কেন্দ্রে রয়েছে দ্বিতলসম উচ্চতা বিশিষ্ট খিলান। চতুর্কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় নির্মিত তোরণের কেন্দ্রীয় বৃহৎ খিলানটি আয়তাকার কাঠামো দ্বারা সীমায়িত। ফাসাদের উভয় পাশে রয়েছে দুটি সরু অষ্টকোণাকার বুরুজ। এগুলো তোরণের উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে। বৃহৎ খিলানটি অর্ধ-গম্বুজ সমেত গঠিত হয়ে ইউয়ানের আকৃতি লাভ করেছে, যার আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৫ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২.১০ মিটার। এর কেন্দ্রে ৩ মিটার দীর্ঘ এবং ৬০ সে.মি. ঘনত্ব বিশিষ্ট মূল প্রবেশ খিলানটি রয়েছে। এটি চতুর্কেন্দ্রিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৫ঃ কমপ্লেক্সের উত্তর তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

একটি আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত। প্রবেশ খিলান হতে একটি চৌচালা ভল্ট আচ্ছাদিত কক্ষে প্রবেশ করা যায়। পরপর দুটি প্রবেশ খিলানের সমন্বয়ে এ কক্ষটি গঠিত হয়েছে। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৪ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ২ মিটার। এটি তোরণের কেন্দ্রে অবস্থিত গম্বুজাবৃত বর্গাকার কক্ষের দিকে ধাবিত। এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ২.২০ x ৩.১০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট দুটি অর্ধ-গম্বুজাবৃত কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলোর দক্ষিণে দুটো আয়তাকার প্রহরী কক্ষ নির্মিত হয়েছে। কক্ষগুলো কুলঙ্গীর দিকে উন্মুক্ত। পূর্ব দিকের কক্ষের পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালে এবং পশ্চিম দিকের কক্ষের উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। তাছাড়া অর্ধ-গম্বুজে আবৃত কুলঙ্গীর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে তিনটি করে বর্গাকার প্যানেলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর কি কাজ ছিল তা জানা যায় না; সম্ভবত তোরণের অভ্যন্তর ভাগ আলোকিত করার জন্য বাতি রাখার কাজে ব্যবহার করা হতো।

তোরণের দক্ষিণ ফাসাদে নির্মিত তিনটি উন্মুক্ত প্রবেশ খিলানের সাহায্যে এর অভ্যন্তর ভাগ হতে কমপ্লেক্সের অঙ্গনে প্রবেশ করা যায় (চিত্র-৫৬)। এই ফাসাদটি দক্ষিণ তোরণ অপেক্ষা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেননা, দক্ষিণ তোরণের উভয় ফাসাদের পার্শ্ব কুলঙ্গীগুলো বন্ধ থাকলেও এর খিলানগুলো উন্মুক্ত। তবে কেন্দ্রীয় খিলানটি চতুর্কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় উন্মুক্ত প্রবেশ পথ তৈরি করলেও পার্শ্ববর্তীগুলোর ক্ষেত্রে তা অর্ধ-গম্বুজের অভ্যন্তরে নির্মিত আয়তাকার প্রবেশ পথ।

দক্ষিণ ফাসাদের তিনটি খিলানই আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত। তবে কেন্দ্রীয় খিলানের উপরিভাগে একটি এবং পার্শ্ববর্তী খিলানের উপরিভাগে দুইটি করে আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। তোরণটি বাইরের দিকে সমতল ছাদ দ্বারা আবৃত এবং পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদের উভয় পাশের বাহুই এর উচ্চতা অপেক্ষা উপরের দিকে উঠে গেছে এবং এগুলোর সাথে তোরণের উপরিভাগে একটি উন্মুক্ত খিলান নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের নির্মাণ তোরণটির উপরিভাগে আরও পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করছে যা

Dhaka University Institutional Repository

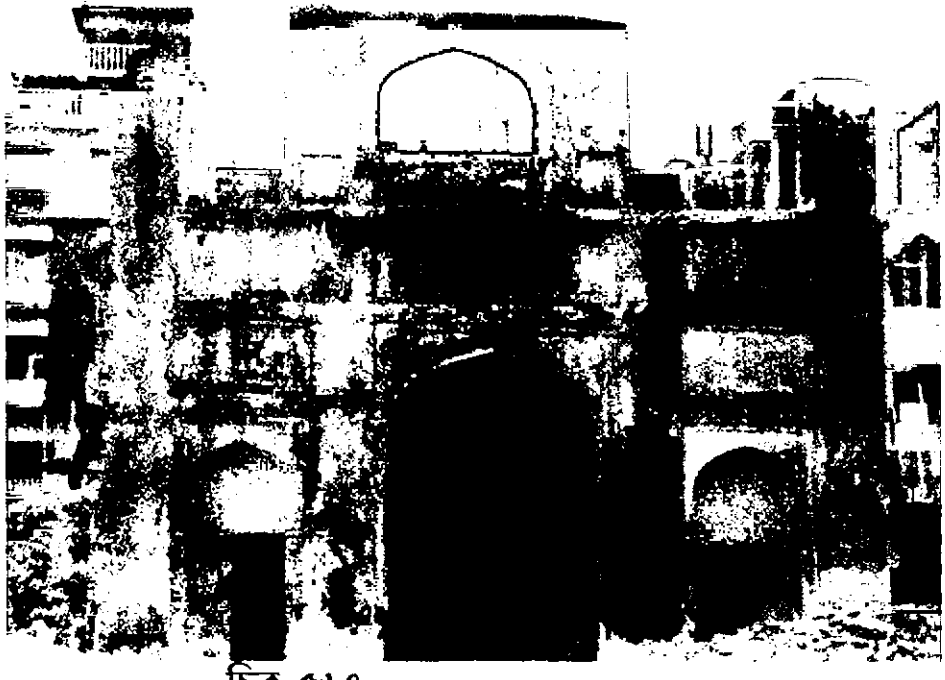

চিত্র-৫৬ঃ
উত্তর তোরণের ভিতরের ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে আর সমাপ্ত হয়নি। তাছাড়া এর পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদে অনেকগুলো উদ্‌গত অংশ রয়েছে। এগুলো এর অসমাপ্ত থাকার পক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে। তবে তোরণের নিম্নভাগে যে অর্ধ-খিলান আকৃতির গভীর কুলঙ্গীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তা কি কাজে ব্যবহৃত হতো তা জানা যায় না।

তোরণটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য একে দক্ষিণ তোরণের কাছাকাছি নিয়ে গেলেও এর বেশির ভাগ নির্মাণই অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট কাটরার তোরণসমূহ

অবস্থান ঃ

চকবাজার, থানা- লালবাগ, ঢাকা।

মুঘল শাসনামলে নির্মিত ছোট কাটরাটি বড় কাটরা হতে ১১০ মিটার পূর্ব দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পরিকল্পনায় বড় কাটরার অনুরূপ হলেও আকারের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বিধায় এটি ছোট কাটরা নামে সমধিক পরিচিত। এটি শায়েস্তা খানের প্রাসাদ হিসেবেও অভিহিত।[২২৯]

নির্মাণ কাল ঃ

ছোট কাটরায় নির্মাণ সংক্রান্ত কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণ কাল বা তারিখ জানা যায় না। তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, পরিকল্পনা ও ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে স্থাপত্য ঐতিহাসিকগণ এর নির্মাণ কাল নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন। রহমান আলী তায়েশের মতে, ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খান এ কাটরা নির্মাণ করেন।[২৩০], পরবর্তীতে ডঃ দানী, ক্যাথরিণ বি. আশার, সৈয়দ আওল্াদ হাসান, নাজির হোসেন প্রমুখ তার সমর্থন করেন।[২৩১] কিন্তু এর নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন আকর তথ্য কেউই উল্লেখ করেন নাই। তবে পরিকল্পনা

---

২২৯. Sharif Uddin Ahmed (edt.), *DHAKA – PAST PRESET FUTURE*, Dhaka, The Asiatic Society of Bangladesh-1991 A.D. p. 369.

২৩০. রহমান আলী তায়েশ, *পূর্বোক্ত*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৯৯ ।

২৩১. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D. p. 220, Cathrin B. Ashar, Inventory Key Monuments, *Ibid*, p. 55, Sayeed Aulad Hasan, *Ibid*, 1904, p.16, নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা*, ঢাকা -১৯৭৬, পৃ. ৮২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ও নির্মাণ কৌশল থেকে এটুকু সহজেই অনুমান করা যায় যে, এটি মুঘল যুগে সম্ভবত 'বড় কাটরা' নির্মাণের পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান অবস্থা ঃ

বড় কাটরার পরিকল্পনার ন্যায় ছোট কাটরাটিও একটি আয়তাকার অঙ্গনের চারদিকে নির্মিত হয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রবেশ তোরণ। এগুলো অনেক বার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ইমারতটি প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারতের তালিকাভূক্ত হওয়ার পর বহুবার প্রচেষ্টার পরও এর প্রকৃত সত্ত্বাধিকার লাভ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ছোট কাটরার উভয় তোরণ বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানার অধীনে দোকান-পাট, গোডাউন, ছোট কারখানা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে স্থাপনাগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তথাপি যেটুকু এখনও আদি অবস্থায় টিকে আছে তা থেকে অন্তত তোরণসমূহের পরিকল্পনা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পরিকল্পনা ও বিবরণ ঃ

কাটরার উত্তর এবং দক্ষিণ তোরণ প্রায় একই পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে (ভূমি পরিকল্পনা-২০)। তবে উত্তর তোরণটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। নিম্নে এগুলোর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে আলোচনা করা হলোঃ

দক্ষিণ তোরণ

ছোট কাটরার দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রে এই তোরণটি নির্মিত হয়েছে (চিত্র-৫৭)। সামগ্রিক পরিকল্পনায় এটি অনেকটা বর্গাকৃতির ইমারত। এর দক্ষিণ ফাসাদটি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৭ঃ ছোট কাটরার দক্ষিণ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

বুড়িগঙ্গার দিকে দন্ডায়মান। তবে নদীটি বর্তমানে অনেক দূরে সরে গেছে। এই ফাসাদটি অপেক্ষাকৃত জাকজমকপূর্ণ। এটি তিন তলা বিশিষ্ট অবয়ব নিয়ে গঠিত। এর কেন্দ্রে নির্মিত হয়েছে দ্বি-স্তর পর্যন্ত উত্থিত চতুর্কেন্দ্রিক খিলানটি এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে রয়েছে আয়তাকার পিলাষ্টার।

কেন্দ্রীয় চতুর্কেন্দ্রিক খিলানটি অর্ধ-গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং এর নিম্নভাগের কেন্দ্রে রয়েছে মূল প্রবেশ খিলানটি। এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় একটি ইউয়ানের অনুরূপ। এরূপ পরিকল্পনা ঢাকার লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ ও উত্তর তোরণ (১৭শ শতক), বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণে (১৬৪৪ খিঃ) লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় খিলানকৃত প্রবেশ পথটিতে পর পর তিনটি খিলান দ্বারা বিভক্ত। এগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে চৌচালা খিলান ছাদ নির্মিত হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী দেয়ালে রয়েছে অগভীর কুলঙ্গী।

তোরণটির কেন্দ্রীয় খিলান সারি পেরিয়ে একটি লম্বা খিলান ছাদে আচ্ছাদিত অংশে প্রবেশ করা যায়। এর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মোট চারটি গভীর কুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো অনেকটা আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং অপেক্ষাকৃত নীচু খিলান ছাদে আবৃত। এ ধরনের কুলঙ্গী সাধারণত প্রহরী কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এগুলোর গভীরতা দেখে মনে হয়, মুসাফিরদের মালামাল রাখার ব্যবস্থাও তোরণে ছিল।

তোরণটির উপরিভাগে অনেক সংযোজন ও পরিবর্তনের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। কেন্দ্রীয় ইউয়ানের উপরিভাগে বসবাসের জন্য যে তলাটি নির্মিত হয়েছে বর্তমানে সেখানে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় রীতির ত্রিস্তর জানালা নির্মাণ করা হয়েছে , তাছাড়া কার্নিশে ব্যবহৃত বাইরের দিকে বাঁকানো বীমের নক্শা এবং উপরিভাগে যে প্যারাপ্যাট বা ছাদের রেলিং নির্মিত হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ ভাবেই ইউরোপীয় রীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এমনকি তোরণটির দক্ষিণ ফাসাদের উভয় পাশে যে সরু সংযুক্ত বুরুজের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করা হয়েছে তাও একই রীতিতে নির্মিত। তোরণটির উত্তর ফাসাদেও একটি বারান্দা পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তবে অভ্যন্ত রভাগে পরিবর্তন ও সংযোজন অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর তোরণ

ছোট কাটরার উত্তর দিকের তোরণটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট অবয়ব নিয়ে গঠিত (চিত্র-৫৮)। কেন্দ্রীয় খিলানটি চতুর্কেন্দ্রিক এবং দক্ষিণ তোরণের ন্যায় ইউয়ান বিশিষ্ট। এর কেন্দ্রে মূল প্রবেশ খিলানটি নির্মিত হয়েছে। এর উপরিভাগে কোন ইমারত নেই এবং এই অংশটি দৃষ্টে মনে হয় তোরণটির নির্মাণ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া এর উত্তর দিকের বারান্দায় বিরাটাকার স্তম্ভের ব্যবহার ইউরোপীয় সংস্কারের প্রমাণ দেয়।

অলংকরণ ঃ

ছোট কাটরার তোরণসমুহ এক সময় সম্পূর্ণরূপে প্লাষ্টারাবৃত ছিল। এগুলোর বেশিরভাগই বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য ব্যতীত তোরণগুলোতে কোন রকম অলংকরণ দেখা যায় না। বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণ কিংবা লালবাগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব তোরণের ন্যায় এর অর্ধ-গম্বুজ এবং অভ্যন্তরের হল ঘরের ভল্টে অগভীর মুকারনাস নক্শার জাল নেই। তবে প্রায় সমসাময়িক কালে নির্মিত হয়েও একই রকম নক্শা না থাকা সন্দেহের উদ্রেক করে। এরূপ হতে পারে পূর্বে তোরণগুলোতে একই ধরনের অলংকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সম্ভবত পরবর্তীতে পরিবর্তন ও সংযোজনের সময় তা হারিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

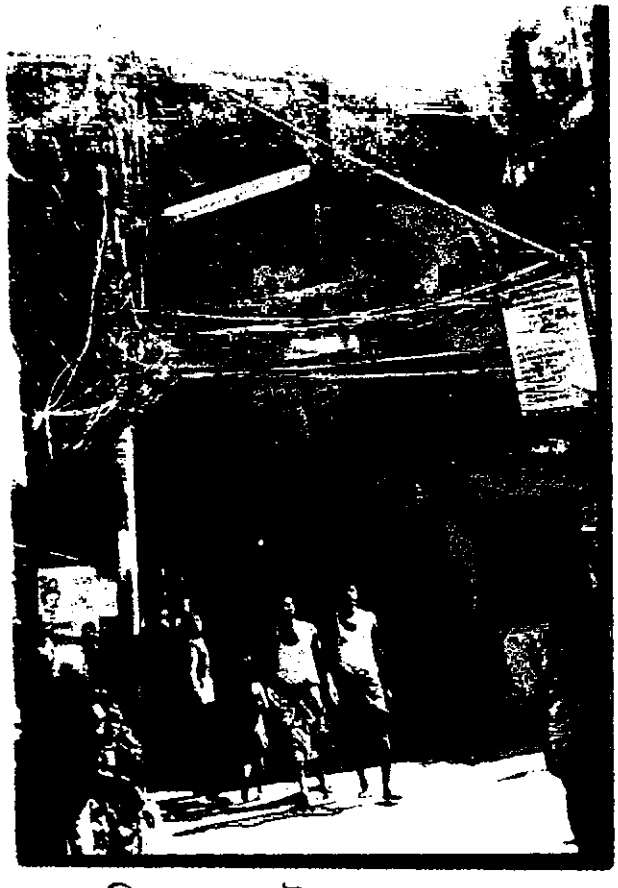

চিত্র-৫৮ঃ উত্তর তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ আলোচনাঃ

বাংলায় বিকশিত কাটরাগুলো মূলতঃ উত্তর ভারতীয় সরাইখানার ধারণা থেকে নেয়া হয়েছে। ছোট কাটরা মুঘল বাংলার কাটরা স্থাপত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত। এটি সমকালীন ঢাকার বানিজ্যিক গুরুত্বের পরিচয় বহন করছে। এর সুরক্ষিত তোরণগুলো বনিক বা মুসাফিরদের সম্পদ রক্ষায় রাজকীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

রমনা, ঢাকা।

ঢাকার সরওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং শিশু একাডেমীর পশ্চিমে একটি মসজিদ ও সমাধির কমপ্লেক্স রয়েছে। এটি হাজী খাজা শাহবাজের কমপ্লেক্স নামে সমাধিক পরিচিত। এটি চারদিকে নীচু প্রাচীরে ঘেরা এবং পূর্ব দিকে রয়েছে একটি সুদৃশ্য প্রবেশ তোরণ।

নির্মাণ কালঃ

তোরণে কোন শিলালিপি না থাকলেও মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের উপরে যে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে তা থেকে এর নির্মাণ কাল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী মসজিদটি শাহজাদা মুহাম্মদ আজমের সুবেদারী আমলে ১০৮৯ হিজরী/ ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে খাজা শাহবাজ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। মুন্সী রহমান আলী তায়েশের বর্ণনা থেকে জানা যায়, উক্ত ব্যক্তি আজমের সুবাদারী আমলে রাজমিস্ত্রি ছিলেন।[২৩২] তাইফুর তাঁকে উল্লেখ করেছেন "মালিক-উট-তুজ্জার (Malik-ut-tujjar)" বা প্রধান ব্যবসায়ী হিসেবে।[২৩৩] যতীন্দ্রমোহনের লেখা থেকে জানা যায়, হাজী খাজা শাহবাজ কাশ্মীর থেকে এসে টংগীতে বসবাস করতে থাকেন এবং প্রতিদিন সেখান থেকে নিজ মসজিদে নামাজ পড়তে আসতেন। তবে তিনি সমসাময়িককালের

---

২৩২. মুনসী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা* (ডক্টর আ.ম.ম. শরফুদ্দীন অনুদিত), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন-১৯৮৫, পৃ. ১৮৬।

২৩৩. S.M. Taifur, *Glimses of Old Dhaka,* Dacca: Lulu Bilkis Banu,1956 A.D. p.159.

Dhaka University Institutional Repository

একজন মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিরাটাকার তোরণ বিশিষ্ট কমপ্লেক্স নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

তোরণের অবস্থান মসজিদের প্রধান প্রবেশ খিলান বরাবর হলেও এর সম্মুখের খোলা অঙ্গন হতে অনেক পূর্বে এবং সমাধির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত হওয়ায় তোরণটিকে এই কমপ্লেক্সের সর্বশেষ নির্মাণ হিসেবে অনুমান করা যায়।

বর্তমান অবস্থাঃ

পরিকল্পনার ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তোরণটি আদি অবস্থায় এখনও টিকে রয়েছে। তবে এর সম্মুখে বহু নতুন নতুন ইমারত নির্মাণ করে বহির্ফাসাদটির সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ তোরণের প্লাষ্টারে শেওলা ধরে গেছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণঃ

সাধারণ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তোরণটির পূর্ব ফাসাদ উত্তর-দক্ষিণে ৫.৬৫ মিটার বিস্তৃত (ভূমি পরিকল্পনা-২১)। এর কেন্দ্রে রয়েছে ২.৬০ মিটার বিস্তৃত এবং ১.০৬ মিটার গভীর ইউয়ান। এটি একটি প্যানেলকৃত ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। ফ্রেমটি মূলত: পার্শ্ববর্তী পিলাষ্টারের গায়ে নির্মিত হয়েছে যার উভয়পাশে রয়েছে সংযুক্ত কোণা বুরুজ। সামগ্রিকভাবে ফাসাদটি কুমিল্লার শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণের অনুরূপ। ইউয়ানের উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে ১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি বেদী রয়েছে। এগুলোর কাজ সম্পর্কে জানা যায় না। অন্যান্য তোরণের ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবেশের মূল খিলানটি ইউয়ানের কেন্দ্রেই স্থাপিত হয়েছে। এটি উত্তর-দক্ষিণে ১.১০ মিটার বিস্তৃত এবং পশ্চিম ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলানের সাথে সংযুক্ত। এই ফাসাদটি শাহ্ সুজা মসজিদের ন্যায় তিন খিলান নিয়ে গঠিত (চিত্র-৫৯) । এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৬ মিটার যা পূর্ব ফাসাদ অপেক্ষা ৩৫ সে.মি. বেশি। তবে এগুলো খিলান না হয়ে অনেকটা কড়িবর্গায় নির্মিত দরজার আকৃতি ধারণ করেছে। শাহ্ সুজা মসজিদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

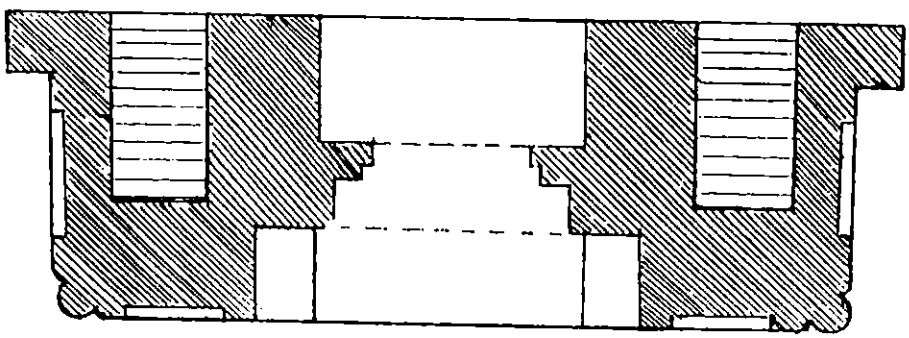

ভূমি পরিকল্পনা-২১ঃ হাজী খাজা শাহবাজের কমপ্লেক্সের দক্ষিণ তোরণ

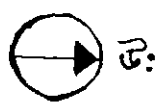

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৯ঃ হাজী খাজা শাহবাজের তোরণ(পশ্চিম ফাসাদ)

Dhaka University Institutional Repository

এই তোরণের স্থাপত্যিক মিল এবং মুঘল যুগে এরূপ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি এটিকে পরবর্তী সংস্কারের পক্ষেই প্রমাণ দেয়। কেন্দ্রীয় খিলানটি ১.৮০ মিটার বিস্তৃত এবং অনেকটা ব্যারেল ভল্টের ন্যায় আচ্ছাদনে আবৃত। তবে ভল্টটি অপেক্ষাকৃত সমতল। পার্শ্ববর্তী খিলানগুলোতে ছাদে উঠার সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে। তোরণের ছাদ সমতল এবং পূর্ব ফাসাদের কার্নিশটি এর উপরে উঠে গেছে। সম্পূর্ণ তোরণের কার্নিশে রয়েছে মারলন নক্‌শা।

তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ ফাসাদ নীচু বহির্প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত। এগুলোর পশ্চিম দিকের কিছু অংশ অন্যান্য অংশ থেকে ২৭ সে.মি. অগ্রসর । প্রাচীরের ১ মিটার উচ্চতা ব্যতীত সম্পূর্ণ অংশ প্যানেল দ্বারা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়েছে (চিত্র-৬০)।

অলংকরণঃ

অলংকরণে মুঘল যুগে বাংলা স্থাপত্যের বহুল ব্যবহৃত প্যানেল নক্‌শা তোরণটিতে স্বল্প পরিসরে গৃহীত হয়েছে।

সাধারণ আলোচনাঃ

হাজী খাজা শাহবাজ কমপ্লেক্সের তোরণের পরিকল্পনা ও স্থাপত্যশৈলীর সাথে কুমিল্লার শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণের মিল থাকায় মনে করা যায়, মুঘল যুগে মসজিদ বা সমাধির তোরণ নির্মাণে সাধারণত এই রীতিটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬০: তোরণের উত্তর ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মুহাম্মদ মসজিদের তোরণ

অবস্থান ঃ

জেলা-কিশোরগঞ্জ, থানা-পাকুন্দিয়া, ইউনিয়ন-এগার সিন্ধুর।

মুহাম্মদ শাহের মসজিদটি বাংলার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সাধারণ রীতি নিয়ে গঠিত হলেও এর প্রবেশ তোরণটি একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী (চিত্র-৬১)। এটি কিশোরগঞ্জ সদর হতে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। সম্ভবত নির্মাতার নামানুযায়ী মসজিদটি 'শাহ মুহাম্মদের মসজিদ' নামে পরিচিত।[২৩৪]

নির্মাণ কাল ঃ

মসজিদটির শিলালিপি হারিয়ে যাওয়ার ফলে এর সঠিক নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। এ.এইচ. দানীর মতে, এটি ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নির্মিত।[২৩৫] জানা যায়, ১১৪৫ বঙ্গাব্দের ২৩ শে মাঘ তারিখে মসজিদের ব্যয় নির্বাহার্থে জঙ্গলবাড়ী হতে দেয়া লাখো জমি ৯//০ এক কানি সাড়ে সাত গন্ডা জমির দলিল রয়েছে।[২৩৬] এই মসজিদের নির্মাতা শাহ্ মুহাম্মদ প্রথম জীবনে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু ফকির নিরগিণ শাহের অনুগ্রহে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন এবং প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।[২৩৭] ক্যাথরিন বি

---

২৩৪. A.H.Dani , *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D., p. 252.

235. A.H. Dani , *Ibid,* p. 252.

২৩৬. *পাকুন্দিয়া উপজেলার কথা* , পৃ.৬৩ , সূত্রঃ *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস* , জেলা ইতিহাস প্রনয়ণ কমিটি, ১৯৯৩ , পৃ . ৯৪.

২৩৭. *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস* , জেলা ইতিহাস প্রনয়ণ কমিটি , ১৯৯৩ , পৃ . ৯৪.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬১ঃ তোরণ সমেত শাহ্ মুহাম্মদ মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

আশার, মসজিদটি ১৭শ শতকের শেষভাগের নির্মাণ বলে উল্লেখ করেন।[২৩৮] তবে মসজিদ এবং এর তোরণের স্থাপত্য পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে অনুমান করা যায়, এটি সপ্তদশ শতকে অন্তত: ফতেহ শাহের সমাধির সমসাময়িক বা তার পরবর্তী কালে নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান অবস্থা ঃ

শাহ্ মুহাম্মদের মসজিদটি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক কিছুটা সংস্কার সাধন সাপেক্ষে এর আদি পরিকল্পনা ও অবয়ব নিয়ে বিদ্যমান।

পরিকল্পনা ও বিবরণ ঃ

একটি প্রাচীর ঘেরা বাঁধানো চত্তরের পশ্চিম বাহুতে মসজিদ এবং পূর্ব বাহুর কেন্দ্রে নির্মিত হয়েছে স্থানীয় ভাবে বালাখানা নামে পরিচিত মসজিদের সুদৃশ্য তোরণ (চিত্র-৬২)। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তোরণটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৭.৬৪ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ৪.১৭ মিটার (ভূমি পরিকল্পনা-২২)। এর পূর্ব ফাসাদ তিনটি খিলানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উন্মুক্ত। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৯০ সে.মি. এবং উচ্চতা ১.৭০ মিটার। প্রবেশ খিলানটির দেয়ালের ঘনত্ব ৭৪ সে.মি.। এটি একটি উদ্‌গত আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ফ্রেমটির উত্তর ও দক্ষিণ বাহু প্রায় ৬০ সে.মি. করে চওড়া। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই উপরের দিকে একটি করে খাঁজ খিলানের নক্‌শাযুক্ত কুলঙ্গী নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পাশে নির্মিত খিলান দুটো বদ্ধ। এগুলোও অনেকটা আয়তাকৃতির ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত। এক্ষেত্রে ফ্রেমগুলো দেয়াল হতে সামান্য উদ্‌গত এবং কুলঙ্গী বিশিষ্ট। কুলঙ্গীগুলোও অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সংখ্যায় দুটি করে। এর মধ্যে উপরেরটি গোলাকার এবং নীচেরটি খিলানাকৃতির।

---

২৩৮. C.V.Ashar, *Inventory Key Monuments, Ibid,* p. 64

Dhaka University Institutional Repository

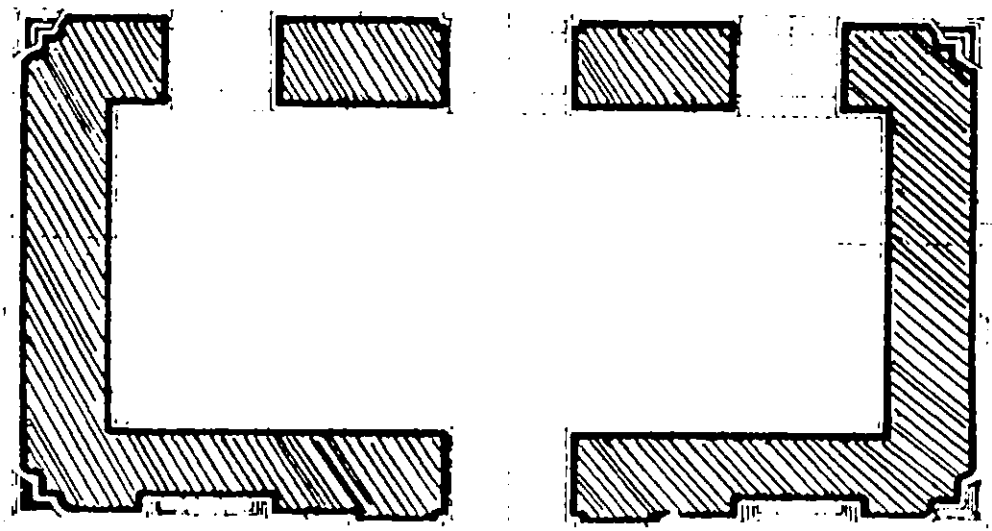

ভূমি পরিকল্পনা ২২ঃ শাহ মুহাম্মদ মসজিদের তোরণ

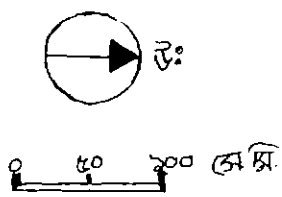

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬২ঃ শাহ্ মুহাম্মদ মসজিদের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের উত্তর-দক্ষিণ কোণগুলোতে চারটি করে বেন্ডযুক্ত ত্রিকোণাকৃতির বুরুজ নির্মাণ করা হয়েছে।

তোরণের অভ্যন্তর ভাগ সাদামাটা এক কক্ষ বিশিষ্ট। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৬.৯০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৩৪ মিটার। এর প্রত্যেক বাহুতে কুলঙ্গী নির্মিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে এর সংখ্যা মোট চারটি। এর মধ্যে সর্বোচ্চের কুলঙ্গীটি চালার মধ্যবর্তী মিলন স্থানের নীচে দেয়ালে খিলানাকারে নির্মিত এবং তা উন্মুক্ত। সম্ভবত এগুলো অভ্যন্তরভাগে আলো প্রবেশের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। অভ্যন্তরের আচ্ছাদনটি ৬০ সে.মি. বাঁকিয়ে নির্মিত হয়েছে। মধ্যবর্তী বাহুর ক্ষেত্রে কার্নিশটি এর ভিতে ৩.০৫ মিটার উচ্চতায় নির্মিত হয়েছে আর এর মধ্যবর্তী স্থানে উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৩.৬৬ মিটার। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের কার্নিশের ক্ষেত্রে এই উচ্চতা দাঁড়িয়েছে এক পাশে ২ মিটার আর কেন্দ্রে তা বেড়ে হয়েছে ২.৬০ মিটার।

তোরণের পশ্চিম ফাসাদে যে তিন খিলানের প্রবেশ পথ রয়েছে তার সবগুলোই উন্মুক্ত এবং কেন্দ্রীয় খিলানপথটি পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথের অবয়ব এবং আয়তনে নির্মিত। প্রত্যেকটি খিলান আয়তাকার কাঠামোর অভ্যন্তরে নির্মিত এবং কেন্দ্রীয় খিলানের কাঠামোর ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্‌গত ভাব বিদ্যমান। এগুলো পূর্ব ফাসাদের ন্যায় কুলঙ্গী বিশিষ্ট।

বাইরের দিকে ইমারতের আচ্ছাদনটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। চালার উপরে দুই বাহুর মিলনস্থলে অত্যন্ত সুন্দর পাতার সারির অলংকরণ হয়েছে। আর উপরের তিন কোণা অংশটির শেষে কলার মোচার ন্যায় শিরযুক্ত নক্‌শা রয়েছে। চালাটির নীচে চারটি করে হালকা বেন্ড রয়েছে এবং চালার উপরের চার দিকেও অনুরূপ বেন্ড রয়েছে। তবে চালাটি দেয়ালের ঘনত্বের একই ঘনত্ব নিয়ে নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ ঃ

তোরণটির অলংকরণে মুঘল যুগে বাংলায় নির্মিত অন্যান্য ইমারতের ন্যায় প্যানেল নক্শার ব্যবহার করা হলেও এগুলো অপেক্ষাকৃত গভীর। পূর্ব ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলানফ্রেমের উপরের বাহুতে রয়েছে প্লাষ্টার কেটে করা ষ্টাকো নক্শা। এতে সামারা রীতিতে অনেকটা পাতার মটিফের শিরার অভ্যন্তরে তিন পাতার নক্শা করা হয়েছে। এরূপ পাঁচ পাপড়ির ফুলের নক্শা মুঘল ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর চালার মধ্যবর্তী বাহুতে যে কলার মোচার ন্যায় অলংকরণ রয়েছে তাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

নির্মাণ উপাদান ঃ

তোরণটি ইটের তৈরী এবং এর উপরিভাগ প্লাষ্টারকৃত। তবে এর ভিতে পাথরের ব্যবহার লক্ষ্যণীয় এবং সম্ভবত সম্পূর্ণ তোরণটি পাথরের ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা ঃ

তোরণটি বাংলা স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। এটি এ অঞ্চলের চির প্রচলিত দোচালা বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণের রীতিতে নির্মিত হয়েছে। বাংলায় দোচালা রীতির বহু ইমারতের নিদর্শন পাওয়া গেলেও তোরণ হিসিবে এর ব্যবহার এক অভিনবত্বের সূচনা করেছে। এরূপ তোরণ ইতিপূর্বে বাংলার কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। তবে দোচালা রীতির নির্মাণ এটাই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে গৌড়ে নির্মিত ফতেহ শাহের সমাধি (মৃঃ ১৬৫৭খ্রিঃ) নামে পরিচিত ইমারতটি সম্ভবত দোচালা রীতিতে নির্মিত ইমারতের প্রথম টিকে থাকা দৃষ্টান্ত।[২৩৯] পরবর্তীতে বাংলা তথা উত্তর ভারতে এই রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

---

২৩৯. C.B. Asher, Inventory Key Monuments, *Ibid,* p. 83.

Dhaka University Institutional Repository

সাত গম্বুজ মসজিদের তোরণ

অবস্থানঃ

জেলা: ঢাকা, মৌজা: জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর।

মুঘল শাসনামলে বাংলায় যে কয়েকটি মসজিদ তোরণসমেত নির্মিত হয়েছে সাত গম্বুজ মসজিদটি সেই সারির অন্যতম। এটি সমকালীন রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত। মসজিদটির চার কোণের দ্বি-তল প্যাভিলিনের বৈশিষ্ট্যটি একে অন্যান্য মুঘল মসজিদ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করলেও এর তোরণটি সরল অবয়ব নিয়ে বর্তমান (চিত্র-৬৩)।

নির্মাণ কালঃ

সাত গম্বুজ মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। সাধারণত ধরে নেয়া হয়, স্থাপনাটি সুবেদার শায়েস্তা খান নির্মাণ করেছেন। এরূপ ধারণার কারণ হলো, এই সুবেদারের সময়ে ঢাকার মিডফোর্ট এলাকায় নির্মিত শায়েস্তা খান মসজিদ (আ: সপ্তদশ শতক), চক বাজারের শাহী মসজিদ (১৬৭৬ খ্রিঃ), লালবাগ কমপ্লেক্স মসজিদের (১৬৭৮-৭৯ খ্রিঃ) স্থাপত্যরীতির সাথে আলোচ্য মসজিদের সাদৃশ্য। ফলে স্থাপত্যরীতি বিবেচনায়ও মসজিদটি সপ্তদশ শতকে শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।[২৪০] এর তোরণটি কিছুটা উঁচু একটি প্লাটফর্মের পূর্ব বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে একই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত হওয়ায় সহজেই অনুমান করা যায়, এটি একই সময়ে নির্মিত হয়েছে।

---

২৪০. A.H.Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan – 1957 A.D. p. 200. C. B. Ashar, Inventary key Monuments in *The Islamic Heritage of Bengal*, (edt) George Michell, Unesco- 1984 A.D. p. 61.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬৩ঃ তোরণ সমেত সাত গম্বুজ মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থাঃ

১৮১৪ সালে ডয়লি সাত গম্বুজ মসজিদের একটি মনোরম চিত্র অংকন করেন। চিত্রটিতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত মসজিদটি কিছুটা ভগ্নদশায় পতিত হয়েছে বলে মনে হয়। রহমান আলী তায়েশের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কোম্পানী আমলে ধানমন্ডি এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেলে সাত গম্বুজ মসজিদটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নবাব আহসানুল্লাহ এর সংস্কার সাধন করেন।[২৪১] সম্ভবত একই সময়ে তোরণেরও সংস্কার সাধিত হয়েছে। এর বর্তমান অবয়ব এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণ দেয়। সংস্কারকৃত মসজিদের ন্যায় তোরণটিও এর আদি পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যমান।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীঃ

একটি বিরাটাকার প্লাটফর্মের পশ্চিম বাহুতে অবস্থিত মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার বরাবর পূর্ব বাহুতে নির্মিত হয়েছে। প্লাটফর্মকে ঘিরে যে নীচু দেয়াল রয়েছে তা তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে মিশে গেছে। মূল পরিকল্পনায় তোরণটি আয়তাকারে নির্মিত হলেও এর উভয়পাশে সিঁড়ির ন্যায় ধাপ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য মুঘলযুগে টিকে থাকা অন্যান্য তোরণ অপেক্ষা একে কিছুটা স্বাতন্ত্র দিয়েছে (ভূমি পরিকল্পনা-২৩)। সুলতানী যুগে বাগের হাটে নির্মিত খান জাহানের সমাধি কমপ্লেক্সের তোরণগুলোতে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রথম লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ধাপের সংখ্যা মাত্র তিনটি এবং আকৃতিগত দিক থেকে এগুলো সম্পূর্ণ আলংকারিক। কিন্তু আলোচ্য তোরণের এই বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত শুধু আলংকারিক নয়, বরং এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। অনুমান করা হয়, তোরণের উপরে দাঁড়িয়ে আজান দেয়ার জন্য সিঁড়িগুলো নির্মিত হয়েছে। মূল মসজিদের চার কোণের দ্বি-তল প্যাভিলিয়নে উত্তরণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়া একই শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকার হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ (১৬৭৯ খ্রিঃ) ও কুমিল্লার শাহ্ সুজা

---

[২৪১]. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী- ১৯৯৩, পৃ. ২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

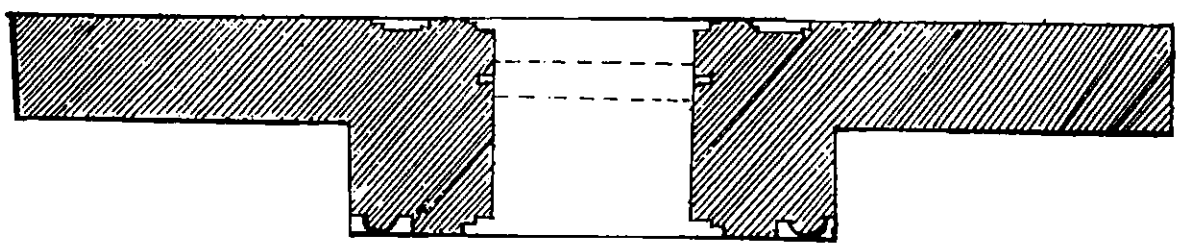

ভূমি পরিকল্পনা-২৩ ঃ সাত গম্বুজ মসজিদের তোরণ

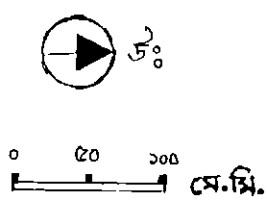

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের তোরণে সিঁড়ির মাধ্যমে ছাদে উঠার ব্যবস্থা এ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ দেয়। সম্ভবত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হওয়ায় আলোচ্য তোরণের সিঁড়িগুলো বাইরে নির্মিত হয়েছে। সিঁড়ি ব্যতীত মূল তোরণটি এক খিলান বিশিষ্ট সরল ইমারত। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৩.১৮ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ১.৪৫ মিটার। এর পূর্ব ফাসাদের কেন্দ্রে ক্ষুদ্রাকার ইউয়ান সম্বলিত প্রবেশ খিলান রয়েছে। খিলানটি ১.৩০ মিটার উন্মুক্ত এবং আয়তাকার ফ্রেম দ্বারা সীমায়িত। তোরণের উভয় কোণে সরু টারেট এর সম্পূর্ণ উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে। এরূপ টারেটের উপস্থিতি মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উভয় পাশে দেখা গেলেও তা ক্ষুদ্র গম্বুজে আবৃত। তোরণের কোণা বুরূজে কোন গম্বুজ নেই। বুরূজের ভিতগুলো চমকপ্রদভাবে অনেকটা ফুলদানীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র আয়তাকার মঞ্চের উপর স্থাপিত। এরূপ ভিত সমেত বুরূজের ব্যবহার হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদের তোরণে, কুমিল্লার শাহ্ সুজা মসজিদের তোরণসহ পরবর্তীকালে নির্মিত বহু ইমারতে বিশেষ করে মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে নির্মিত প্রায় সকল ইমারতে লক্ষ্য করা যায়। যাহোক, বুরুজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তোরণের কার্নিশে মারলন নক্শা দ্বারা হয়েছে। কার্নিশটি বুরুজসহ সমতল ছাদের উপরে উঠে গেছে।

তোরণের অভ্যন্তরে কোন কুলঙ্গী নেই। তবে নিম্নভাগে দুটি ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র রয়েছে। এরূপ ছিদ্র অন্য কোন তোরণে নেই।

তোরণের পশ্চিম ফাসাদটি পূর্বের ফাসাদ অপেক্ষা সরল (চিত্র-৬৪)। এর কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের উভয়পাশে দুটি করে কুলঙ্গী রয়েছে। উভয়পাশের সিঁড়িগুলো থেকে পূর্ব ফাসাদটি কিছুটা অগ্রসর হলেও এই ফাসাদে মিশে গেছে এবং একটি একক অবয়ব ধারণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬৪ঃ তোরণের পশ্চিম ফাসাদ

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ

তোরণটি সম্পূর্ণ প্লাষ্টাকৃত এবং প্যানেল নক্শায় সজ্জিত। এর সম্মুখ ফাসাদের প্যানেলগুলো অগভীর হলেও অভ্যন্তরে কুলঙ্গীর আকৃতি ধারণ করেছে। কার্নিশে অন্ধ মারলন অলংকরণ এর সজ্জায় পূর্ণতা এনেছে। তবে আকৃতিগত ক্ষুদ্রতার মত অলংকরণেও সল্পতা প্রাধান্য পেয়েছে।

সাধারণ আলোচনাঃ

সাত গম্বুজ মসজিদের তোরণে এ সময়ে বাংলায় বিকশিত মুঘল রীতির সাবলীলতা ফুটে উঠেছে। তবে কাঠামো ও অলংকরণে জাকালোতা না থাকলেও মসজিদের সম্মুখে এর উপস্থিতি একে আলাদা মর্যাদা দান করেছে এবং এ অঞ্চলের জামী মসজিদ বা প্রধান মসজিদ রূপে প্রকাশ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্থাপত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, স্থাপত্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে বাংলায় নির্মিত তোরণগুলো সমকালীন ইতিহাসের চরিত্রই প্রকাশ করে। শিলালিপির সাক্ষ্য ও অন্যান্য উৎস থেকে এ সময়কালের মধ্যে পঞ্চাশটিরও অধিক তোরণের নির্মাণ সম্পর্কে জানা গেলেও বর্তমান গবেষণায় মোট পঁচিশটি টিকে থাকা তোরণ পাওয়া গেছে। এগুলো বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায় অবস্থিত। প্রাপ্ত তোরণের সবই মসজিদ, সমাধি, স্মৃতিসৌধ, দুর্গ, প্রাসাদ, নগর, সরাইখানা প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন উৎস থেকে একক বা স্বাধীন তোরণ নির্মাণের সাক্ষ্য পাওয়া গেলেও কোন নিদর্শন এখন আর টিকে নেই।[২৪২] সমকালীন স্বাধীন সুলতান ও মুঘল শাসনামলে সুবেদারদের অধীনে নির্মিত এই তোরণগুলোর বেশিরভাগ শিলালিপিবিহীন বিধায় নির্মাণকাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংযুক্ত ইমারতের শিলালিপির সাহায্য নেয়া হয়েছে। শিলালিপির ভিত্তিতে বাগেরহাটে অবস্থিত খান জাহানের সমাধির তোরণগুলো বাংলায় এই শ্রেণীর স্থাপত্যের আদি নিদর্শন হয়ে টিকে আছে। কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ও স্থাপত্যিক বিবেচনায় এর বহু পূর্ব থেকে তোরণ নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ করে গৌড় দুর্গে অবস্থিত চিকা ইমারতটির সাথে পান্ডুয়ার একলাখী সমাধির পরিকল্পনা, আঙ্গিক গঠন এমনকি পরিমাপগত সাদৃশ্য থাকায় স্থাপত্য বিশারদগণ একে সমসাময়িক নির্মাণ বলে উল্লেখ করেন। এর ভিত্তিতে চিকা ইমারতটিকে বাংলায় টিকে থাকা তোরণ স্থাপত্যের আদি নিদর্শন বলা যায়। শিলালিপি না থাকলেও একই দুর্গের প্রধান তোরণ দাখিল দরওয়াজা ও গৌড় নগরীর উত্তর তোরণ কোতোয়ালী দরওয়াজার নির্মাণশৈলীর

---

২৪২. নিম দরওয়াজার শিলালিপিতে এটিকে স্রোতস্বীনির ব্রীজের উপরে নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে – A. Karim, *Ibid* (*Corpus*) , ASB- 1992, pp. 167-168.

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এগুলো খান জাহানের সমাধির তোরণের পূর্বে স্থান করে নেয়। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী, আলোচ্য সময়কালের মধ্যে মুঘল যুগে নির্মিত তোরণের আদি নিদর্শন পান্ডুয়া কুতুবশাহী মসজিদের তোরণ (নিঃ ১৫৮৫ খ্রিঃ) হলেও ঢাকার বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণটিতে (নিঃ ১৬৪৪ খ্রিঃ) মুঘল রীতির স্বার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এ সময়ে প্রাপ্ত নিদর্শনের বেশিরভাগই শিলালিপিবিহীন। ফলে বিভিন্ন স্থাপত্য বিশারদের অভিমত, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও সমকালীন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এগুলোর কাল নির্ণয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকার মুহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের তোরণটিকে সবশেষে স্থান দেয়া হয়েছে।

তোরণগুলোর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সাধারণত ইমারতের ব্যবহারিক দিকের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এর উপর ভিত্তি করে তোরণগুলোকে দুটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১.প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত ও

২.আনুষ্ঠানিক

দুর্গ, প্রাসাদ কিংবা নগরীর তোরণগুলো সাধারণত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে গঠিত। গৌড় দুর্গের প্রধান তোরণ হিসেবে পরিচিত দাখিল দরওয়াজা (পঞ্চদশ শতক), লোকচুরি দরওয়াজা (সপ্তদশ শতক), গৌড় নগরীর দক্ষিণ বাহুতে অবস্থিত কোতোয়ালী দরওয়াজা (পঞ্চদশ শতক), ঢাকার বড় কাটরার তোরণ (১৬৪৪ খ্রিঃ), ছোট কাটরার তোরণ (সপ্তদশ শতক), লালবাগ কমপ্লেক্সের তোরণ প্রভৃতির সম্মুখভাগে বিরাটাকার পিস্তাক, খিলান, ইউয়ান এবং অভ্যন্তরে প্রহরী কক্ষ নিয়ে নির্মিত হয়েছে। এরূপ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ইমারতের কঠোর নিরাপত্তা ও নির্মাতার ক্ষমতা, মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও সম্পদের প্রাচুর্য প্রকাশ করে। শিলালিপির সাক্ষ্য থেকেও তোরণের এরূপ চরিত্র প্রকাশ পায়। ৯৪৩ হিজরীতে মাহমুদ শাহ কর্তৃক একটি দুর্গের তোরণ নির্মাণের শিলালিপিতে এটিকে 'রাজ্য ও জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য নির্মিত হয়েছে' বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৪৩] মুসলিম স্থাপত্যের সূচনালগ্ন থেকেই দুর্গ, প্রাসাদ কিংবা নগরীর তোরণ নির্মাণে এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ট্রান্স জর্ডানের মরুভূমিতে অবস্থিত খিরবাত আল-মাফজার (অষ্টম শতাব্দী), বাগদাদ নগরী (অষ্টম শতাব্দী), উখাইদির প্রাসাদের তোরণে(অষ্টম শতাব্দি) এরূপ বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়।[২৪৪] তবে পরবর্তীকালে তুঘলক শাসক ফিরোজশাহ্ (১৩৫১-৮৮ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত কোটলা ফিরোজশাহের প্রধান তোরণ, মুঘল যুগে নির্মিত দিল্লীর লাল দুর্গের (১৬৩৯ খ্রিঃ) পশ্চিম বাহুতে অবস্থিত লাহোর গেট, দক্ষিণ বাহুতে অবস্থিত দিল্লী গেটে যে বক্রদ্বার (Bant entrance) লক্ষ্য করা যায়,[২৪৫] তা বাংলায় গৃহীত হয়নি। তাছাড়া মুঘল যুগে নির্মিত জল দুর্গের তোরণগুলো অনেকটা আনুষ্ঠানিক অবয়ব নিয়ে গঠিত। সাধারণত জলপথে আগত আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্য দুর্গগুলোর নদীর দিকের বিরাটাকার র‍্যামপার্টটি মূল প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করতো। তোরণগুলো স্থল পথে সৈন্যদের প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হতো বিধায় এগুলোর তেমন প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা ছিল না।

অন্যদিকে মসজিদ, সমাধি, এবং স্মৃতিসৌধের তোরণগুলো আনুষ্ঠানিক অবয়ব নিয়ে গঠিত। সাধারণত আয়তাকার এবং প্রায় একই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে নির্মিত এই স্থাপনার কেন্দ্রে একটি প্রবেশ খিলান আয়তাকার প্যানেলের অভ্যন্তরে প্রোথিত এবং উভয় পাশে আয়তাকার পোস্তা দ্বারা সীমায়িত। অভ্যন্তরে এক বা একাধিক কুলঙ্গী থাকলেও অনুচ্চ বহির্প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে এগুলোর অবস্থান আনুষ্ঠানিক চরিত্রই প্রকাশ করে। তবে তোরণগুলোর কার্যকরী ভূমিকাও ছিল। এ সকল তোরণ ও এর সাথে সংযুক্ত দেয়াল পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে একে আলাদা করার মাধ্যমে একদিকে

---

২৪৩. এলাহী বক্স শিলালিপিটি গভীর জঙ্গলে একটি কবরের সামনে থেকে উদ্ধার করেন। তোরণটি চিহ্নিত করা যায়নি। সূত্র - আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা- বাংলা একাডেমী ১৯৯৪, পৃ. ১১৭-১৮, ১৭০।

২৪৪. Oleg Grabar and Richerd Etinghausen, *Ibid*, Penguin Books Ltd, pp. 50, 77,81.

২৪৫. C. B. Asher, *The New Cambridge History of India-Architecture of Mughal India*, Chambridge University Press 1992, p. 192. (লাল দুর্গের ভূমি নক্শা দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

ইমারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে এর পবিত্রতা রক্ষা করে। বিশেষ করে মসজিদের তোরণগুলোর আরও অধিক কার্যকরী ভূমিকা ছিল। মসজিদের তোরণ নির্মাণ সংক্রান্ত যে কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তাতে এগুলোকে জামী মসজিদের তোরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪৬] আর জামী মসজিদ জুম্মার নামাজের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হতো। কেননা, এই নামাজের ক্ষেত্রে অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ অঞ্চলের বৃষ্টি বহুল আবহাওয়ার কারণে নির্মাণের প্রথম থেকেই সাহান ও রিওয়াকবিহীন মসজিদ পরিকল্পনা প্রাধান্য লাভ করে। ফলে নীচু দেয়াল নির্মাণ করে প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা হতো এবং প্রবেশের জন্য নির্মিত হতো তোরণ। তাছাড়া এই ব্যবস্থার দ্বারা জীবজন্তুর অনাচার থেকে মসজিদ এলাকার পবিত্রতাও রক্ষা করা হতো। আবার জামী মসজিদগুলো সাধারণত প্রশাসনিক কেন্দ্র বা নগরীর কেন্দ্রস্থলে সরাসরি শাসকদের কিংবা প্রশাসনিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হতো বিধায় তোরণগুলো মসজিদের মর্যাদা, সৌন্দর্যের পাশাপাশি শাসকদের গৌরবও প্রকাশ করতো।

সমাধির তোরণের ক্ষেত্রেও প্রায় একই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। বাংলায় যে কয়েকটি সমাধির তোরণ পাওয়া গেছে তার সবগুলোই সুফী-সাধকদের সমাধিতে অবস্থিত। এগুলো সমাধিস্থ ব্যক্তির স্মরণে তার গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নির্মিত হতো। পান্ডুয়ার আলাউল হকের সমাধির তোরণ, নুর কুতুবুল আলমের সমাধির তোরণের শিলালিপি তার পক্ষে প্রমাণ দেয়।[২৪৭] একই সাক্ষ্য থেকে যে কয়েকটি সমাধির তোরণ সম্পর্কে জানা যায় তার সবগুলোই সমকালীন বিভিন্ন সুফী-সাধকের সমাধির সাথে সম্পৃক্ত এবং বেশিরভাগই শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত। ফলে এ সকল সুফী-সাধকের সাথে শাসকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা তাঁদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

---

২৪৬ . কুতুবশাহী মসজিদটিকে জামী মসজিদ ব্যতীত সবগুলো মসজিদকেই জামী মসজিদ বলা হয়েছে বিধায় এই সাধারণ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।

২৪৭ . A. Karim, *Corpus,* p.409-11.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে নির্মিত তোরণগুলো যে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে তা সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই বাংলার স্বাধীন সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত স্থাপত্যে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়কাল বাংলা স্থাপত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভের সূচনাকাল বলে স্বীকৃত। এ অঞ্চলের স্থানীয় বাঁশ, মাটি ও খড় দিয়ে নির্মিত কুঁড়ে ঘর থেকে বাঁকানো কার্নিশ, চার কোণে অবস্থিত বুরুজ প্রভৃতি উপাদান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ ইট নির্মিত ইমারতে গৃহীত হয়েছে। বাংলায় নির্মিত তোরণ স্থাপত্যের আদি নিদর্শন গৌড়ের চিকা ইমারতটিতে এই স্বকীয় ধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইমারতটিতে পশ্চিম এশিয়া থেকে আনিত ভল্ট, খিলান প্রভৃতি উপাদান বাদ দেয়া হয়নি বরং উভয় উৎসের মধ্যে সমন্বয় সাধণের দ্বারা বাংলা স্থাপত্য একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে যা এ অঞ্চলের স্থাপত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে নির্মিত গৌড় দুর্গের পূর্ব বাহুতে অবস্থিত গোমতি দরওয়াজা, গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও খান জাহানের সমাধির তোরণসহ সমগ্র সুলতানী আমল জুড়ে নির্মিত তোরণগুলোতে বাংলা রীতির স্বার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। এরূপ সমন্বিত রীতির নির্মাণের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে। পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার শাসন তুর্কীদের হাত থেকে স্থানীয় ভূস্বামী রাজা গণেশের বংশের কাছে ক্ষমতা চলে যায়। ফলে তাদের চির পরিচিত চালাঘর থেকে গৃহীত উপাদান স্থায়ী ইমারতে স্থান করে নেয়। এটি ছিল শাসকদের আঞ্চলিক সত্ত্বার প্রকাশস্বরূপ। তবে বাংলা স্থাপত্যের ইতিহাসে সমন্বয়ধর্মী প্রকৃতির সূচনা হয়েছিল চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, যখন বাংলাকে দিল্লীর আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য শাসকগণ স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তাছাড়া মুসলমানগণ এ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও হিন্দু ভূস্বামীদের

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণে ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা। আর তাদের সাথে সমাজের প্রতিটি স্তরের ছিল সরাসরি যোগাযোগ । ফলে দিল্লী ও পশ্চিম এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসকগন তাঁদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং প্রশাসন পরিচালনার জন্য স্থানীয় ভূস্বামীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ইমারত নির্মাণেও তাদের নির্ভর করতে হয়েছে এ অঞ্চলে প্রাপ্ত সহজলভ্য এবং ঐতিহ্যবাহী উপাদান ইট, পোরামাটির ফলক ও স্থানীয় কারিগরদের উপর। ফলে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে শাসকদের আনিত পরিকল্পনা কারিগরদের দ্বারা নতুনরূপে সজ্জিত হয়। সমসাময়িককালে নির্মিত আদিনা মসজিদ এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করছে। এ সময়ে নির্মিত তোরণ টিকে না থাকলেও অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এগুলো আদিনা মসজিদে বিকশিত রীতিতেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের স্থাপত্যে স্থানীয় উপাদানের যে বৈপ্লবিক ব্যবহার সাধিত হয়েছে তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা যায় না। বাংলা স্থাপত্যের এই স্থানীয় রীতির প্রবক্তা জালালুদ্দিন মুহাম্মদ ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলিম। এ অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে তাঁর ছিল নিবিড় যোগসূত্র। ফলে স্থাপত্য নির্মাণে তার নিজস্ব ধারণা ও পছন্দের প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী উপাদান গম্বুজ, খিলান প্রভৃতি বাদ না দিয়ে তার সাথে স্থানীয় উপাদানের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এরূপ সমন্বিত রীতি গ্রহন ছিল একটি স্থানীয় সমন্বয়ধর্মী রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরীর প্রয়াস। জালালুদ্দিন ধর্মান্তরিত মুসলিম হওয়ায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ ছিল তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এরূপ বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা লাভের জন্য তিনি একটি সমন্বিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরীতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে একদিকে তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহন[২৪৮] করে মুসলিম উলামা

---

২৪৮. A. Karim, *Ibid*, (*Corpus*) p.170-176. এম আর তরফদার, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, ঢাকা-বাংলা একাডেমী ১৯৯৫,পৃ.২১০।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেছিলেন অন্যদিকে মুদ্রায় সিংহের মূর্তি[২৪৯] এবং রাজসভায় ব্রাহ্মণ্য আনুকূল্য প্রদর্শনের দ্বারা[২৫০] হিন্দু জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছিলেন। সমকালীন তোরণ নির্মাণে স্থানীয় ও বিজেতাগণ কর্তৃক আনিত উপাদানের একত্র সন্নিবেশন তার সমন্বিত রীতিরই পরিচায়ক। অলংকরণেও এই রীতির বিকাশ ঘটেছে। চিকা ইমারতের বহির্ফাছাদে উদ্‌গত ও প্রবিষ্ট রীতির প্যানেল বাংলার চালাঘরের বহির্দেয়াল থেকে নেয়া এবং অভ্যন্তরের শিকল ঘন্টা মটিফ হিন্দু ঐতিহ্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

পরবর্তী ইলিয়াছ শাহী ও হুসেন শাহী সুলতানদের শাসনামলে নির্মিত তোরণগুলোতে এরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ও বিভিন্ন অংশের সুষম বন্টনের দ্বারা উচ্চাঙ্গ পর্যায় উত্তরণ, সমকালীন শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় বহন করে। দ্বিতীয় ইলিয়াছ শাহী শাসনামলে নির্মিত দাখিল দরওয়াজার বিরাটাকার অবয়ব, এর সাথে সমন্বয় বিধান করে নির্মিত সম্মুখের বিরাটাকার খিলান ও পার্শ্ব বুরুজ এবং পোস্তাযুক্ত পিস্‌তাক, অলংকরণে টেরাকোটার প্রচুর অথচ সতর্ক ব্যবহার একে সমসাময়িক বাংলা স্থাপত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলায় এত বিরাটাকৃতির তোরণ নির্মিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এর কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা, সমকালীন শাসকদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, আর্থিক স্বচ্ছলতা, জমকালো ও বিলাসী জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়। এরূপ নির্মাণের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন ইতিহাস ও বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণে। জানা যায়, এ সময়কালটি ছিল (১৪৪২-১৪৮৬ খ্রিঃ) বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও বহির্রাক্রমন থেকে মুক্ত। দ্বিতীয় ইলিয়াছ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ শাহ্ সর্বপ্রথম একটি পরিকল্পিত দুর্গ-প্রাসাদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। তিনি

২৪৯.সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল*, কলকাতা -১৯৯৮ (সংশোধিত সংস্করণ) পৃ. ১৬৭-৬৮।

২৫০. তার রাজসভায় বৃহস্পতি মিশ্র ও তার সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রিসভায় ও সেনাবাহিনীতে উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিস্তারিত আ. করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ঢাকা-বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ , পৃ. ২৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

একটি পাঁচ খিলানের ব্রিজ দ্বারা নগরীর দক্ষিণ সীমা কোতোয়ালী দরওয়াজা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। এতে মনে হয়, তখন গৌড়ে জনসংখ্যার আধিক্য দেখা দিয়েছিল যাদের স্থান সংকুলানের জন্য নগরীর সীমা বৃদ্ধি করতে হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতি রাজধানীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পক্ষেই প্রমাণ দিচ্ছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সমসাময়িক কালে একই পরিকল্পনা বিশিষ্ট চান্দ দরওয়াজা, নিম দরওয়াজা, কতোয়ালী দরওয়াজা নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমগ্র সুলতানী শাসনামল জুড়েই রাজধানী ও প্রাসাদগুলো বহু তোরণে সজ্জিত ছিল, যার উল্লেখ পাওয়া যায় সমসাময়িককালে বাংলায় আগত বিভিন্ন পর্যটক ও সমকালীন সাহিত্যে। পঞ্চদশ শতকে পান্ডুয়ায় আগত চীনা পর্যটক মা হুয়ান গৌড় ও পান্ডুয়া বহু তোরণ শোভিত রাজপ্রাসাদে সমাদৃত হয়েছিলেন। তিনি এগুলোর প্রত্যেকটি সৈন্য দ্বারা রক্ষিত দেখতে পান।[২৫১] ষোড়শ শতকে আগত পর্তুগীজ পর্যটকের গৌড় দুর্গের বর্ণনায়ও একই চিত্র পাওয়া যায়। প্রাসাদের এরূপ বহু তোরণ বিশিষ্ট জটিল ব্যবস্থাপনা অষ্টম শতাব্দিতে আব্বাসীয় খলিফাদের নির্মিত জাওসাখ আল-খাকানী, বালকুয়ারা, ইস্তাবুলাক প্রভৃতি প্রাসাদে লক্ষ্য করা যায়।[২৫২] প্রাচীন পারস্যের প্রাসাদ স্থাপত্য থেকে এই পরিকল্পনা আব্বাসীয়রা গ্রহণ করেছিলেন।[২৫৩] ভারতবর্ষে তুঘলকগণ কর্তৃক নির্মিত দুর্গ প্রাসাদগুলোতেও প্রায় একই ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছিল। বাংলার শাসকদের এরূপ প্রাসাদ নির্মাণ তাদের বিলাসপুর্ণ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্যের ইঙ্গিত দেয়। পর্যটকদের বর্ণনা থেকেও তাদের বিলাসপূর্ণ জীবন বর্ণনা ও তার সাথে বাংলার আর্থিক স্বাচ্ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী আমলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল কৃষি নির্ভর। চর্তুদশ শতকের শুরু থেকেই বাংলাকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হতে দেখা যায় এবং এ সময়েই মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়।[২৫৪] পনের-ষোল শতকে এই সম্পর্ক ব্যাপক বিস্তৃতি

---

২৫১. সুখোময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত(*দুশো বছর*) পৃ.

২৫২. Oleg Grabar and Richard Etinghausen, p. 83.

২৫৩. Oleg Grabar and Richard Etinghausen, 50, 77,81.

২৫৪ .মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা-বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫(পূনর্মুদ্রণ),পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করলে দেশে সমৃদ্ধি দেখা দেয়।[২৫৫] মূলতঃ দাখিল দরওয়াজার ন্যায় বৃহৎ নির্মাণ এই সমৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয়েছিল। নগর সভ্যতার অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত এই তোরণ এই সময়ে জামী মসজিদ সমাধিসহ প্রায় সকল ইমারতে স্থান করে নেয়।

এ সময়ে জামী মসজিদগুলোতে তোরণ নির্মাণ সমকালীন শাসকগোষ্ঠির ধর্মীয় চেতনা, ইমারতের গৌরব ও নগর সভ্যতা বিস্তৃতির সাক্ষ্য দান করে। সমকালীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই জামী মসজিদগুলো সাধারণত নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হতো। যেমন- বাগেরহাটে অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ প্রভৃতি অবস্থান ছিল নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রে। পঞ্চদশ শতক ও এর পরবর্তী কালের জামী মসজিদগুলো শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তোরণসমেত নির্মিত হতে দেখা যায়। ফলে এই ধর্মীয় ইমারত নির্মাণ ও তোরণ দ্বারা সৌন্দর্য বিধান করে শাসকগণ নগরীতে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তথা ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ দ্বারা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতেন। আবার এই তোরণগুলো মসজিদের প্রকৃতি, শাসকদের ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সাথে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও শাসনের বিস্তৃতিরও পরিচয় দেয়। কেননা, মুসলমানগণ সাধারণত বিজিত অঞ্চলে সর্বপ্রথম জামী মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতানী বাংলায় নির্মিত যে কয়েকটি তোরণ টিকে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যকই হুসেন শাহী শাসনামলের নির্মাণ। শিলালিপির সাক্ষ্য থেকেও এ সময়ে প্রচুর তোরণ নিমার্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হুসেন শাহী শাসনামলে বাংলা সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। নতুন বিজিত অঞ্চলগুলোতে প্রশাসনিক কেন্দ্র , টাকশাল প্রভৃতি গড়ে উঠে এবং এ সকল কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনসাধারণ নিয়ে নাগরিক সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ মুর্শিদাবাদের ঝিল্লি অঞ্চলে নির্মিত তোরণসমেত জামী মসজিদটি এ অঞ্চলে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনের সাক্ষ্য বহন করে।[২৫৬] সমসাময়িক কালের শিলালিপি ও মুদ্রায় এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের

---

২৫৫ .বিস্তারিত- পূর্বোক্ত,পৃ ১০৪-০৬।

২৫৬. বর্তমান গবেষণায় এর অস্তিত্ব নির্ধারণ সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

আজম নগরে অবস্থিত সিকান্দারপুরের জামী মসজিদটি (৯৩৩ হিঃ) নসরত শাহের রাজ্যের সর্ব পশ্চিম সীমা নির্ধারণকারী হিসেবে চিহ্নিত।[২৫৭] রাজ্যের সর্বত্র এরূপ জামী মসজিদের নির্মাণ তাঁদের আর্থিক প্রাচুর্য প্রকাশ করে। মূলতঃ হুসেন শাহী শাসনামলে নগর সভ্যতার ব্যপক বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক দিকে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয় অন্যদিকে আরবী ও ফারসী সাহিত্য এবং চিত্রকলা চর্চা ধারা সমৃদ্ধি লাভ করে।[২৫৮] মোট কথা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমকালীন বাংলার রাজনীতি , অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা যে উন্নত রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, এ সময়ে নির্মিত তোরণগুলোর স্থাপত্যিক ভাষায় সেই রূপটিই ফুটে উঠেছে।

কিন্তু মুঘল যুগে নির্মিত বাংলার তোরণগুলো ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে। এগুলোর আকৃতিগত বিশালতা, পরিকল্পনার জটিলতা, সর্বোপরি প্লাষ্টারকৃত দেয়াল পূর্ববর্তী তোরণগুলো থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এগুলোর ইউয়ান বিশিষ্ট প্রবেশপথ, ঝুলন্ত বারান্দা, হালকা মুকারনাসের সজ্জা উত্তর ভারতের মুঘল তোরণগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু দিল্লী, আগ্রা, কিংবা লাহোরের তোরণগুলোর চেয়ে বাংলার তোরণগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম স্থাপত্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন ও হীনমন্য বলে মনে হয়। এর কারণ হিসেবে সাধারণত নির্মাণ উপকরণ ইটকে দায়ী করা হয়। কিন্তু মুঘলদের উত্তর ভারতে নির্মিত স্থাপত্যের উৎস পারস্যের বিরাটাকার তৈমুরীয় স্থাপত্য সম্পূর্ণ ইট দিয়ে নির্মিত। তাছাড়া প্রাক-মুসলিম বাংলায় যে সকল বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় তার সবগুলোই বিরাট আকৃতি নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। ফলে মুঘল বাংলার তোরণগুলোর স্থাপত্যিক অবয়ব নিয়ন্ত্রণের কারণ আরও গভীরে নিহীত। এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় মুঘলদের সমকালীন রাজনীতিতে। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বাংলার উপর মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চল প্রায় দুশো বছর পর উত্তর তারতের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

---

২৫৭ . A. Karim, *Ibid (Corpus),* p. 346.

২৫৮ . Richard M.Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier1204-1760,* America-University of California Press,1996, p.65, 66(Footnote) .

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাঁরা এ অঞ্চলে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে আসেননি বরং এটি ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল। রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁদের বহুদিন স্থানীয় জমিদারদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফলে তাদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যিক রূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা মুঘলদের কেন্দ্রে বিকশিত রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহন করেন, যার পরিচয় পাওয়া যায় ইসলাম খান কর্তৃক তার দুর্গে 'ঝরকা' সংস্কৃতি প্রবর্তনের মধ্যে।[২৫৯] এটি স্পষ্টভাবে একজন শাসকের স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে অন্যান্য কর্মচারী এবং জনসাধারণের সাথে সম্পর্কের দূরত্ব প্রকাশ করে। এভাবে তাঁরা বাংলা শাসনে 'অধীনতামূলক নীতি' গ্রহন করেছিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী মুঘলদের এই নীতির প্রভাব পড়লো এখানকার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একটি স্থানীয় উন্নত রীতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপ্রধানদের উত্তর ভারত থেকে আমদানীকৃত নতুন স্থাপত্যরীতি স্থান করে নিল। ফলে পূর্ববর্তী তোরণ নির্মাণে যে সর্বব্যাপী চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা মুঘল তোরণে লক্ষ্য করা যায় না। এ রীতির সাথে সাধারণ জনগোষ্ঠির সংযোগ ছিলনা বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা, তাদের এই উত্তর ভারতীয় রীতি রাজধানী এবং এর আশেপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে সুবাদার কিংবা রাজস্ব কর্মকতাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। প্রশাসনিক ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোতে স্থানীয় রীতির প্রাধান্য ছিল। কিশোরগঞ্জে অবস্থিত শাহ্ মুহাম্মদের মসজিদের তোরণে দোচালা রীতির ব্যবহারে স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে বিকশিত রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন মন্দির স্থাপত্যের নির্মাণ রীতি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় এগুলো কেন্দ্রে বিকশিত মুঘল রীতির প্রভাব থেকে মুক্ত এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলার চালা রীতির চর্চা অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের বাইরের তোরণ স্থাপত্যে এই বৈসাদৃশ্যের কারণ যে মুঘল শাসকদের জনবিচ্ছিন্নতা তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ অঞ্চলে তাদের গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকেও এই নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুবা বাংলা ছিল মুঘলদের রাজস্ব

---

২৫৯. মীর্জা নাথান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। এ অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্য হতে প্রচুর অর্থের সমাগম হলেও এগুলো সুবার কর হিসেবে সুবাদার এবং রাজকর্মচারীদের দ্বারা কেন্দ্রে চলে যেত।[২৬০] ফলে এ দেশে পূর্বের ন্যায় অর্থের প্রাচুর্য কমে যায়। এ সময়ে দ্রব্যমূল্যের মূল্য হ্রাস এবং রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন কমে যাওয়া- এই পরিস্থিতির পক্ষে প্রমাণ দেয়। মুঘলদের নির্মিত তোরণগুলোর বিরাট অথচ হীনমন্য অবয়ব এ অঞ্চলে তাদের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্রই প্রকাশ করে।

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নির্মিত তোরণগুলো সমকালীন ইতিহাসের নিরব সাক্ষী। এগুলো একদিকে বাংলার স্বাধীন ও আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার পরিচয় বহন করছে, অন্যদিকে বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণে আগত পরিবর্তনের চিহ্ন ধারণ করে আছে। উপরোক্ত আলোচনায় ক্ষুদ্র পরিসরে ইতিহাসের এই সত্যটিই প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

২৬০. তারা এ অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–১

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপিঃ

খান জাহানের সমাধির শিলালিপি

খান জাহানের সমাধিতে মোট তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপিটি নিম্নরূপঃ

انتقل العبد الضعيف المحتاج الى رحمة رب العالمين المحب لاولاد سيد المرسلين - المخلص للعلماء الراشدين المبغض للكفار والمشركين - والمعين الاسلام والمسلمين الخ خانجهان عليه الرحمة والغفران من دار الدنيا الى دار البقاء - ليلة الاربعا فى ست وعشرين من ذى الحجة و دفن يوم الخمس سبع وعشرين منه سنه ثلث و ستين وثمانماية
من مات غربيا فقد مات شهيدا

(ইনতেকালুল আবেদুদ্দায়িফ আল মোহতাজো এলা রাহ্‌মাতে রাব্বেল আলামিন আল মোহেব্বুলে ওয়ালাদে সৈইয়্যেদেল মোরসালিন; আল মোখলেছোলেল ওলামায়ের রাশেদিন আল মোবগাদোলেল কোফ্‌ফারো আল মোশরেকীন; আল মাইনোলেল ইসলামো ওয়াল মুসলেমীন; উলুগ খান জাহান অ্যালাইহির রহমাতো আল গোফরান মিন দারেদ্দুনিয়া এলাদ্দারিল বাকা; লাইলাতোল আরবায়া ফি ছিত্তাতে ওয়া ইশরিনা মেন জিলহাজ্জ অদোফেনা ইয়াওমাল খামছি ফি ছাবায়াতে ওয়া এশরিনা মিনহুফি ছানাতে ছালাসা ছেত্তিনা ওয়া ছামানিয়াতু মিম্‌মাতা গারিবা ফাকাদ মাতা শাহিদা।)

অনুবাদঃ

এখানে আল্লাহর এক দীন দাসানুদাস মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রার্থী। তিনি পয়গম্বরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহানবীর বংশধরগণের প্রতি অনুরক্ত-

Dhaka University Institutional Repository

যিনি পথানুসারী উলামাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী এবং নাফরমানীকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সদা সাহায্যকারী, তাঁর নাম উলুখ খান জাহান (আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন) । তিনি অস্থায়ী জগৎ থেকে স্থায়ী জগতের আশায় ৮৬৩ হিজরী ২৬শে জিলহজ্জ বুধবার রাত্রি ধরাধাম ত্যাগ করেছেন এবং ২৭ শে জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার তাঁকে সমাহিত করা হয়।"

Dhaka University Institutional Repository

ছোট সোনা মসজিদের শিলালিপি

মসজিদের শিলালিপিটি সর্ব প্রথম ক্রেইটন আবিষ্কার করেন এবং আলেকজান্ডার কানিংহাম এর একটি নকল (rubbing) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতায় পাঠান।[২৬১] এর উপরের ডান দিকের কিছু অংশ এবং বাম দিকের নীচের কিছু অংশ হারিয়ে গেছে। শিলালিপিটি চারটি লাইনে লিখিত এবং এর ভাষা আরবী।

1- بسم الله الرحمن الرحيم- قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن با لله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان[166] يكونو من المهتدين- و قال النبى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا فى الجنة مثله و[167] عمارة هذ المسجد الجامع

2- فى عهد سلطان السلاطين سيد السادات منبع السعادات[168] ارحم المسلمين والمسلمات معلى كلمات الحق والحسنات المويد بتائيد الديان المجاهد فى سبيل الرحمن خليفة الله بالحجة والبرهان غوث الاسلام والمسلمين علاوالدنيا والدين

3- ابوالمظفر حسين شاه السلطان الحسينى خلد الله ملكه و سلطانه- بنى هذا المسجد الجامع خالصا مخلصا متو كلا على الله ولى[169] محمد بن على المخاطب بخطاب مجلس المجالس[170] مجلس منصور نصره الله تعالى فى الدنيا والاخرة وتاريخه الميمون فى الرابع عشر من شهر رجب المبارك رجب الله قدره و شانه

(১. বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম - কালাল্লাহু তায়ালা ইন্নআম ইয়ামরু মাসজিদাল্লাহে মান আমানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়া ইকামিস সালাতি ওয়া তুয যাকাতি ওয়ালাম ইয়াকশাহ ইল্লাল্লাহু ফাআছাহ্ ওলাইকা আইয়ুকুনু মিনাল মুহতাফিন ওয়াকাননবীও সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লামা মামবানা মাসজিদান লিল্লহু বাইতোন ফিলজান্নতে মিছলুহু ওয়া ইমারাতুন হাজাল মাসজিদিল জামে।

২. ফি আহদে সুলতানিস সালাতিন সৈয়াদিস সাআদাতে মাম বায়িস সাআদাতে এর হামিল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমায়াতা মায়ালায়ে কালিমাতিল হক্ ওয়াল হাসনাতে আল মুয়াইয়েদু বে তাইয়েদিদ দিয়ান আল মুজাহিদু ফিচাবিলের রাহমানে

---

২৬১. A.Karim, *Corpus*, p. 311.

Dhaka University Institutional Repository

খলিফাতুল্লাহে বিল হজ্জাহ্ ওয়াল বোরহানু গাউসুল ইসলাম ওয়াল মুছরেমিন আলা ওয়াদুদ দুনিয়া ওয়ালদীন।

৩. আবুল মুজাফফর হুসাইন শাহ আস সুলতান আল হুসাইনি খালাদাল্লাহ মুলাহু ওয়াল সুলতানাহু বুনিয়া হাজাল মাসজিদুল আল জামিও খালেসান মুখলেসান মুতাওয়াক্কালান আনাল্লাহে ওয়ালি মুহাম্মদ ইবনে আলাল মুখাতাবে বে খেতাবে মজলিসিল মাজালিস মজলিসু মনসরুল নাছারাল্লাহু তায়ালা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরাত ওয়া তারিখুহুল মাইমুনা ফিরাবারবয় আশারা মিনশাহরে রজব আল মুবারক রজব আল্লাহু কাদবুহু ওয়া সানুহু।)

অনুবাদঃ

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহ্ বলেছেন,- নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামাজ ও আদায় করে যাকাত; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না। এতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। এবং রসুলূল্লাহ্ও (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে, তার জন্য বেহেস্তে অনুরূপ একটি গৃহ তৈরী হবে।' সুলতানদের সুলতান, সৈয়দগণের সৈয়দ, পবিত্রতার ঝর্ণা, মুসলমান নর ও নারীর উপর করুণা বর্ষণকারী, সত্যের বাণী ও সৎকাজকে গৌরব দানকারী, পরম বিচারকের সাহায্যধন্য, সর্বশক্তিমানের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য চেষ্টিত, কার্যে ও প্রমাণে আল্লাহ্র প্রতিনিধি, ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষাকারী আলাউদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর হুসেন শাহ সুলতান-আল-হুসাইনীর শাসনকালে, এ জামী মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তার রাজত্ব ও শাসন অব্যাহত রাখুন! পবিত্র আন্তরিক ইচ্ছা অনুসারে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাসের বশে আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ, যিনি মজলিশুল-মাজালিস্ মজলিস মনসুর উপাধির অধিকারী তাঁর দ্বারাই এই মসজিদ নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে এ জগতে ও পরলোকে সাহায্য করুণ। এর পবিত্র তারিখটা হলো আল্লাহর আর্শীবাদধণ্য রজব মাসের ১৪ই দিবস। এর মূল্য ও মর্যাদা বর্ধিত হউক,-------- ।"

Dhaka University Institutional Repository

বাঘা মসজিদের শিলালিপি

বাঘা মসজিদের শিলালিপিটি সর্বপ্রথম রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর জে. এস. কারসটেনস্ (J.S.Carstains) ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাঘা থেকে আবিষ্কার করেন।[২৬২] শিলালিপিটি তিনটি লাইনে লিখিত। একটি ১.৭০ মিটার দীর্ঘ এবং ৬৫ সে.মি. প্রস্থ বিশিষ্ট কালো ব্যাসাল্ট পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এর ভাষা আরবী এবং রীতি তুঘরা।

শিলালিপিটি নিম্নরূপঃ

1- قال النبى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا[11] فى الجنة - بنـى هـذا لمسجد الجامع السلطان

2- المعظم والمكرم السلطان بن السلطان ناصر الدنيا والدين ابو المظفر

3- نصرت شاه السلطان ابن حسين شاه السلطان الحسينى - خلد الله ملكه و سلطانه فى سنه ثلثين و تسعمائة

(১. কালাননাবিও সাল্লল্লাহে আলাইহে ওসাল্লামা মামবানা মাসজিদান লিল্লাহে বানাল্লাহু রাইতান ফি জান্নাতে-বুনিয়া হাজাল মাসজিদ আল জামে আল সুলতান।

২. আল মুয়াজ্জাম ওয়াল মুকারাম আস সুলতান নাসির উদ্ দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর।

৩. নসরত শাহ্ আসসুলতান ইবনে হুসাইন শাহ্ আস সুলতান আল হুসাইন-খালাদাল্লাহু মুলকাহু ওয়াল সুলতানাহু ফি সানাতে সালাসিনা ওয়া তেসও মিয়াতেন।)

---

[২৬২]. A. Karim, *পূর্বোক্ত*, p.334.

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদঃ

১.মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেস্তে গৃহ নির্মাণ করেন।' এই জামী মসজিদটির নির্মাতা

২.সুলতানের পুত্র, উদার ও প্রসংশনীয় সুলতান নাসির আল-দুনিয়া ওয়াল-দীন আবুল মুজাফ্ফর

৩.নসরত শাহ সুলতান, সুলতান আল-হুসাইনি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র, আল্লাহ তাঁর রাজ্য এবং সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুন। বছরটি ৯৩০ হিঃ (১৫২৩-২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

বড় সোনা মসজিদের শিলালিপি

قال النبى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له بيتا مثله فى الجنة- بنى هذالمسجد الجامع فى عهد السلطان المعظم المكرم السلطان ابن السلطان ناصر الدنيا والدين ابو المظفرنصرت شاه السلطان ابن حسين شاه السلطان ابن سيد اشرف الحسينى خلد الله ملكه و سلطانه واعلى امره وشانه فى سنة اثنى وثلثين و تسع ماية -

(কালান্নাবিও সল্লাল্লাহু আলাইহে ওছাল্লাম মামবানা মসজিদান আল্লাহু বানাল্লাহু তায়ালা লাহু বাইতান মিছলাহু ফিল জান্নাত– বানি হাজাল মসজিদুল জামিয়া সুলতা.... নুলমুয়াজ্জামুল মুকাররামু আছ সুলতানু ইবনুল সুলতান নাসির আদদুনিয়া ওয়াল দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ্ –আস্ সুলতান ইবনে হুসাইন শাহ্ আস সুলতান ইবনে সইয়্যাদ আশরাফুল হুসাইন খালাদাল্লাহু মুলকাহু সুলতানাহু ওয়ালা আমরুহু ওয়া শা..নুহু ফি ছিন্নাতু আছসানি ওয়াছ ছালিসিনা ওয়া তিছয়া শিয়াতু।)

অনুবাদঃ

মহানবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও মঙ্গল বর্ষণ করুন) বলেছেন, যে আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেস্তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই জামী মসজিদটি সুলতানের পুত্র মহান ও গৌরবান্বিত সুলতান নাসির উদ্ দুনিয়া ওয়াল দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত হলো, যিনি সৈয়দ আশরাফ আল হুসাইনীর তনয় সুলতান হুসের শাহের পুত্র। আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য ও সার্বভৌমত্বকে চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন; ৯৩২ হিজরী সনে এটি নির্মাণ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কুতুবশাহী মসজিদের শিলালিপি

তোরণে প্রাপ্ত শিলালিপিটি আরবী ভাষায় লিখিত।

هذ باب المسجد الذى بنى الفقير الحقير مخدوم شيخ بن محمد الخالدى مريد عالى مقام شمس سما ء الشريعة قمركان الحقيقة هادى راه ارادت مخدوم المعظم مخدوم قطب عالم تلأ لأ الله بمضجعة - تاريخه تمت باب مسجد - سنة ٩٩٣ ه

(হাজা বাব আল মসজিদে আল্লাজি বানিউল ফকীরুল হাকীরে মখদুম শেয়খ বিন মুহাম্মদ বিন খাল্লাদি মুরিদু আলা মাকামে শামসুস সামায়ে আশ্‌শারিয়াতু কামারু কানাল হাকিকাতু হাদীরায়াহু এরাদাতু মাখদুমুল মুয়াজ্জামু মাখদুমু কুতুবুল আলম তায়াল্লাহু বি মাঝ জামায়্যাত-তারিখুহু তেছয়্যাতু বাব এ মসজিদ-ছিন্নাত হিজরী।)

অনুবাদঃ

এই মসজিদের তোরণটি ধর্মের আকাশের সূর্য, সত্যের খনির চন্দ্র, আধ্যাত্মিক পথের প্রর্দশক, মহিমান্বিত কুতুবুল আলমের [আল্লাহ্ তার কবরকে দ্যুতিময় করুন] উচ্চপদস্ত অনুসারী মুহাম্মদ খালিদির পুত্র ফকীর মখদুম শাহ্ কর্তৃক নির্মিত। এর নির্মাণ কাজ ৯৯৩ হিজরীতে সমাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জামী মসজিদের শিলালিপি

این قبله که در عالم معلوم آمد - در هند بنام کعبه موسوم آمد
چون ثانی کعبه بود تاریخ زغیب - بیت الله الحرام معصوم آمد

(ই কিবলা কে দর আলামে মালুম আমাদ দরহিন্ বানামে কাবা মাসুম আমাদ্ চু সানায়ে কাবা বুদ তারিখ যা গায়েব বাইতুল্লা ছিল হারাম মাসুম অমাদ)

অনুবাদঃ

এই উপাসনাগৃহটি পৃথিবী বিখ্যাত এবং ভারতবর্ষে এটিকে কাবা বলে অভিহিত করা হয়। যেহেতু এটি দ্বিতীয় কাবা সেহেতু অদৃশ্য জগৎ থেকে তারিখটি প্রকাশিত হয় (এই কথা দ্বারা) - বাবতিল্লাহ আল হারাম মাসুম (পবিত্র নিষ্পাপ গৃহ)।[২৬৩]

---

২৬৩. প্রদ্যোত ঘোষ, *গৌড় বঙ্গের স্থাপত্য*, কলকাতা-২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৬.

Dhaka University Institutional Repository

বড় কাটরার শিলালিপি

বড় কাটরার মোট দুটি শিলালিপি রয়েছে। এগুলো ফার্সী ভাষায় লিখিত। এর মধ্যে নির্মাণ সংক্রান্ত শিলালিপিটি তোরণের কেন্দ্রীয় গম্বুজের অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে। নিম্নে শিলালিপিটি উল্লেখ করা হলোঃ

کرد در عهد عدل شاه شجاع – خلف صدق بادشاه جهان
انکه از روے افتخار کند – خاك روبیٔ درگهش خاقان
انکه پر کرده از گهر کف او – بحر راجیب وابر را دامان
در حجاب از فروغ شمس او – ید بیضای موسی عمران
بنده در گهش ابوالقاسم – این بنای رفیع عرش ارکان
چه بنارشك بارگاه سپر – چه بنا شخنه ریاض جنان
زیرایوان اسمان قدرش – همچو گردون هزا سر گردان
پیٔ سال بناے او عمری – بود معمار فکر من حیران
هاتف غیب گفت تاریخش – در امان باد از آفت دوران

۱۰۵۳

سنه

(কারদে দর আহাদে আদেল শাহ্ শুজাহ্ খালফে সিদ্দিক বাদশাহে জাহা
আখে রুইয়ে ইফতেখাওে কুনদ খাকে রুইয়ে দও গোসানে খাকানা
আখে পার কারদাহে আজ গাহ্রে কেফ আও বাহ্রে রাজিব আবরু আরা দামান
দর হেজাব আজ ফুরুগে শামস্ আও ইয়াদে বায়্যাদি মুছা ইমরান
বান্দাহে দর গোশা আবুল কাসেম আইনে বানায়ি রাফিয়ে আরসে আরকান
চেহ বেনারাস্ক বারগাহে সপ্র চেহ বেনা শাখ আহু রেয়াজে জানান
জিরা আবুয়্যানে আসমান কাদরাস হামচ্যু গার দোয়্যানে হাজা ছর গারদান
পায়ে ছাল বানায়ে আও ওমরি বুদে মাআ মার ফিক্রে মান হয়রান

Dhaka University Institutional Repository

হাতেফ গায়রে গোফত তারিখস্ দও মানে বাদ আজ আফতে দওরান সিন্নাহু)

অনুবাদঃ

"পৃথিবীর সম্রাটের অকৃত্রিম ও ন্যায় বিচারক পুত্র শাহ্ সুজার আমলে (এটি নির্মাণ করা হয়)। তিনি এরূপ প্রতাপশালী যে, তার দরবারে চীন সম্রাট গর্ব ভরে ধুলা পরিষ্কার করে থাকেন। তিনি এত ঐশ্বর্যবান যে, তার হাতের মুঠির মুক্তা দিয়ে সমুদ্রের গহ্বর এবং মেঘমালার প্রান্ত ভরে রাখেন। তাঁর রূপের ছটার বিকিরণে মূসা-ইমরানের হাতের শুভ্র চাকচিক্য (লজ্জায়) পর্দার অন্তরালে চলে যায়। তাঁর দরবারের সেবক আবুল কাসেম আরশের স্তম্ভস্বরূপ এ উচুঁ ভবন নির্মাণ করেন। কত সুন্দর এ প্রাসাদ! ঐশী ভবনের ঈর্ষার বস্তু এবং স্বর্গীয় উদ্যানের অবিকল প্রতিলিপি। তাঁর আকাশ-ছোঁয়া প্রতাপের অধীনে হাজার হাজার আকাশ ঘূর্ণায়মান। আমার স্থপতি মন তার নির্মাণের তারিখ অন্বেষণে বিব্রত হয়ে উঠলে অদৃশ্য ঘোষক তার তারিখ বলে দিলেন কালচক্রের বিপদ থেকে নিরাপদে থাকুক! ১০৫৩ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী খাজা শাহবাজ কমপ্লেক্সের শিলালিপি

শিলালিপিটি আরবী ভাষায় লিখিত।

ساخت حاجی خواجه شهباز این بنای پاک را - انکه در رفعت بعرش اعظم انباز آمده
بر زبان عـقـل کل تاریخ آنبنیاد پاک - مسجد زیبا ز حاجی خواجه شاهبازآمده
سنـه ۱۰۸۹ هـ

(সাখত হাজী খাজা শাহবাজ আইনে বেনায়ী পাকরা আকে দর রফায়াত বে আরশে আযিম আনবাঘে আমাদ বর জবানে আকল কুল তারিখ আন বুনিয়াদ পাক মসজিদে জিবাজ হাজী খাজা আমাদা সানে ১০৮৯ হিজরী)

অনুবাদঃ

হাজী খাজা শাহবাজ কর্তৃক নির্মিত এই পবিত্র ইমারতটি আল্লাহর আসনকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করেছে। অদৃশ্য থেকে এই মসজিদের তারিখ উচ্চারিত হলো- এটি 'হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ'- বছরটি হলো ১০৮৯ হিজরী (১৫৭৮-৭৯ খ্রিঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–২

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপি ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তোরণের তালিকা

তোরণের প্রকৃতি	অবস্থান	নির্মাণকাল ও নির্মাতা	বর্তমান অবস্থা
মসজিদের তোরণ	নাসওয়ালা গলি, ঢাকা	৮৬৩ হিজরী/১৪৫৯ খ্রিঃ[২৬৪] নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ্	ধ্বংসপ্রাপ্ত
নিম দরওয়াজা (গৌড় দুর্গের তোরণ)	গৌড়, মালদহ প.বঙ্গ	৮৭১ হিজরী/১৪৬৬-৬৭ খ্রিঃ[২৬৫] রুকুনুদ্দিন বরবক শাহ	ধ্বংসপ্রাপ্ত
চান্দ দরওয়াজা (গৌড় দুর্গের তোরণ)	গৌড়, মালদহ পশ্চিম বঙ্গ	পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ(সম্ভাব্য)[২৬৬]	ধ্বংসপ্রাপ্ত
দুর্গের তোরণ	গড়জারিপা শেরপুর ময়মনসিংহ	৮৯৩ হিজরী/১৪৮৭ খ্রিঃ[২৬৭] সাইফুদ্দিন মো. ফিরোজশাহ	ধ্বংসপ্রাপ্ত
দুর্গের তোরণ	অজানা(প্রাপ্তিস্থান-কদমরসুল ইমারতের নিকটে)	১৫০৩ খ্রিঃ আলাউদ্দিন হুসেনশাহ[২৬৮]	অজানা

---

২৬৪. Karim Abdul, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh-1992 A.D, p. 135.

২৬৫. Karim Abdul, *Corpus*, p. 165-68.

২৬৬. Cunninghum, *Archaeological Survey of India Report, 1871-72*, Delhi: Rahul Publishing House-1994 (reprint), vol. xv., p. 52-53.

২৬৭. Karim Abdul, *Corpus*, p. 220-22.

২৬৮. John Henry Raenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878A.D. p. 23.

Dhaka University Institutional Repository

তোরণের প্রকৃতি	অবস্থান	নির্মাণকাল ও নির্মাতা	বর্তমান অবস্থা
দরসবাড়ী মাদ্রাসার তোরণ	শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ বাংলাদেশ	৯০৯ হিজরী/১৫০৩-০৪ খ্রিঃ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ[২৬৯]	ধ্বংসপ্রাপ্ত
শেইখ আখি সিরাজের সমাধির তোরণ	শাহদুল্লাহপুর, মালদহ ,পশ্চিমবঙ্গ	৯১০ হিঃ/ ১৫০৪-০৫ খ্রিঃ[২৭০]	পরিবর্তিত
জামী মসজিদের তোরণ	ঝিল্লি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ	৯১১ হিঃ/১৫০৫-০৬ আলাউদ্দিন হুসেনশাহ	ধ্বংসপ্রাপ্ত
সমাধির তোরণ	পীরানপুর, মালদহ পশ্চিমবঙ্গ	৯৩১ হিজরী/১৫২৪-২৫ খ্রিঃ[২৭১] নাসির উদ্দিন নসরত শাহ	পরিবর্তিত
জামী মসজিদের তোরণ	পুরাতন মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ	৯৩৫ হিঃ/১৫২৮-২৯ খ্রিঃ[২৭২] নাসির উদ্দিন নসরত শাহ	ধ্বংসপ্রাপ্ত
প্রাসাদের তোরণ	মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ	৯৩৬ হিঃ/১৫২৯-৩০ খ্রিঃ[২৭৩] নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ	ধ্বংসপ্রাপ্ত

তোরণের প্রকৃতি অবস্থান নির্মাণকাল ও নির্মাতা বর্তমান অবস্থা

২৬৯. Quadir M A, The Newly Discovered Madrasa Ruins at Gaur and its Inscriptions, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol-xxiv-xxvi, 1979-81* p.20-90.
২৭০. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh-1992 A.D, p. 266.
২৭১. Abdul Karim, *Corpus*, p. 337
২৭২. Abdul Karim, *Corpus*, p.348-49.
২৭৩. Abdul Karim, *Corpus*, p.353-54.

Dhaka University Institutional Repository

জামী মসজিদের তোরণ	সন্তোষপুর, হুগলী পশ্চিমবঙ্গ	৯৩৮ হিজরী/১৫৩১-৩২ খ্রিঃ[২৭৪] নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ	ধ্বংসপ্রাপ্ত
হাম্মাদ মসজিদের তোরণ	কুমিরা, চট্টগ্রাম	দ্বিতীয় ইলিয়াছশাহী যুগ[২৭৫]	ধ্বংসপ্রাপ্ত
ফিরোজপুর দরওয়াজা	গৌড়,মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ	৯৭০হিজরী/১৫৬৩ খ্রিঃ পাঠান সেনাপতি খান জেহান[২৭৬]	ধ্বংসপ্রাপ্ত
ফতেহজংপুর তোরণ	নড়িয়া, শরীয়তপুর	১৬০৩-১৬০৮ খ্রিঃ[২৭৭] রাজা মান সিংহ	ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান
বেহেস্ত-কি-দরওয়াজা (নুর কুতুবুল আলমের সমাধির তোরণ)[২৭৮]	পান্ডুয়া,মালদহ পশ্চিমবঙ্গ	অজানা	পরিবর্তিত
জামী মসজিদের তোরণ	ভাগলপুর, বিহার		

২৭৪. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh-1992 A.D, p.358.
২৭৫. Abdul Karim, *Corpus,* p.379.
২৭৬. John Henry Raenshaw, *Gaur; Its Ruins and Inscriptions*, London-1878 A.D. p. 36.
২৭৭. *ইতিহাস,* বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা
২৭৮. Abid Ali, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1924 A.D, p.117.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী, ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থ (অনূদিত)ঃ

**Abu`l-Fadl`Allami, *A`in-i-Akbari vol.1,* trans. by Blockmenn Calcutta, 1927 A.D.

**Abu`l-Fadl`Allami, *Akbarnama* trans. by Beveridge, Calcutta, 1912 A.D. (Reprint), vol. lll, 1973 A.D.

**Abd al-Qadir Badayuni, *Muntakhab al-Tawarikh,* Calcutta - 1893 A.D.

**Elahi Bakhsh, *Khursid-i-Jahannuma,* trans. by H. Beveridge in Journal of Asiatic Society of Bengal, lxiii, 1894 A.D.

**Gulam Hossain Salim, *Rias-us-Salatin,* (Trans.) by A. Salam, Calcatta- 1904 A.D.

**Habibur Rahaman, *Asudgan-i- Dacca,* Dacca - 1946 A.D.

**Munshi Salimullah, *Tarikh-i-Bangladesh (History of Mughal Empire)* edt. by Imamuddin, Dhaka; Asiatic Society of Bangladesh.

**Nawab Samsamuddaula Shahnawaz Khan, *Maathir-ul-Umara,* vol.ll. (edt.) by M.M. Ashraf Ali, Calcatta – 1890 A.D.

**Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firuz Shahi,* Bibliotheca Indic Series, 1862 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থঃ

**Ahmed Nazimuddin, *Discover the Monuments of Bangladesh*, Dhaka, The University Press Limited - 1984 A.D.

**Asher C. B. *The New Cambridge History of India-Architecture of Mughal India*, Chambridge University Press - 1992 A.D.

**Aulad Hasan Sayid, *Notes on the Antiquites of Dacca*, Dacca, M.M. Bysak - 1904 A.D.

**Birt F.B.Bradley, *The Romance of an Eastern Capital*, London: Smith Elder and Co. - 1906 A.D.

**Brown Percy, *Indian Architecture, (Buddist and Hindu Period)* Taraporevala Sons and Company, Bombay: India-1875 A.D.

**Brown Percy, *Indian Architure, (Islamic Period)*, Taraporevala Sons and Company, Bombay: India-1875 A.D.

**Chakrabarti Dilip, *Ancient Bangladesh - A Study of the Archaeological Sources*, Oxford University Press-1992 A.D.

**Cresweell K.A.C., *Early Muslim Architecture (Part two)*, Oxford University Press - 1961 A.D.

**Cunninghum Alexander, *Archaeological Survey of India Report*, vol-xv, Delhi, Rarul Publishing House -1999 A.D.

**Dani A.H., *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca-1961 A.D.

**Dani A.H., *Dacca: A Record of its Changing Fortunes*, The Saogat Press - 1962 A.D.

**Eaton Richard M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier1204-1760*, America-University of California Press - 1996 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

**Fargessun James, *History of Indian and Eastern Architecture*, Delhi, Low Price Publishing-1910 (1st publication).

**Grabar Olag and Etinghausen Richerd, *Art and Architecture of Islam*, Penguin Books Ltd.

**Haeg Sir Woleseley (edt.), *The Cambridge History of India*, vol-iii, (Tarks and Afghans: Monumens of Muslim India – by John Marshall,) Delhi, S. Chand & Co. - 1965 A.D.

**Havel E.B. *Indian Architecture (Its Psychology, Structure and History etc.)*, New Delhi, S.Chand & Co. -1914 A.D.

**Henry Yule, *The Dairy of William Hedges*, Vol -1, London– 1887-89 A.D.

**Hunter W.W. *Statistical Account of Bengal-vol vii, xix,* Delhi, D.K. Publishing House -1974 A.D.

**Hussain A.B.M. *The Manara Of Indo-Muslim Architecture*, Dacca-Asiatic Society of Pakistan - 1970 A.D.

**Hoag J.D. *Islamic Architecture,* New York – 1977 A.D.

**Hafizullah Khan Mohammad, *Tarracotta Ornamentation in Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1988 A.D.

**Karim Abdul, *Dhaka Past Present Future*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987 A.D.

**Karim Abdul, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh -1992 A.D.

**Khan Abid Ali, *Memiors of Gaur and Pandua*, Calcatta-1910 A.D.

**Hussain A.B.M.(edt.), *Sonargaon-Panam*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka -1997 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

**Hussain A.B.M.(edt.), *Gawr - Laknawti*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka -1997 A.D.

**Mahmudul Hasan Sayeed, *Muslim Monuments of Bangladesh*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka - 1987A.D.

**Mahmudul Hasan Sayeed, *GAUR AND HAZRAT PANDUA*, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh - 1987A.D.

**Michel George (edt.), *Islamic Heritage in Bengal,* UNESCO - 1984 A.D.

**Nath R., *History of Saltanate Architecture,* New Delhi -1997 A.D.

**Oyly Sir Charles, *Antiquites of Dacca,* Published by John Landseer, London - 1824- 30 A.D.

**Ravenshaw John Henry, *Gaur; its Ruins and Inscriptions*, London -1878 A.D.

**Rennell James, *Memoir of a Map of Hindustan,* Calcutta -1976 (reprint)

**Taifur S.M. *Glimpses of Old Dacca,* Dacca, Lulu Bilkis Banu - 1956 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থঃ

**মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরি,* (বাংলা অনুবাদ-আ.ক.ম. জাকারিয়া) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩।

**মীর্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী,* ১ম খন্ড, (খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১৯৭৮।

**রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা,* ডক্টর আ.ম.ম. শরফুদ্দিন কর্তৃক অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা - ১৯৮৫।

বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

**অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর,* কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড- ১৯৯৯।

**আ. ক. ম. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা -১৯৮৪।

**আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল,* (৩য় সংস্করণ) ঢাকা-বাংলা একাডেমী - ১৯৯৪।

**আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল,* ঢাকা-বাংলা একাডেমী।

**আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত),* মুখলেসুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা-বাংলা একাডেমী - ১৯৯৩।

**আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* ঢাকা-বাংলা একাডেমী - ১৯৯৪।

**আবদুল মমিন চৌধুরী ও ফকরুল আলম সম্পাদিত, *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর,* উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -১৯৯৬।

**আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ,* ঢাকা; সময় প্রকাশন, বাংলা বাজার - ২০০০।

**এম আর তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক,* ঢাকা-বাংলা একাডেমী - ১৯৯৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

**এম আর তরফদার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত) ঢাকা; বাংলা একাডেমী-১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

**এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম খন্ড)* ঢাকা; বাংলা একাডেমী-১৯৯৫।

**এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি [১২০০-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ]* ঢাকা; বাংলা একাডেমী -১৯৯৯।

**জ্ঞানেন্দ্র মোখপাধ্যায়, *বাংলা ভাষার অভিধান*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ-১৯৭৯।

**নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-বাংলা ১৩৫৬ সাল।

**প্রদ্যোত ঘোষ, *গৌড়-বঙ্গের স্থাপত্য প্রথম পর্ব*, কলকাতা; অক্ষর প্রকাশনী-১৯৭৭।

**প্রদ্যোত ঘোষ, *মালদহ জেলার পুরাকীর্তি*, প্রতত্ত্বতত্ত্ব ও সংগ্রাহলয় অধিকার; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ- পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশ-১৯৯৭।

* *মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা; বাংলা একাডেমী-১৯৯৩।

* *রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ- ১৯০৯ সাল।

**রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলকাতা; জেনারেল, আশ্বিন-১৩৮৫ (বাংলা) সাল।

**রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস(১ম ও ২য় খন্ড)* কলকাতা; নবভারত পাবলিশার্স-১৯৭১ সাল।

**শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *দিনাজপুর:ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি- ১৯৯৬ সাল।

**সালাউদ্দীন আহমদ, মমতাজুর রহমান তরফদার, অজয় রায় সম্পাদিত *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ-১৯৯১ সাল।

**সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খন্ড)* কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড- ১৯৯১ সাল(প্রথম সংস্করণ)।

* *শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, ত্রিপুরা; আগরতলা- আশ্বিন-১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

**সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫.

Dhaka University Institutional Repository

**শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা- ১৯৯৮ খ্রিঃ (ষষ্ঠ সংস্করণ)

***বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাদনা পরিষদ বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী- এপ্রিল ১৯৯৮।

* **পাকুন্দিয়া উপজেলার* কথা, কিশোরগঞ্জ জেলা ইতিহাস প্রনয়ণ কমিটি- ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাঃ

Jurnal of the Asiatic Society of Bengal, Calcatta - 1874 (vol-xliii), 1875, 1952, 1909.

Jurnal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka- vol-xxiv-xxvi, 1979-81.

Protected Monuments and Mounds in Bangladesh, Department of Archaeology and Museum, Dhaka.

Bengal Past and Present, Calcatta- vol-xxv, sr no-49.

Annual Report of Eastern Pakistan Circle Archaeology for the Year 1952-53 A.D.

Jurnal of Bengal Art, The International Centre For Study Of Bengal Art, Dhaka, Bangladesh- vol-2, 3.

Jurnal of Varendra Research Measum, Rajshahi.

Bengal District Gazetteer-Dacca, Calcatta- 1908.

Bengal District Gazetteer –Khulna, Calcatta- 1908.

Bengal District Gazetteer – Rajshahi, Calcatta- 1908.

Annual Report of Eastern Pakistan Circle Archaeology for the Year 1952-53 A.D.

ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, ঢাকা - বৈশাখ-চৈত্র ১০ম বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।